মুসলিম প্যারেন্টিং

সন্তান প্রতিপালন গাইড

ড. মুহাম্মাদ আব্দুল বারী

মুসলিম প্যারেন্টিং

(সন্তান প্রতিপালন গাইড)

www.nagorikpathagar.org

মুসলিম প্যারেন্টিং

সন্তান প্রতিপালন গাইড

ড. মুহাম্মাদ আব্দুল বারী

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

www.nagorikpathagar.org

গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স

৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),
বাংলাবাজার, সূত্রাপুর, ঢাকা—১১০০
০২-৫৭১৬৩২১৪, ০১৭১০-১৯৭৫৫৮, ০১৯৯৮-৫৮৪৯৫৮
info@guardianpubs.com
www.guardianpubs.com

প্রথম প্রকাশ	১৫ অক্টোবর, ২০২১
দ্বিতীয় সংস্করণ	১০ ডিসেম্বর, ২০২১
গ্রন্থস্বত্ব	লেখক
প্রচ্ছদ	রিফাত মাহমুদ
আইএসবিএন	৯৭৮-৯৮৪-৯৫৩৭০-৮-৩
ফিক্সড প্রাইস	২২০ টাকা

ফিক্সড প্রাইসে বই কিনুন

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশকের কথা

প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষতার এই সময়ে দাঁড়িয়ে 'ডিভাইস প্রজন্ম' নিয়ে পিতা-মাতার পেরেশানির যেন শেষ নেই। সত্যিকার অর্থেই সন্তান প্রতিপালনের চ্যালেঞ্জ এক ভিন্ন মাত্রায় গিয়ে পৌঁছেছে। কে না চায়, তার ঔরসজাত চক্ষু শীতলকারী একজন ভালো মানুষ হয়ে উঠুক। কেবল প্রত্যাশা করলেই তো সুসন্তান গড়ে তোলা যায় না। এই দুনিয়ায় এমন কোনো মেশিন নেই, যার মধ্য দিয়ে একজন সন্তানকে মানুষ বানিয়ে বের করা যায়। চারপাশের প্রকৃতি, পরিবেশ, পরিস্থিতি, মানুষ ও সমাজ-বাস্তবতা দ্বারা প্রত্যেকেই প্রভাবিত। বহুবিধ সংকটের ভেতর থেকেই শিশুমনকে পবিত্রতার চাদর পরিয়ে তৈরি করার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হলে সচেতনভাবেই প্যারেন্টিং স্কিল ডেভেলপমেন্ট জরুরি। প্যারেন্টিং স্কিল এখন আর সৌখিনতা নয়; অনিবার্য বাস্তবতা।

আজকের দিনে এসে সন্তানকে পড়াশোনা করানোর আগেই মা-বাবাকে প্যারেন্টিং নিয়ে প্রচুর পড়াশোনা করতে হচ্ছে। পরিবর্তিত পৃথিবীতে নিত্য-নতুন ইস্যু সামনে আসছে। জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়াচ্ছে ডিভাইস; নতুন প্রজন্ম চোখ মেলেই ডিভাইস দেখছে। না সেই ডিভাইস বর্জন করা যাচ্ছে, না তার বিপদ এড়িয়ে যাওয়া যাচ্ছে; এ যেন উভয়সংকট। নতুন পৃথিবীর সাথে আত্মজকে কীভাবে ফলপ্রসূ উপায়ে মানিয়ে নেওয়া যায়—তা আদতেই চিন্তার বিষয়। সারা দুনিয়ায় তাই আধুনিক প্যারেন্টিং নিয়ে তুমুল আলাপ, লেখালিখি ও গবেষণা হচ্ছে। বাংলা ভাষাতেও ইদানীং প্যারেন্টিং নিয়ে বেশ গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে।

বাংলাদেশের কৃতী সন্তান, ইংল্যান্ডের মুসলিম কমিউনিটির জনপ্রিয় মুখ, মুসলিম স্কলার, প্যারেন্টিং স্পেশালিস্ট জনাব ড. মুহাম্মাদ আব্দুল বারী আগামী প্রজন্ম নিয়ে নিয়মিত লিখছেন, বলছেন। সারা দুনিয়ায় ঘুরে ঘুরে মুসলিম উম্মাহকে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গঠনে মনোযোগী করার চেষ্টা করছেন অব্যাহতভাবে। ইংল্যান্ডের কিউব পাবলিকেশন্স থেকে প্যারেন্টিং নিয়ে 'A Guide to Parenting in Islam' শিরোনামে তার দুটো সিক্যুয়াল 'Cherishing Childhood, Addressing Adolescence' প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থ দুটোকে আমরা বাংলায় একসাথে 'মুসলিম প্যারেন্টিং' নামে প্রকাশ করছি। ড. মুহাম্মাদ আব্দুল বারী জন্মসূত্রে বাংলাদেশি আর অবস্থানসূত্রে পশ্চিমা জীবনধারাকে খুব কাছে থেকে দেখছেন এবং দুই সমাজব্যবস্থার প্যারেন্টিং সংকট ও সম্ভাবনাগুলোও জীবন থেকে উপলব্ধি করতে পারেন। এই গ্রন্থে তিনি কিছু সুপারিশ তুলে ধরেছেন, যা বাংলাভাষী পিতা-মাতার চিন্তাকে শাণিত করবে, ইনশাআল্লাহ।

নতুন প্রজন্ম আলোকিত মানুষ হয়ে বেড়ে উঠুক।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা

www.nagorikpathagar.org

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই গ্রন্থটি কিশোর ও তরুণদের সাথে আমার দীর্ঘদিনের সম্পৃক্ততা ও বিভিন্ন সামাজিক কাজের ফসল। গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে তরুণ থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকল পর্যায়ের মানুষের অবদান রয়েছে। তারা সকলেই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা পাওয়ার হকদার। প্যারেন্টিং-বিষয়ক এই গ্রন্থ রচনার সিদ্ধান্ত আমার অন্তরে বদ্ধমূল হয়—যখন একজন সন্তানহারা মুসলিম অভিভাবকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি সদ্যই মেয়েকে নিজ ধর্ম থেকে হারিয়েছিলেন। আমি বুঝতে পারছিলাম না, এ সময়ে কীভাবে তাকে সান্ত্বনা দেবো। পরিশেষে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলাম, কেউ যেন সন্তানদের নিয়ে এই ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি না হয়।

এই গ্রন্থটি রচনার প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি উপলব্ধি করি, যখন 'Witness Pioneer Networks' নামে একটি ইন্টারনেটভিত্তিক ভার্চুয়াল প্রতিষ্ঠানের সাথে পরিচিত হই। তারা ভার্চুয়াল স্কুলে সামাজিক বিষয়াবলির ওপর বেশ কিছু কোর্স পরিচালনা করে। আমি এই প্রতিষ্ঠানে 'Islamic perspective of parenting' (সন্তান প্রতিপালনে ইসলামি পদ্ধতি) শিরোনাম একটি কোর্স চালু করার সিদ্ধান্ত নিই। এই কোর্স পরিচালনার অভিজ্ঞতা আমাকে নতুন করে আরও অনেক কিছু শিখিয়েছে। আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

আরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি লন্ডনের Webstar PLC-এর পরিচালক ড. জামিল শরিফের প্রতি, যিনি অনলাইনভিত্তিক প্রশ্নোত্তর সুবিধার মাধ্যমে একই বিষয়ের ওপর কোর্স পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। একইভাবে সপ্তাহব্যাপী 'Strengthening families and stringthening communities: An inclusive parenting programme' শিরোনামে Race Equality Foundation (REF) কর্তৃক পরিচালিত প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা এই গ্রন্থ রচনা করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

আরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার সহধর্মিণীর প্রতি, যে এই গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে আমাকে আন্তরিক পরামর্শ ও অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছে। জীবন-বাস্তবতার চরম চাপ সত্ত্বেও তার অসাধারণ পরিবার ব্যবস্থাপনা এবং বুদ্ধিদীপ্ততা (Sense of humor) আমাকে কি-বোর্ড হাতে নিতে সাহস জুগিয়েছে। বইটি রচনায় উৎসাহ প্রদানের জন্য আমাদের চার সন্তান—রিমা, রাইয়ান, লাবিব ও আদিব-এর প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

www.nagorikpathagar.org

এই গ্রন্থটি মূলত ইংরেজি ভাষায় লেখা। এর বিষয়বস্তু বর্তমান ব্রিটিশ সমাজে মুসলিম ছেলেমেয়েদের বেড়ে উঠা ও শিক্ষা-দীক্ষার সাথে সম্পৃক্ত হলেও বাংলাদেশে এর প্রাসঙ্গিকতা মোটেই কম নয়। আমরা বর্তমানে এক বৈশ্বিক গ্রামে (Global Village) বসবাস করছি এবং ঐতিহাসিক কারণে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সঙ্গে ব্রিটেনের যথেষ্ট মিল রয়েছে। সমসাময়িক বাংলাদেশে মুসলিম প্যারেন্টিং-এর ক্ষেত্রে এই বইটি যথেষ্ট অবদান রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আমাদের সচেতনতা সত্ত্বেও বইটিতে অজান্তে কোনো ভুলভ্রান্তি থেকে যাওয়া এবং অনুবাদের ক্ষেত্রে মূল বইয়ের সাথে কিছুটা তারতম্য হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। এজন্য আমি ক্ষমা প্রার্থী। কোনো বিচ্যুতি দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের জানানোর অনুরোধ করছি, যাতে পরবর্তী সংস্করণে শুধরে নিতে পারি।

গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্সকে অজস্র ধন্যবাদ আমার মাতৃভাষা বাংলায় বইটিকে প্রকাশের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য। লন্ডনে অবস্থিত অনেক উলামায়ে কিরামের প্রতি আমি ঋণী, যারা আমাকে কুরআন ও হাদিসের গ্রন্থাবলি থেকে রেফারেন্স খুঁজে পেতে সহায়তা করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সকলের প্রতি তাঁর করুণার ঝরনাধারা প্রবাহিত করুন।

ড. মুহাম্মাদ আব্দুল বারী
লন্ডন, ইংল্যান্ড
১০ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ
০২ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৩ হিজরি

www.nagorikpathagar.org

মুখবন্ধ

'বনি আদমের মৃত্যুর পর তার আমলের দরজা বন্ধ হয়ে যায়, তবে তিন ধরনের আমল ছাড়া—

১. সাদাকায়ে জারিয়া।

২. উত্তম জ্ঞান, যার মাধ্যমে মানবজাতি উপকৃত হয়।

৩. উত্তম সন্তান, যে মৃত্যুর পর তার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে।'

—মুসলিম ও মুসনাদে আহমদ

ইতিহাসের পরতে পরতে প্রত্যেক সমাজ ও সংস্কৃতিতে পিতা-মাতা ও সন্তানদের মাঝে একধরনের জেনারেশন গ্যাপ পরিলক্ষিত হয়ে আসছে, কিশোর বয়সে যা ব্যাপক আকার ধারণ করে। পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নাগরিকদের উত্তমরূপে তৈরি করে তাদের সুখ-শান্তি নিশ্চিত করা অভিভাবকদের জন্য একধরনের চ্যালেঞ্জস্বরূপ। এই চ্যালেঞ্জের সফলতা মূলত নির্ভর করে সন্তানরা কত আদর্শিক উপায়ে লালিত-পালিত হচ্ছে তার ওপর । যে সকল সমাজ এই সন্তানদের উত্তমরূপে লালন-পালনের দায়িত্বকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেছে, তারা বহুগুণ এগিয়ে থাকে তাদের চেয়ে, যারা এই দায়িত্বকে মামুলি মনে করে এবং খামখেয়ালিপনার মাধ্যমে পালন করে।

শৈশব থেকে কৈশোরে পদার্পণের পথ মসৃণ নয়। কিশোররা অনেক তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে এবং এই বেড়ে উঠার পথে তারা অনেক ধরনের শারীরিক পরিবর্তনের মুখোমুখি হয়। প্রাথমিকভাবে তারা নিজেদের প্রতি, নিজেদের শরীর ও ব্যক্তিত্বের প্রতি যত্নশীল হয়ে থাকে। তারা শারীরিকভাবে শক্তিশালী, অধিক মনোযোগী এবং সামাজিকভাবে সচেতন হয়ে ওঠে। অধিক সময় ধরে যৌনচিন্তা তাদের অন্তরকে গ্রাস করে রাখে। তারা বিপরীত লিঙ্গের নিকট নিজেদের আকর্ষণীয়রূপে উপস্থাপন করতে চায়। কথাবার্তায় খুব সংবেদনশীল মনোভাব পোষণ এবং নিজেদের দুর্বলতার দরুন ইতস্তত বোধ করে। এই ধরনের অভ্যন্তরীণ সমস্যা মোকাবিলা করতে গিয়ে তারা অসংখ্য তথ্য ও বহুমুখী সংবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে, যা তাদের চারদিকে ছড়িয়ে আছে।

বর্তমান বৈশ্বিক পরিবেশে একজন তরুণ যৌবনে পদার্পণের সাথে সাথেই কর্তব্যহীনতা, পিতা-মাতার চরম অবাধ্যতা, সমাজবিরোধী কার্যক্রম, অনিয়ন্ত্রিত যৌনতা, অনিরাপদ গর্ভধারণ (প্রেগনেন্সি), মাদকাসক্তিসহ বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কার্যক্রমে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে। যে সমাজ এই সমস্ত বিষয়াবলিকে মামুলিভাবে দেখবে, এই সমাজ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাবে এবং এই সমস্ত সামাজিক সমস্যাবলি সমাজের জন্য বিরাট উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। সমাজ যখন ধর্মীয় ও মানবীয়

www.nagorikpathagar.org

মূল্যবোধের ওপর গুরুত্ব দেওয়ার পরিবর্তে ভোগবাদী নীতি অবলম্বন করে এবং তার অধিবাসী নাগরিকদের আচার-আচরণে ইতিবাচক সীমা টেনে দিতে উদাসীনতা প্রদর্শন করে, তখনই উপরোল্লিখিত সমস্যাবলি মহামারি আকার ধারণ করে।

আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে—যে সমাজে তরুণদের স্বাধীনতাকে চরমভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং কিশোররা প্রাপ্তবয়স্কদের দ্বারা শাসিত হয়, সে সমাজে তরুণরা কর্তৃত্বশীল আচরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে। তরুণদের ভালো নাগরিক কিংবা আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হলে তাদের অবশ্যই সমাজের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করাতে হবে এবং তাদের মাঝে সামাজিক দায়িত্বানুভূতি জাগ্রত করতে হবে, তাদের স্বাধীনতা ও দায়িত্বশীলতার মাঝে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।

কিশোরদের লালন-পালন সহজ কোনো বিষয় নয়। সন্তান কিশোর বয়সে পদার্পণ করার পর তাদের লালন-পালনে পিতা-মাতার শারীরিক পরিশ্রম কমে আসে বটে, কিন্তু এর পরিবর্তে তাদের আরও চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হয়। এই সময় সন্তানদের সাথে কেবল একজন মাতা-পিতা হিসেবে নয়; বরং (এর চেয়ে বেশি) একজন শিক্ষক, পদপ্রদর্শক আদর্শবান ব্যক্তি এবং পরম বন্ধু হিসেবেও আচরণ করতে হয়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আদর্শিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হলে সন্তানদের সাথে আমাদের পারস্পরিক সম্মান, ভালোবাসা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক স্থাপন অত্যন্ত জরুরি।

কিশোরদের লালন-পালন প্রক্রিয়া একটি কঠিন চ্যালেঞ্জিং বিষয়, কিন্তু এর ফলাফল সুমিষ্ট। সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রে মুসলিম পিতা-মাতার দায়িত্ব একধাপ বেশি। মুসলিম পিতা-মাতার ক্ষেত্রে সন্তানদের শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের পাশাপাশি তাদের বিশ্বাস ও মূল্যবোধের দিকেও সমানভাবে নজর দেওয়া কর্তব্য, যেন তাদের মধ্যে আত্মিক উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। সন্তানদের সফলভাবে লালন-পালন করতে হলে মুসলিম পিতা-মাতাকে অবশ্যই সৃজনশীল ও গতিশীল ভূমিকা রাখতে হবে। তাদের সাথে যৌক্তিক, নমনীয় ও মাধুর্যতাপূর্ণ আচরণ করতে হবে।

মানবজীবনে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি খুবই স্পষ্ট। ইসলাম তরুণ সমাজকে সর্বোৎকৃষ্ট মানবিক মূল্যবোধ এবং স্পষ্ট নীতির মাধ্যমে ভবিষ্যৎ ভূমিকার ব্যাপারে নির্দেশনা প্রদান করে। হাদিসে বলা আছে—কোনো পিতা-মাতা তার সন্তানকে উত্তম আচার-আচরণ, সৎ চরিত্র ও সুশিক্ষার চেয়ে উত্তম কিছুই শিক্ষা দিতে পারে না। সন্তানদের যথাযথভাবে লালন-পালনের জন্য ইসলাম পিতা-মাতার ওপর বিশেষভাবে জোর প্রদান করে। যে পিতা-মাতা যত উত্তম উপায়ে সন্তান লালন-পালন করতে পারে, তার প্রতিদান ততই বেশি। ইসলামের স্বর্ণালি যুগের দিকে লক্ষ করলেই উপলব্ধি করা যায়, মানবীয় সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে সমাজকে

www.nagorikpathagar.org

কতটা উচ্চতর পর্যায়ে উপনীত করা যায়! একইভাবে এই বিষয়টিকে উপেক্ষার কারণে মানবসমাজ ধ্বংসের কত গভীরে পৌঁছতে পারে, তাও ইতিহাস থেকে জানা যায়। সার্বিক বিষয় পর্যালোচনা করলে সহজেই বোঝা যায়—সন্তান-লালন পালনে যথাযথভাবে মনোযোগ না দেওয়ার কারণেই বর্তমান সময়ে মুসলিম উম্মাহ ধ্বংসের কিনারায় পৌঁছে গেছে।

সন্তানদের লালন-পালন একই সঙ্গে আনন্দায়ক, উদ্যমী ও দুঃসাহসিক কাজ হতে পারে, যদি পিতা-মাতা এটিকে জীবনের অন্যতম অংশ মনে করেন এবং এই দায়িত্বকে গুরুত্বের সাথে পালন করেন।

সন্তান লালন-পালন বিষয়ে অসংখ্য বই রচিত হলেও ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে এই বিষয়ে লিখিত বইয়ের সংখ্যা নিতান্তই হাতেগোনা। আধুনিক পৃথিবীর জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে যদি নিজেদের মুসলিম পরিচয়কে রক্ষা করতে চাই, পরিবার ও সমাজকে সঠিকভাবে গড়ে তুলতে চাই এবং সমাজ কল্যাণে যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে চাই, তাহলে আমাদের কার্যক্রমের মধ্যে সন্তান লালন-পালন প্রক্রিয়াকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। মুসলিম সমাজকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রচেষ্টা চালাতে হবে এবং দেরি না করে যত দ্রুত সম্ভব সমাজের মধ্যে ব্যাপক আকারে যথাযথভাবে সন্তান লালন-পালনের আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এর জন্য প্রথমে মুসলিম পরিবারে স্থিতিশীলতা আনতে হবে, যথাযথ ও বিশ্বাসযোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তুলতে হবে এবং পুরো সমাজের ঐক্য নিশ্চিত করতে হবে।

এই বইটি কোনো ধরনের অ্যাকাডেমিক রচনা কিংবা গবেষণাকর্ম নয়। সর্বশ্রেণির পাঠকের জন্য সহজবোধ্য করে এটি রচনা করা হয়েছে। এখানে অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্ট নীতির পরিবর্তে স্পষ্ট ও প্রতিরক্ষামূলক নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। এই গ্রন্থে মূলত ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সন্তান প্রতিপালনের চ্যালেঞ্জসমূহ আলোচনা করা হয়েছে। এর মানে এই নয়, এটি সন্তান লালন-পালন পদ্ধতি সম্পর্কিত ফিকহের কোনো বই।

এই বইটি রচনার অন্যতম উদ্দেশ্যে হলো, মুসলিম পিতা-মাতার মাঝে যথাসম্ভব সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং এই কোলাহলপূর্ণ সামাজিক বাস্তবতায় সন্তান প্রতিপালনের মতো জটিল কিন্তু অপরিহার্য দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা করা। এই বইটা যদি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে ব্যক্তিগত, মানবীয় ও সামাজিক গুণাবলি তৈরি করতে পিতা-মাতাকে সাহায্য করে, তাহলে আমার উদ্দেশ্য সার্থক হবে বলে মনে করি। আমার সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাচ্ছি এবং আশা করছি, তিনি আমার প্রচেষ্টাকে কবুল করবেন।

www.nagorikpathagar.org

সূচিপত্র

প্রথম পর্ব
শৈশবের লালন-পালন

আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত	**১৭**
সন্তান আমানত ও পরীক্ষাস্বরূপ	১৭
এক বিরাট দায়িত্ব	১৮
কথার চেয়ে কাজ কঠিন	১৯
আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা	২০
সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের দায়িত্ব	২১
ইতিবাচক প্যারেন্টিং; একটি সৃষ্টিশীল প্রচেষ্টা	২৩
দুর্বল প্যারেন্টিং-এর কারণ	২৪
মহৎ কিছুর প্রস্তুতি	২৭

প্যারেন্টহুড-এর প্রকৃতি	**২৯**
বিয়ে, পরিবার ও প্যারেন্টহুড	২৯
পরিবার পরিকল্পনা	৩১
নবাগত সদস্য	৩২
শিশুর জন্মলগ্নে ইসলামি রীতি	৩৩
সহোদরদের মধ্যে সমতা	৩৫
নবাগত শিশুর যত্ন	৩৬
পিতা-মাতার ওপর সন্তানের অধিকার	৩৮
শিশুর সাথে আস্থাপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি	৩৯

www.nagorikpathagar.org

শৈশবকাল এবং স্কুলপূর্ববর্তী সময়	**৪১**
টোডলার (Toddler)	৪১
প্যারেন্টিং পদ্ধতি	৪৩
আত্মগঠনের সময়	৪৬
ভারসাম্যপূর্ণভাবে বেড়ে উঠার জন্য যা প্রয়োজন	৫০
স্কুলপূর্ব সময়ে চাইল্ডকেয়ারে রাখা	৬১

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বছরগুলো	**৬৩**
প্রাথমিক স্কুল বাছাই	৬৩
স্কুলজীবনের শুরু	৬৪
প্রাইমারি স্কুলে কিছু সমস্যা	৬৫
পড়ার গুরুত্ব	৭১
অভিভাবক-স্কুল পার্টনারশিপ	৭১

পারিবারিক পরিবেশ	**৭৩**
শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে পরিবারের কর্তব্য	৭৪
ব্যক্তিগত উন্নয়নের কেন্দ্র হিসেবে পরিবার	৭৫
সন্তানদের সাথে অর্থবহ সময় কাটানো	৭৬
ইসলামিক আদব	৭৮
শ্রবণের নীতিমালা	৮৩
সংযম	৮৪
কঠিন আচরণের মোকাবিলা	৮৫
সংস্কৃতি ও মাতৃভাষা	৮৬
হালাল ও হারাম	৮৭

মুসলিম চরিত্র গঠন	**৮৮**
ইসলামি শিক্ষা; সামগ্রিক পদক্ষেপ	৮৮
মুসলিম চরিত্র গঠনে পিতা-মাতার কর্তব্য	৯০

www.nagorikpathagar.org

সাপ্লিমেন্টারি ইসলামিক স্কুল	৯৪
মুসলিম সংস্কৃতি তৈরি	৯৫
উপসংহার	৯৯

দ্বিতীয় পর্ব
কৈশোরের পরিচর্যা

কিশোর বয়সের চ্যালেঞ্জ	**১০৭**
দিবাস্বপ্ন নাকি দুঃসাহসিকতা	১০৭
বিরাট পরিবর্তন	১০৮
অন্যান্য বিষয়	১১২
ব্যক্তিগত দুর্বলতার ব্যাপারে সচেতনতা	১১৯
কঠিন বিষয় মোকাবিলা করার উপায়	১২৫

সামাজিক অসুস্থতার প্রবল আক্রমণ	**১৩১**
ব্যাধির প্রসার	১৩১
ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম	১৪০

শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের প্রেরণা	**১৪৩**
মানবজাতি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী	১৪৩
আত্মমর্যাদাবোধ	১৪৫
উৎসাহ	১৪৭
অনুকরণীয় আদর্শ	১৪৮
ভারসাম্যপূর্ণ লালন-পালন	১৪৯
প্রকৃত সফলতার দীক্ষা	১৫০
পর্যায়ক্রমিক উন্নতি	১৫১
ব্যর্থতার মোকাবিলা	১৫২
কিশোর মননে উৎসাহদান	১৫৩

www.nagorikpathagar.org

পারিবারিক পরিবেশ	**১৫৭**
পারিবারিক পরিবেশের গুরুত্ব	১৫৭
পরিবারই কিশোরদের ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত্তি	১৫৮
সন্তানদের সার্থক সময় দান	১৬০
একটি মুসলিম যুব-সংস্কৃতি তৈরি	১৬১
গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ	১৬৩

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দিনগুলো	**১৬৫**
মাধ্যমিক বিদ্যালয় নির্বাচন	১৬৫
জীবনের সঠিক ভিত্তি স্থাপনের প্রস্তুতি	১৬৯
অন্যান্য চ্যালেঞ্জ	১৭৬
আত্মপরিচয়	১৮৪
আনন্দ-উল্লাসের কৃষ্ণবহর	১৮৬

দায়িত্ববোধের জগতে	**১৮৮**
অভিভাবক সব সময়ই অভিভাবক	১৮৮
ক্যারিয়ার বাছাইসংক্রান্ত পরামর্শ	১৮৯
বিশ্ববিদ্যালয়; জ্ঞান অর্জনের রাজতোরণ	১৯১
দাওয়াতি কাজের সুযোগ	১৯২
ইসলাম ও খিদমাহ	১৯৩
জীবনচক্র	১৯৪
প্যারেন্টিং কি সফল হয়েছে	১৯৫
উপসংহার	১৯৭

www.nagorikpathagar.org

প্রথম পর্ব

শৈশবের লালন-পালন

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত

'ওহে বিশ্বাসীরা! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করো না এবং ইচ্ছাকৃতভাবে সীমালঙ্ঘন করো না।'—সূরা আনফাল : ২৭

সন্তান আমানত ও পরীক্ষাস্বরূপ

সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে পিতা-মাতার প্রতি আমানতস্বরূপ। অন্যকথায়, সন্তানদের যত্ন নেওয়ার দায়িত্ব আল্লাহ পিতা-মাতার ওপর দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি পিতা-মাতাকে নির্দেশনাও দিয়েছেন যথোপযুক্ত উপায়ে সন্তানদের গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাতে। খুব স্বাভাবিকভবেই এই আমানতের খেয়ানত করার অর্থ হলো—আল্লাহর দেওয়া আমানতের খেয়ানত করা। আমরা যদি নিজেদের সর্বোচ্চ সামর্থ্য ব্যয় করে সন্তান প্রতিপালনের কাজটি সম্পাদন করতে চাই এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে মর্যাদা বৃদ্ধির আশা পোষণ করি, তবে সর্বাগ্রে সন্তান লালন-পালনের প্রকৃতি, এর পুরস্কার ও শাস্তির ব্যাপারে সম্যক ধারণা লাভ করতে হবে।

দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা অর্জনের জন্য জীবনে কোন কোন বিষয় গুরুত্বপূর্ণ, তা জ্ঞানবান মুসলিম মাত্রই অনুধাবন করতে পারে। তবুও তাদের উপলব্ধিতে এই বিষয়টি থাকা উচিত—সন্তানের সুন্দর জীবনের জন্য কেবল খাদ্য, বস্ত্র ও জাগতিক সামগ্রীই যথেষ্ট নয়; বরং নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও আদর্শিক শিক্ষার মাধ্যমে তাদের গড়ে তোলাও আবশ্যক। যাতে তারা সমাজের একজন ভালো মানুষ ও আল্লাহর অনুগত বান্দা হিসেবে বেড়ে উঠতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

সন্তান প্রতিপালন পদ্ধতি মূলত তাদের দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গলজনক বিষয়কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়, যা পিতা-মাতার দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীতে শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক প্রশান্তি লাভ এবং পরকালীন জীবনে ভালো ফলাফল অর্জন নির্ভর করে সন্তান প্রতিপালনে সফল হওয়ার ওপর।

বান্দা পরকালে নিজের মর্যাদাকে সমুন্নত অবস্থায় দেখে বলবে—

> 'হে আল্লাহ! আমি এই মর্যাদার অধিকারী কীভাবে হলাম?' আল্লাহ বলবেন—'মৃত্যুর পর তোমার সন্তানরা তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছে, সে কারণে তুমি এই মর্যাদার অধিকারী হয়েছ।'
> আহমাদ ও ইবনে মাজাহ

সন্তান প্রতিপালনের পুরস্কার যেমন বিশাল, তেমনি এর ব্যর্থতার শাস্তিও অত্যন্ত কঠোর। একজন শিশুর যত্নের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার, বিশেষত মাতার শারীরিক উপস্থিতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সন্তান বড়ো হওয়ার সাথে সাথে পিতা-মাতার মাঝে শঙ্কা বাড়তে থাকে; তার স্বাস্থ্য, পড়াশোনা ও বিভিন্ন সামাজিক বৈরী পরিস্থিতিতে টিকে থাকার সক্ষমতা নিয়ে। এই শঙ্কা বা উদ্বেগ অমূলক নয়; কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে সচেতন পিতা-মাতার মনে রাখতে হবে, আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে কেবল আল্লাহর ইবাদতের জন্যই। তাই সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পেরেশানি যেন আমাদের আল্লাহর ইবাদত থেকে বিমুখ করতে না পারে, সে ব্যাপারেও সচেতন থাকতে হবে।

> 'ওহে, যারা বিশ্বাস করো! তোমাদের সম্পদ ও সন্তানাদি যেন তোমাদের আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে না সরিয়ে দেয়। যে ব্যক্তি তা করবে, সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' সূরা মুনাফিকুন : ৯

একজন বিশ্বাসী নিজ সন্তানের থেকে প্রাপ্ত সকল পরিতুষ্টি ও দুঃখের জন্য আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

এক বিরাট দায়িত্ব

সন্তান প্রতিপালন মানে কেবল পিতৃত্ব কিংবা মাতৃত্ব নয়। পিতৃত্ব বা মাতৃত্ব শুধু শারীরিক প্রক্রিয়ার ফলাফল, কিন্তু সন্তান প্রতিপালন হচ্ছে জীবন প্রক্রিয়ার একটি সচেতন কার্যক্রম। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া—যেখানে একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ

www.nagorikpathagar.org

আরেকজন নবাগত অপরিপক্ব মানুষের শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিচর্যা এবং তার উন্নতি সাধনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। তাই সন্তান প্রতিপালনের জন্য মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক পরিপক্বতা প্রয়োজন। কারণ, প্রত্যেক অভিভাবককে একই সঙ্গে একজন শিক্ষক, পরামর্শক ও আধ্যাত্মিক পথনির্দেশকের দায়িত্ব পালন করতে হয়।

পিতা-মাতাও মানুষ, প্রকৃতিগত কারণে তাঁদেরও অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এই সীমাবদ্ধতার কারণে কোনো পিতা-মাতাই সন্তান প্রতিপালনে শতভাগ সফল হতে পারে না। আর সন্তান প্রতিপালনের এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের কারণে কোনো পিতা-মাতাই বিচার দিবসে পাকড়াও হবে না। তথাপি পিতা-মাতাকে এই ব্যাপারে আরও সচেতন হওয়া উচিত। কেননা, তাদের ভঙ্গুর কাঁধে অর্পিত হয়েছে আল্লাহর প্রতিনিধি প্রতিপালনের ভারী বোঝা।

পরিবার হচ্ছে পৃথিবীর ভেতর আরেকটি ক্ষুদ্র পৃথিবী; যেখানে আল্লাহর দেওয়া নির্দেশনা অনুসারে দায়িত্ব পালন এবং কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। এখানে পারস্পরিক ভালোবাসা, আন্তরিকতা, আপস, সম্মানসহ বিভিন্ন মানবিক বৈশিষ্ট্য পরিবারের সদস্যদের মধ্যকার সম্পর্ককে সুদৃঢ় করে।

ব্যক্তি নয়; একটি সমাজ গড়ে উঠে পরিবারের ওপর ভিত্তি করে। নতুন শিশুর জন্মের সাথে সাথে একটি নতুন পারিবারিক ইউনিট গড়ে ওঠে। অভিভাবকের কর্তব্য হলো—নিজের সক্ষমতাকে পরিবারের সদস্যদের কল্যাণে ব্যয় এবং এমন একটি পারিবারিক পরিবেশ তৈরি করা, যাতে সন্তানরা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে চলার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা লাভ করতে পারে।

কথার চেয়ে কাজ কঠিন

সন্তান প্রতিপালনের এই পথ অনেক উত্থান-পতন, অপ্রত্যাশিত ঘটনা ও চ্যালেঞ্জে পরিপূর্ণ, যা অভিভাবক-সন্তান উভয়ের ব্যক্তিত্ব গঠনে ভূমিকা রাখে। সৎ ও আত্মসচেতন পিতা-মাতা নিজদের ওপর প্রদত্ত দায়িত্ব পালনে কোনো প্রকার গড়িমসির আশ্রয় নেয় না। অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে তারা দৃঢ় ও সুপরিকল্পিত উপায়ে নিজেদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। সুষ্ঠু পরিকল্পনাহীন সন্তান প্রতিপালন অচেনা ভূখণ্ডে কোনো প্রকার ম্যাপ বা পথনির্দেশিকা ছাড়া ভ্রমণ করার নামান্তর।

www.nagorikpathagar.org

পিতা-মাতা পরস্পরের পরিপূরক দক্ষতা ও স্বভাবের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে, যা সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে খুবই প্রয়োজনীয়। কিছু কাজ মায়ের জন্য সহজ, কিছু কাজ বাবার জন্য সহজ। সন্তান প্রতিপালনের পুরো কাজটি পিতা-মাতা উভয়ের সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সাধিত হয়। পিতা-মাতা উভয়ের লক্ষ্য একই গন্তব্যের দিকে ধাবিত হওয়ার জন্য উভয়ের সমন্বিত পরিকল্পনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেবল সমন্বিত পরিকল্পনার অভাবে পরিবারে মতপার্থক্য ও সন্দেহ-সংশয়ের সৃষ্টি হতে পারে। 'যদি প্রস্তুত হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হন, তবে ব্যর্থতার জন্য প্রস্তুত হন।' আমাদের কার্যক্রম এবং জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে এই প্রবাদটির যথার্থতা রয়েছে।

আমরা শিক্ষকদের কাছে প্রত্যাশা করি, তারা যেন সন্তানদের পাঠদানের জন্য পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির পেছনে যথেষ্ট সময় ব্যয় করে। কিন্তু সন্তানকে যথাযথভাবে গড়ে তোলার জন্য নিজদের সময় দেওয়ার কথা বেমালুম ভুলে যাই! সন্তান প্রতিপালনের সর্বোচ্চ ফলাফল লাভের জন্য এবং সুপ্ত সম্ভাবনা বিকাশের জন্য সচেতন পিতা-মাতা নিজেদের সার্বিক ধ্যান-জ্ঞান, চিন্তা-চেতনা এর পেছনে ব্যয় করে। কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য অর্জনে তারা সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়।

তারা কোনো ভুল করবে না—এমনটা নিশ্চিত করে বলা যায় না। আমরা সবাই ভুল করি, কিন্তু চিন্তাশীল অভিভাবক নিজেদের সীমাবদ্ধতাগুলো খুব স্বাভাবিকভাবেই স্বীকার করে এবং সন্তান প্রতিপালনের পুরো প্রক্রিয়া থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। তারা সন্তানদের গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এমন পন্থা অবলম্বন করে, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সমস্যাকে হ্রাস করে এবং পরিবারে স্থিতিশীল অবস্থা বজায় রাখে।

রাসূল ﷺ বলেন—

> 'তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তাদের দায়িত্বের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে।' বুখারি ও মুসলিম

আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা

> 'ওহে বিশ্বাসীরা! তোমরা নিজেদের এবং নিজেদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।' সূরা আত-তাহরিম : ৬

www.nagorikpathagar.org

এই আয়াতটি মুসলিমদের ওপর আরোপিত আসমানি দায়িত্বের সারমর্ম বহন করে। একজন মুসলিমের নৈতিক ও আবশ্যিক কর্তব্য হলো—কাছের ব্যক্তিদের সৎ কাজের আদেশ দেওয়া এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা। সন্তানের সবচেয়ে কাছের ব্যক্তি এবং জিম্মাদার হলো পিতা-মাতা। জিম্মাদার হিসেবে পিতা-মাতার এই কর্তব্যকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে।

সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব মুসলিম জীবনের অপরিহার্য অংশ। ইসলামের প্রকৃত অস্তিত্বকে যথাযথ ও স্বাভাবিক উপায়ে জারি রাখার জন্য প্রত্যেক পিতা-মাতার অবশ্য কর্তব্য হলো—সন্তানদের মাঝে ইসলামের সঠিক বার্তা পৌঁছে দেওয়া এবং এর মাধ্যমে তাদের মনে ইসলাম প্রতিষ্ঠার অনুভূতি তৈরি করা।

বিভিন্ন বাস্তবিক কারণে অনেক পিতা-মাতার পক্ষে একাকী এমন কঠিন দায়িত্ব পালন করা সম্ভবপর হয় না। সেক্ষেত্রে সমাজের দায়িত্ব হলো—পরস্পরের মাঝে একটি যোগসূত্র (Network) তৈরি করা এবং সমাজের প্রত্যেককেই এই যোগসূত্রের আওতায় আনার চেষ্টা করা। অন্যান্য সমাজের ন্যায় মুসলিম সমাজেও কিছু 'দুর্বল' পরিবার থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে সমাজের কর্তব্য হলো—এই সকল পরিবারকে সহায়তার জন্য পরিকল্পিত কাঠামো নির্মাণ করা। সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব প্রধানত পিতা-মাতার ওপরই বর্তায়। সেক্ষেত্রে পিতা-মাতা নিজ সামর্থ্যের সর্বোচ্চটুকু দিয়ে সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব পালন করল কি না, তা নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে সমাজের খুব বেশি কিছু করার নেই।

কুরআন বলে—

> 'একজন অপরজনের বোঝা বহন করবে না এবং কারও ওপর সাধ্যাতীত বোঝা চাপানো হয় না।'

তবুও পরিবার, সমাজ ও মানবতার জন্য কাজ করা প্রত্যেক মানুষেরই কর্তব্য।

সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের দায়িত্ব

সন্তান আগমনের মুহূর্তে বাবা-মায়ের মন প্রবল আগ্রহ-উদ্দীপনায় ভরপুর থাকে। তারা অগাধ ভালোবাসা ও আবেগ ঢেলে দিয়ে সন্তানের অতিরিক্ত যত্ন নিতে উন্মুখ হয়ে থাকে। সন্তান ও পিতা-মাতার মধ্যকার এই সম্পর্কই একটি পরিবারের মূল ভিত্তি। যখন এই সম্পর্ক খাঁটি ও দৃঢ় ভালোবাসায় রূপান্তরিত হয়, তখন তা ভাই-বোন, চাচা-চাচিসহ পরিবারের সবাইকে পারস্পরিক ভালোবাসার চাদরে আবৃত করে।

www.nagorikpathagar.org

'মানুষ সামাজিক জীব'—বড়োদের এই বুলিটি মূল্যবান এক ধারণা বহন করে। এর অর্থ হলো—সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের মধ্যে এমন এক সম্পর্ক গড়ে উঠা অপরিহার্য, যার ভিত্তিতে তারা পারস্পরিক কর্তব্য সম্পূর্ণরূপে পালন করতে পারে। মূলত সামাজিক সম্পর্ক সবার অন্তরে প্রশান্তি তৈরি করে। অন্যের অধিকার আদায়, মানুষকে সাহায্য করা এবং কোনো ধরনের বিনিময় ছাড়াই সমাজের সেবা করা নিঃসন্দেহে দ্বীনের অন্যতম কাজ। এর মাধ্যমে সমাজে শান্তি আসে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়।

ব্যক্তিতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় মানুষ নিজের চাহিদা পূরণের জন্য স্বার্থপর জীবনযাপন করে। যে সমাজে প্রত্যেকেই নিজের 'খুশি' নিয়ে মগ্ন থাকে, সে সমাজ থেকে মানবতা দূরে সরে যায়। এই ধরনের সমাজ অর্থলিপ্সা ও অসুস্থ প্রতিযোগিতায় পরিপূর্ণ। তারা এমন এক বস্তুবাদে অভ্যস্ত, যেখানে মানুষ একে অপরের ওপর প্রাধান্য বিস্তারের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। এটা মূলত 'জোর যার মুল্লুক তার' ধারণারই প্রসার ঘটায়। এর মাধ্যমে সমাজের সিংহভাগ মানুষের শ্রমের বিনিময়ে ক্ষুদ্র একটি অংশ ধনী ও প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। এই ধরনের সমাজ কখনো প্রকৃত উন্নতি লাভ করতে পারে না। কারণ, এখানে প্রভাবশালী ধনীরা ক্ষমতার দাপটে সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের নৈতিকতার তোয়াক্কা করে না। সমাজের অন্যান্য সদস্যরাও এই 'স্ট্যাটাস' অর্জনের জন্য নিজেদের বিকিয়ে দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। অসংখ্য সামাজিক সমস্যা এই সমাজকে এমনভাবে পঙ্গু করে রাখে, তা একটি বিশৃঙ্খলাপূর্ণ ভাগাড়ে পরিণত হয়। ফলে বাস্তবিক অর্থে এই সমাজের কোনো মানুষই সুখী হয় না।

ইসলাম মানুষের সৃজনশীলতা ও নতুনত্বকে উৎসাহিত করে, কিন্তু অধিকতর জোর দেয় সামাজিক দায়িত্বশীলতার দিকে। এটি মানুষকে তাৎক্ষণিক আত্মতুষ্টির পরিবর্তে ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতাবোধের শিক্ষা দেয়। একই সঙ্গে যথোপযুক্ত উপায়ে সন্তান প্রতিপালনের অংশ হিসেবে সন্তানকে কেবল একজন ব্যক্তি হিসেবে না দেখে সমাজের অন্যতম ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করতেও শেখায়। যখন প্রত্যেকটি পরিবার নিজেদেরকে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ মনে করে, সকলের কল্যাণের জন্য সমন্বিতভাবে কাজ করে, তখন এই সমাজ শ্রেষ্ঠতম সমাজ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হয়।

www.nagorikpathagar.org

ইতিবাচক প্যারেন্টিং: একটি সৃষ্টিশীল প্রচেষ্টা

বাগানের চারাগাছ আর স্কুলের (নার্সারি) শিশুর মধ্যে চমৎকার একটা মিল রয়েছে। চারাগাছের যথাযথ পরিচর্যা করা হলে তা একদিন ফুলে-ফলে পরিপূর্ণ বৃক্ষে রূপ নেয়। একইভাবে একটি শিশুর যথাযথ পরিচর্যা করা হলে সে ক্রমান্বয়ে একজন সফল ও ভারসাম্যপূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠে।

অঙ্কুর পরিচর্যার ক্ষেত্রে অবহেলা করলে তা যেমন অনেক ধরনের সমস্যা নিয়ে বড়ো হয়, ঠিক তেমনি কোনো শিশুর লালন-পালনে অবহেলা করা হলে সে বিভিন্ন ধরনের মানসিক সমস্যা, উচ্ছৃঙ্খলতা ও আত্ম-ধ্বংসাত্মক জীবনাচারের মধ্য দিয়ে বড়ো হয়। আমাদের মনে রাখতে হবে, উন্নতমানের খাবার, পোশাক ও বাসস্থান প্রদান করার মাঝেই কেবল সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ নয়; বরং সন্তানদের সহমর্মিতা প্রদান, তাদের সাথে বোঝাপড়া, মানসিক সাহচর্য, তাদের মাঝে নৈতিক মূল্যবোধ তৈরি এবং তাদের এই পৃথিবীতে চলার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন করে গড়ে তোলাও সন্তান পরিচর্যার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পিতা-মাতার মূল দায়িত্ব হলো পরিবারের মধ্যে একটি শান্ত, নিরাপদ ও সহযোগিতাপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করা, যা সন্তানদের মনে আত্মবিশ্বাসের জোগান এবং তাদের হৃদয় ভালোবাসায় ভরিয়ে দেবে—যাতে তারা এই ভালোবাসার আলোকচ্ছটা সমাজের অন্য মানুষদের মাঝেও ছড়িয়ে দিতে পারে। পরিবারের প্রত্যেক সদস্য যদি সৎ গুণাবলিসম্পন্ন হয়, তাহলে এর ফলাফল পুরো সমাজ ভোগ করে। সুষ্ঠু পরিকল্পনা, কঠোর পরিশ্রম এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমেই এই উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব। তবে এটি কেবল একক পরিবারের প্রচেষ্টায় সম্ভব নয়; বরং এর জন্য প্রয়োজন সমাজের প্রত্যেক পরিবারের যৌথ প্রচেষ্টা।

দুর্ভাগ্যবশত অনেক পিতা-মাতা সন্তান প্রতিপালন করে অনেকটা গা ছাড়াভাবে। এ যেন 'করার জন্য করা' বা 'করতে হয়, তাই করে'। তারা সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্বটাকে অনেকটা 'আকস্মিক' (Accidental) বলেই মনে করে। এর জন্য তাদের না থাকে কোনো সুষ্ঠু পরিকল্পনা, না থাকে কোনো প্রস্তুতি। আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্পিত এই দায়িত্বের গভীরতা ও সুফলের ব্যাপারে তাদের কোনো ধারণাই থাকে না। তারা সন্তানদের বস্তুবাদী চাহিদা হয়তো পূরণ করে, কিন্তু তাদের আধ্যাত্মিকতার ছোঁয়া দিতে পারে না। ফলে যখন তারা কোনো সামাজিক কিংবা মানসিক সমস্যার মুখোমুখি হয়, তখন আধ্যাত্মিকতার তীব্র অভাব ও প্রয়োজন অনুভব করে। এই পর্যায়ে তারা আবেগতাড়িত হয়ে অপরিপক্ব সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে এবং সন্তানদের দূরে ঠেলে দেয়। এটা কোনোভাবেই সন্তান প্রতিপালনের আদর্শ পদ্ধতি হতে পারে না; বরং আদর্শ পদ্ধতি ঠিক এর বিপরীত।

www.nagorikpathagar.org

সচেতন পিতা-মাতা অল্পবয়স থেকেই সন্তানদের সাথে আন্তরিকভাবে মেলামেশা করে। যেকোনো ধরনের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে তাদেরকে যোগ্য সঙ্গ দেয়। ফুলকুঁড়ির ন্যায় তাদের মাথায় পরশ বুলিয়ে দেয়। যখন সন্তান সাহায্যের প্রয়োজন অনুভব করে, তখন পরিবারকে তারা আন্তরিক, সমভাবাপন্ন ও সহায়ক হিসেবে পাশে পায়।

সন্তান প্রতিপালন আর দশটা সৃজনশীল প্রচেষ্টার মতোই একটি চ্যালেঞ্জিং কাজ। কিন্তু এটি সহজ হয়ে যায়, যখন পিতা-মাতা সন্তানদের পার্টনার হিসেবে বিবেচনা করে। এমন পার্টনার, যাদের সাথে মতদ্বন্দ্বের পরিবর্তে একসঙ্গে কাজ করা যায়। সচেতন পিতা-মাতা কোনো সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে অগ্রিম পদক্ষেপ নেয় এবং সমস্যা জটিল আকার ধারণ করার আগেই সমাধানের ব্যবস্থা করে। সন্তানদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে তারা রাগান্বিত ও কঠোর হওয়ার পরিবর্তে কোমল ও অমায়িক হয়। তাদের সাথে দূরত্ব তৈরির পরিবর্তে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করে।

সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং এর প্রতি রুষ্ট কোনো সদস্যের দ্বারা সমাজবিরোধী কার্যকলাপ সংঘটিত হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাই সন্তানদের সামাজিক করে গড়ে তুলতে হবে। সর্বোপরি একজন অভিভাবক নিজের সর্বোচ্চ সামর্থ্য অনুযায়ী সন্তানকে গড়ে তোলার চেষ্টা করবে; বাকি ফলাফলের জন্য আল্লাহর ওপর নির্ভর করবে।

দুর্বল প্যারেন্টিং-এর কারণ

যোগ্য সঙ্গদান ও তদারকির মাধ্যমে সন্তানদের যথাযথভাবে প্রতিপালন করা এবং তাদের দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার জন্য যোগ্য করে তোলার নাম সার্থক প্যারেন্টিং। এর বিপরীতটাই হলো দুর্বল প্যারেন্টিং। দুর্বল প্যারেন্টিং-এর কিছু কারণ রয়েছে—যেগুলোর ব্যাপারে প্রত্যেকের সচেতন থাকা জরুরি। যেমন :

অজ্ঞতা : সন্তান প্রতিপালন সম্পর্কে অজ্ঞতা দুর্বল প্যারিন্টিং-এর প্রধান কারণ। অধিকাংশ পিতা-মাতাই সন্তান প্রতিপালন পদ্ধতি সম্পর্কে জানে না কিংবা জানলেও এই ব্যাপারে তাদের কোনো পরিষ্কার ধারণা থাকে না। অনেক পিতা-মাতা মনে করে, সন্তান আপনাআপনি সবকিছু শিখে নেবে এবং সচ্চরিত্রের অধিকারী হবে।

www.nagorikpathagar.org

সন্তান ভূমিষ্ঠের পর সবকিছু যথাযথভাবে সম্পন্ন হবে এবং তারা নিজের থেকেই পিতা-মাতার পন্থা অনুসরণ করবে—এরূপ ধারণা পোষণ করার ফলাফল খুবই মারাত্মক। সন্তান প্রতিপালন একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব, যা জীবনের অন্য সকল গুরুত্বপূর্ণ দিকের মতোই সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং কঠোর পরিশ্রমের দাবি রাখে। এই বিষয়টিকে অগ্রাহ্য করার অর্থ হলো—সন্তানদের ভবিষ্যৎকে বিপদের মধ্যে ফেলে দেওয়া।

এর মানে আবার এই নয়, সন্তানদের উপযুক্ত উপায়ে গড়ে তোলার জন্য পিতা-মাতাকে প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি অর্জন করতে হবে; বরং এর অর্থ হলো—পিতা-মাতাকে অবশ্যই মৌলিক দুটি বিষয় অর্জন করতে হবে :

- সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করা, যাতে সন্তানদের আল্লাহর ইবাদতের জন্য সর্বোচ্চ উপায়ে গড়ে তোলা যায়।
- সমাজ ও সমসাময়িক বিষয় সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করা, যাতে সন্তানদের আদর্শ নাগরিকরূপে এবং পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের উপযুক্ত সদস্য হিসেবে গড়ে তোলা যায়।

আত্মতুষ্টি : পিতা-মাতার অতিরিক্ত আত্মতুষ্টির ফলে সন্তানরা বিপথে যেতে পারে। একই সঙ্গে এটি প্যারেন্টিং প্রক্রিয়াকে দুর্বল করে দেয়। পিতা-মাতা যখন শিশু সন্তানের অসৎ সঙ্গ, মাদকাসক্তি এবং সমাজবিরোধী কার্যক্রমে জড়িয়ে পড়ার খবর শুনতে পায়, তখন তারা খুব স্বাভাবিকভাবেই ভাবে, আমার সন্তান এগুলো করতেই পারে না। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে—বিপদ সকল জায়গায় ছড়িয়ে আছে এবং ইন্টারনেটের সহজলভ্যতার কারণে এই সকল বিপদ আমাদের ঘরে এসেও হানা দিচ্ছে। তাই সন্তানদের উপযুক্ত বয়সে সকল ধরনের সম্ভাব্য বিপদের ব্যাপারে সতর্ক করতে হবে এবং এ ব্যাপারে একটি মানদণ্ড নির্ধারণ করা বুদ্ধিমানের কাজ। তবে সন্তানদের সর্বদা সন্দেহের চোখে না দেখে বিশ্বাসের চোখে দেখতে হবে।

উদাসীনতা : উদাসীনতার কারণে অনেক পিতা-মাতা সন্তানদের বিপথের দিকে ঠেলে দেয় অথবা তাদের যোগ্যরূপে গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়। পিতা-মাতাকে সন্তানের মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, শারীরিক ও আধ্যাত্মিক চাহিদার ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। পাশাপাশি, জীবনের প্রথম দিন থেকেই তাদের মধ্যে বিভিন্ন গুণাবলির সন্নিবেশ ঘটাতে হবে। উদাসীন অভিভাবক সন্তানদের প্রয়োজন জানা সত্ত্বেও গড়িমসি করে এবং বিশ্বাস করে, তারা বড়ো হওয়ার পর নিজেরাই এসব সামলে নেবে। এই মানসিকতা সন্তানদের জন্য নেতিবাচক ফলাফল বয়ে আনে।

www.nagorikpathagar.org

প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার সাথে সাথে সন্তানদের একটা ভালো-মন্দ চরিত্র আপনা থেকেই তৈরি হয়ে যায়। যদি পিতা-মাতা শৈশবকাল থেকেই সন্তানের চরিত্র গঠনের ব্যাপারে সচেতন না হয়, তাহলে প্রাপ্তবয়স্ক হলে তাদের চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখা পিতা-মাতার পক্ষে আর সম্ভব হয় না। তাই সূচনালগ্ন থেকেই সন্তানের সার্বিক ব্যাপারে পিতা-মাতাকে সচেতন থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতার ঘাটতি : অভিজ্ঞতার ঘাটতির কারণেও অনেক সময় প্যারেন্টিং-এ দুর্বলতা তৈরি হয়। নতুন পিতা-মাতার মধ্যে অবধারিতভাবেই অভিজ্ঞতার ঘাটতি থাকে। কিন্তু এটাকে অজুহাত হিসেবে গ্রহণ করে বসে থাকার কিংবা ভুল করার সুযোগ নেই। কারণ, আমরা এমন এক সমাজে বাস করি, যেখানে এই ব্যাপারে জানার জন্য অসংখ্য তথ্য ও সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান রয়েছে। নতুন পিতা-মাতা নিজেদের শৈশবকালে প্রতিপালিত হওয়ার স্মৃতি এবং সমাজের অন্যান্য অভিজ্ঞ অভিভাবকদের নিকট সন্তান প্রতিপালনের উপায় সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারেন। অভিজ্ঞতার অভাব কখনো যৌক্তিক অজুহাত হতে পারে না।

পূর্বসূরিদের অনুসৃত পদ্ধতির অনুসরণ : সন্তান প্রতিপালন পদ্ধতি অবস্থান ও পরিবেশ ভেদে কিছুটা পরিবর্তন হয়। এক্ষেত্রে পুরাতনকে সর্বসাকুল্যে আঁকড়ে না ধরে যুগোপযোগী পদ্ধতি অবলম্বন জরুরি; অন্যথায় প্যারেন্টিং প্রক্রিয়া দুর্বল হয়ে যায়। যদিও সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে সকল মুসলিমের লক্ষ্য ও প্রেরণা একই দিকে নিবদ্ধ, তবুও আমরা যে সমাজে বসবাস করি, সে সমাজের সাথে সংগতিপূর্ণ পদ্ধতির অনুসরণই শ্রেয়। বর্তমানে অনেক মুসলিম প্রবাসে অবস্থান করেন। সেখানকার অবস্থান ও পরিবেশ সম্পূর্ণ ভিন্ন। এক্ষেত্রে তাদের পূর্বনির্ধারিত পদ্ধতি নতুন পরিবেশে প্রযোজ্য না-ও হতে পারে।

পারিবারিক বিপদ : দুর্ঘটনা, অর্থাভাব ও দুর্ভাগ্য কোনো ধরনের সতর্কবার্তা ছাড়াই একটি পরিবারকে গ্রাস করে নিতে পারে, যা বেদনা এবং দীর্ঘস্থায়ী দুঃখের কারণ হতে পারে। যেকোনো ক্ষেত্রে পারিবারিক সমস্যা অভিভাবকের ওপর কঠিন চাপ সৃষ্টি করে। কারও সাহায্য ছাড়া এই দায়িত্ব পালন খুবই কঠিন। এই ক্ষেত্রে যতটুকু সম্ভব পুরো পরিবার ও সমাজের সহযোগিতা প্রয়োজন, যেন সন্তানরা নিজেদের অবস্থান হারিয়ে না ফেলে এবং সন্তান প্রতিপালনের মতো কঠিন ও ভারী দায়িত্ব অসাবধানতাবশত কেবল একজন অভিভাবকের কাঁধে না পড়ে।

www.nagorikpathagar.org

জীবনের চাপ : আধুনিক জীবন হচ্ছে ইঁদুর দৌড়ের ন্যায়। আর্থিক ও ক্যারিয়ারসংক্রান্ত দায়িত্ব এবং সামাজিক বাস্তবতার কারণে অনেক অভিভাবক দিশা হারিয়ে ফেলে। একই সঙ্গে অনেকগুলো দায়িত্বের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখাও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এমতাবস্থায় সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

দুঃখজনকভাবে, বর্তমান সময়ে জীবনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজের কাছে সন্তানদের আধ্যাত্মিক চাহিদাকে গৌণ মনে করা হচ্ছে। মানুষ সাধারণত নিজের জন্য যা গুরুত্বপূর্ণ মনে করে, তার জন্য বিশেষ সময় বরাদ্ধ রাখে। মানুষ সন্তান প্রতিপালনের জন্য আলাদা সময় বরাদ্দ করতে চায় না। এর অর্থ দাঁড়ায়—তারা সন্তান প্রতিপালনকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না; অথচ সন্তান তার পিতা-মাতার নিকট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ ও বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচ্য হওয়া উচিত। এটি এমন একটি মূলবান বিষয়, যা যাবতীয় বৈষয়িক সম্পদ ও ক্যারিয়ারের চেয়ে অধিক ফলাফল বয়ে আনতে সক্ষম। তাই সন্তানকে উপেক্ষা করে বাহ্যিক সম্পদকে গুরুত্ব দেওয়া বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়।

মহৎ কিছুর প্রস্তুতি

ইসলামের মূল উদ্দেশ্য হলো—এমন একটি পৃথিবী তৈরি করা, যেখানে মানবজাতি হবে সকল ধরনের অজ্ঞতা ও জাহেলিয়াত থেকে মুক্ত। আর এটার জন্য প্রথম পদক্ষেপ হবে সবার অন্তরগুলোকে শিক্ষিত ও মুক্ত করা।

একসময় ইসলাম পালনের অর্থই ছিল জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ করা। নন্দনতত্ত্ব (Aesthetic) থেকে প্রাণিবিদ্যা (Zoology) সর্বক্ষেত্রেই মুসলিমরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। ইসলাম এই ব্যাপারে পরিষ্কার নির্দেশনা দিয়েছে, যাতে মুসলিমরা বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক কল্যাণমূলক কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে উৎসাহিত হয়। এককথায়—শুধু পরোক্ষ নিরীক্ষকের ভূমিকা পালন না করে সমাজের একজন মূল্যবান ও সক্রিয় সদস্য হিসেবে কাজ করতে ইসলাম নির্দেশনা দেয়।

পূর্বে মুসলিমরা সারা বিশ্বে শাসকের ভূমিকায় ছিল; যদিও তারা সংখ্যালঘু ছিল এবং জনসংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। তারা একদিকে সন্তানদের কাছে, অন্যদিকে পুরো সমাজের কাছে ইসলামের প্রকৃত বাণী পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। আসমানি বিধানের ভিত্তিতে তারা এমন একটি সভ্যতার সীমানা বিস্তৃত করেছিল, যেখানে কোনো ধরনের জোর-জবরদস্তি ছিল না।

www.nagorikpathagar.org

তখনকার মুসলিমদের চরিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অন্যান্য সকল ধর্মের নারী-পুরুষ ও শিশু দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেছে। ইসলাম ওই মানুষদের অন্তরে প্রশান্তি জুগিয়েছে এবং বিভিন্ন বিশ্বাসে পরিপূর্ণ সমাজব্যবস্থায় পারস্পরিক সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠা করেছে।

পিতা-মাতার উচিত সন্তানদের ইতিবাচক পরিবর্তনে আগ্রহী করে তোলা। সন্তানরা যেন সমাজে আত্মবিশ্বাসের সাথে চলতে পারে, সেজন্য পিতা-মাতার উচিত তাদের জন্য স্থিতিশীল ও ভালোবাসায় পূর্ণ পারিবারিক পরিবেশ নিশ্চিত করা। এই ক্ষেত্রে সন্তানদের দ্বীন ও দুনিয়ার জ্ঞান শিক্ষা দেওয়াও গুরুত্বপূর্ণ। একই সঙ্গে তাদের উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য অর্জনের পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করা আমাদের দায়িত্ব। এটি এমন লক্ষ্য, যা দুনিয়াবি মান-মর্যাদা ও অর্থ-বিত্তের আকাঙ্ক্ষার চেয়ে অল্পতে তুষ্ট হতে শেখাবে।

এই বইয়ের পরবর্তী অংশে আমি এমন কতগুলো বিষয় নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব, যা সচেতন অভিভাবকদের চিন্তার খোরাক জোগাবে।

www.nagorikpathagar.org

প্যারেন্টহুড-এর প্রস্তুতি

> 'আল্লাহ তাঁর দয়া-মায়ার শতকরা নিরানব্বই ভাগ নিজের কাছে রেখে বাকি এক ভাগ পৃথিবীর সকলের মাঝে ভাগ করে দিয়েছেন। এই এক ভাগের কারণেই সৃষ্টিকুল একে অন্যের প্রতি দয়াশীল। এমনকী ঘোড়া তার শাবক থেকে নিজের খুর দূরে রাখে সন্তান পিষ্ট হয়ে যায় কি না এই ভয়ে।'

বিয়ে, পরিবার ও প্যারেন্টহুড

পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের প্রথম ধাপ হলো বিয়ে। বিয়ে দুজন প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষকে আনন্দ, প্রশান্তি ও প্রবোধ জোগায়। এটি দুজনকে একই ছাদের নিচে বসবাস করার ক্ষেত্রে পারস্পরিক আপস-মীমাংসা ও ত্যাগের শিক্ষা দেয়। মানুষ যে ধরনের ব্যক্তিকে বিয়ে করতে চায়, তার ওপরই নির্ভর করে সন্তান কেমন হবে।

> 'সত্যাশ্রয়ী, সৎ ও বিশ্বাসী নারী-পুরুষ তাদের চরিত্রের সাথে সংগতিপূর্ণ ব্যক্তিকেই জীবনসঙ্গিনী হিসেবে দেখতে চায়। অপরদিকে অসৎ সঙ্গীরা প্রাকৃতিকভাবে একে অপরের সাথে বন্ধনে আবদ্ধ হয়।'
> সূরা নুর : ২৬

বিয়ে হলো দুটি মানুষ ও পরিবারের মাঝে জীবনব্যাপী এক প্রতিশ্রুতি। এটিকে খুঁটিও বলা চলে, যার ওপর ভিত্তি করে লালিত হয় ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। সুতরাং এই বন্ধন সুদৃঢ় হওয়া খুবই জরুরি। একটি বৈবাহিক বন্ধন সুদৃঢ় হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নেয়ামক হিসেবে কাজ করে—

www.nagorikpathagar.org

- ভালোবাসা ও দয়া
- সম্মান ও স্নেহ
- দৃঢ়তা ও ক্ষমাশীলতা
- ন্যায়বিচার ও সমতা
- সততা ও আন্তরিকতা
- খোলা মন ও স্বচ্ছতা
- পারস্পরিক পরামর্শ
- বিশ্বস্ততা
- ত্যাগ-তিতিক্ষা
- কঠোর পরিশ্রম এবং ছাড় দেওয়ার মনোভাব।

যখন কোনো পরিবারে এসব গুণাবলির সম্মিলন ঘটে এবং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক মজবুত হয়, তখন সেখানে একটি আদর্শিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়—যা সন্তানের বেড়ে উঠার জন্য খুবই সহায়ক।

পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের দায়িত্ব একই সঙ্গে অনন্য ও দুঃসাহসিক। এই দুঃসাহসিক কর্ম সম্পাদনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পাথেয় হলো নিজের সক্ষমতা ও আল্লাহর ওপর ভরসা করা, কমনসেন্স কাজে লাগানো, খোলা মনের অধিকারী হওয়া এবং অধিক ধৈর্যশীল হওয়া। এই গুণগুলো একজন মানুষকে কঠিন দায়িত্ব পালনে এবং সফলতা অর্জনে সহায়তা করে।

আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল অনেক সমস্যার সমাধান বের করে আনে। তাই পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের শুরু থেকে পুরোটা সময় জুড়ে আল্লাহর ওপর ভরসা করতে হবে। নিজের ক্যারিয়ার, অর্থ ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করে সন্তান জন্মদানের কোনো উপযুক্ত সময় নেই। তাই এই বিষয়গুলোকে অজুহাত হিসেবে গ্রহণ করে সন্তান জন্মদানে অহেতুক বিলম্ব করা উচিত না। স্বামী-স্ত্রীর অবশ্য কর্তব্য হলো—সন্তান জন্মলাভের আগে ও পরে এমন পরিবেশ তৈরির সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানো, যা সন্তান প্রতিপালনের চ্যালেঞ্জকে কমিয়ে দেবে। এরপর আল্লাহর ওপর নির্ভর করা। তাওয়াক্কুল হচ্ছে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা এবং আল্লাহর নিকট প্রতিনিয়ত ক্ষমা প্রার্থনার সমন্বয়।

www.nagorikpathagar.org

'যখন কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো, তখন আল্লাহর ওপর ভরসা করো। আল্লাহ তাঁর ওপর নির্ভরশীলদের ভালোবাসেন।'
সূরা আলে ইমরান : ১৫

পরিবার পরিকল্পনা

গর্ভকালীন অবস্থা নিঃসন্দেহে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্যই রোমাঞ্চকর একটা সময়। এই মুহূর্তটা দম্পতিদের জন্য একই সঙ্গে আনন্দদায়ক এবং ভয়ের কারণ। কেননা, প্রত্যেক পিতা-মাতাই সন্তানের নিরাপদ ও স্বাভাবিক জন্ম প্রত্যাশা করে। তারা এই সময়ে সন্তান জন্মের ব্যাপারে পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি গ্রহণ করে থাকে। তাদের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির মধ্যে থাকে ভ্রূণের বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে অধ্যয়ন, জন্মগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানা এবং বিভিন্ন ধরনের উপকরণ ক্রয়ের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা—যা সন্তান জন্মলাভের পর প্রয়োজন হতে পারে।

গর্ভাবস্থা এমন এক সময়, যার অভিজ্ঞতা কেবল নারীরাই পায়। শিশুকে গর্ভে ধারণ থেকে শুরু করে জন্মদান পর্যন্ত একজন নারীকে অনেক কষ্ট ও ব্যথা সহ্য করতে হয়। এ কারণেই ইসলামে বাবার থেকে মায়ের মর্যাদা বেশি। মূলত শিশুর জন্মলাভের পর থেকেই পিতা হিসেবে পুরুষের দায়িত্ব শুরু হয়। কিন্তু মায়ের ক্ষেত্রে গর্ভকালীন অবস্থা অনুভূত করার পর থেকেই অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব আরম্ভ হয় এবং তখন থেকেই তার ত্যাগ-তিতিক্ষা শুরু হয়। গর্ভকালীন মুহূর্ত থেকেই একজন মা শরীরের যত্ন নেওয়া শুরু করে এবং জীবন ধারণের প্রকৃতি ও খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করে।

এই সময়ে বিজ্ঞ পিতা-মাতারা নিজেদের মধ্যে ঠিক সেভাবে চরিত্র ও মূল্যবোধের সমাবেশ ঘটায়, যেভাবে তারা আপন সন্তানকে দেখতে চায়। এই সময়টি তারা কাঙ্ক্ষিত চরিত্রের অনুশীলন এবং সন্তান প্রতিপালনের বিভিন্ন উপায় সম্পর্কে ধারণা লাভ করার কাজে ব্যবহার করে। একটি শিশু যে পরিবেশে জন্মলাভ করে, তার একটা প্রভাব শিশুর মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতির ওপর প্রতিফলিত হয়। যে শিশু এমন পিতা-মাতার কোলে জন্মলাভ করে—যারা আল্লাহকে ভালোবাসে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, সে শিশুর জীবন ওই শিশুর থেকে উত্তমভাবে শুরু হয়, যার পিতা-মাতা এ সকল কাজ থেকে বিরত থাকে।

পিতা-মাতা যদি সালাত প্রতিষ্ঠা, দান-খয়রাত, কুরআন অধ্যয়ন, নিয়মিত জিকির এবং আল্লাহর নিকট প্রার্থনার মতো কল্যাণকর কাজের প্রতি অভ্যস্ত হতে পারে,

www.nagorikpathagar.org

তবে তা কেবল আগত শিশুর জন্য আদর্শ পরিবেশই সৃষ্টি করবে না; বরং গর্ভে থাকা শিশুর জন্য বিরাট কল্যাণও বয়ে আনবে। একজন মা যা বলে, যা করে এবং যা চিন্তা করে, তা তার গর্ভে অবস্থিত ভ্রূণকে প্রভাবিত করে এবং তাকে আধ্যাত্মিক প্রেরণা জোগায়। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক সহমর্মিতা, যোগাযোগ এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা এই সকল প্রস্তুতির পূর্বশর্ত।

নবাগত সদস্য

যখন কোনো পরিবারে নতুন সন্তান জন্মগ্রহণ করত, তখন আয়িশা ﵂ জিজ্ঞেস করতেন না সন্তানটি ছেলে নাকি মেয়ে; বরং তিনি জিজ্ঞেস করতেন—

> 'সে কি সুস্থ ও ভারসাম্যপূর্ণ?' যখন তাঁকে ইতিবাচক উত্তর দেওয়া হতো, তখন তিনি বলতেন—'সকল প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালার প্রতি।' বুখারি

সদ্য ভূমিষ্ঠ সন্তানের প্রথম দর্শন এমন এক অপ্রকাশযোগ্য অভিজ্ঞতা, যা কেউ-ই ভুলতে পারে না। অন্যরা যা-ই বলুক না কেন, ছোট্ট শিশুর জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস হলো মায়ের আঁচল, ভালোবাসা ও বুকের দুধ। মায়ের ভালোবাসা প্রদানের সবচেয়ে উত্তম পন্থা হলো—সন্তানের সাথে নিজের শরীরের সংযোগ ঘটিয়ে সব সময় কাছে থাকা। এর মাধ্যমে শিশুর সবচেয়ে অসহায় পরিস্থিতিতে নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা যায়।

প্রতিটি শিশুর জন্ম আল্লাহর অলৌকিকত্বের নিদর্শন। একটি অন্তর যখন জীবনের যাত্রা শুরু করে, তখন তা যেকোনো কিছু গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকে। এটি এমন একটি অবস্থা, যা আমাদের অসহায়ত্বের কথা এবং এই পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী জীবনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মনে করিয়ে দেয়, এইভাবে আমরাও জীবনের যাত্রা শুরু করেছিলাম। আল্লাহর অনুগ্রহে এবং আমাদের পিতা-মাতার প্রচেষ্টার ফলে এই জীবনচক্রে আমরা টিকে থাকতে সক্ষম হয়েছি। সন্তান ভূমিষ্ঠের ক্ষণটি এমন এক মুহূর্ত, যা আমাদের আল্লাহর সামনে মাথা নত করতে এবং পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হতে বাধ্য করে। এই মুহূর্তটি পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের দায়িত্ব পালনের আকাঙ্ক্ষাকে আরও দৃঢ় করে।

www.nagorikpathagar.org

শিশুর জন্মলগ্নে ইসলামি রীতি

শিশুর আগমনের সুসংবাদ অন্যান্য মানুষের নিকট পৌঁছাতে হয়। এটি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ। কুরআনে এই রীতির প্রতিফলন দেখা যায়। ফেরেশতারা আল্লাহর পক্ষ থেকে জাকারিয়া ﷺ-কে তাঁর অনাগত পুত্র সন্তান ইয়াহইয়া ﷺ-এর সুসংবাদ দিয়েছিলেন—

> 'আল্লাহ তোমাকে (অনাগত পুত্র সন্তান) ইয়াহইয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন। সে (সন্তান) আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি ফরমানের সত্যতা প্রমাণকারী হিসেবে আসবে। তাঁর মধ্যে নেতৃত্ব ও সততার গুণাবলি থাকবে। সে পরিপূর্ণ সংযমী হবে, নবুয়তের অধিকারী হবে এবং সৎকর্মশীলদের মধ্যে গণ্য হবে।' সূরা আলে ইমরান : ৩৯

একইভাবে আল্লাহ ইবরাহিম ﷺ-কেও তাঁর আগত সন্তানের সুসংবাদ দিয়েছিলেন—

> 'আমি তাঁকে একটি ধৈর্যশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।'
> সূরা সফফাত : ১০১

সন্তান আগমনের আনন্দ শুধু পিতা-মাতাকেই উদ্‌বেলিত করে না; বরং সমাজের অন্যান্য মানুষদেরও আনন্দিত করে। ফলে তারা নতুন সন্তানকে সাদরে বরণ করতে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে।

এই ক্ষেত্রে অনেক সাংস্কৃতিক প্রচলনও রয়েছে। যেমন—মিষ্টি বিতরণ, দরিদ্রদের খাওয়ানো ইত্যাদি। এগুলো করতে কোনো বিধিনিষেধ নেই, কিন্তু পরিবারে নতুন সদস্য আগমনের পর নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অবশ্যই পালন করতে হবে।

আজান : অধিকাংশ মুসলিম মনীষী মনে করেন, সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুর ডান কানে আজান দিতে হবে। একটি হাদিসে উল্লেখ রয়েছে—

> 'আজানের সময় শয়তান দূরে সরে যায়। এই চমৎকার শব্দের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহকে প্রতিপালক হিসেবে গ্রহণ করার সাক্ষ্য প্রদান করে।'

শিশুর কানে সর্বপ্রথম আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও মহত্ত্বের বাণী প্রবেশ করাতে হবে, যাতে এই বাণী তাদের অবচেতন মনে সর্বদা প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। বিশ্বাসীদের মাতা আয়িশা ﷺ বলেন—

www.nagorikpathagar.org

'আমি হুসাইন ইবনে আলির কানে রাসূল ﷺ-কে আজান দিতে শুনেছি, যখন তাঁর মাতা ফাতিমা তাঁকে জন্ম দেয়।' আহমাদ, আবু দাউদ ও তিরমিজি

তাহনিক : নতুন সন্তানকে সামান্য পরিমাণে চর্বিত খেজুর খাওয়ানো ভালো একটি চর্চা। এতে সদ্য জন্ম নেওয়া শিশুর জীবন মিষ্টান্নের সাথে শুরু হয়। আয়িশা رضي الله عنها বলেন—

'সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুদের রাসূল ﷺ-এর নিকট আনা হতো। তিনি শুরুতে তাদের কল্যাণের জন্য দুআ করতেন, তারপর তাদের মুখে চর্বিত খেজুরের টুকরো ঘষে দিতেন।' মুসলিম, আবু দাউদ

মাথার চুল মুণ্ডানো : রাসূল ﷺ সাধারণত জন্মের সপ্তম দিন শিশুদের মাথা সম্পূর্ণ মুণ্ডন করতেন। তারপর ফেলে দেওয়া চুল ওজন করে সমপরিমাণ সম্পদ দান করতেন। হাদিসে এসেছে, হাসান رضي الله عنه-এর জন্মের পর নবিজি ফাতিমা رضي الله عنها-কে বলেন—

'তাঁর চুল কামিয়ে ফেলো এবং এই চুল রুপার সাথে মেপে তা গরিবদের দান করো। তাই তিনি তাঁর চুল কামিয়ে ফেলেন, তারপর এটিকে মাপেন—যার ওজন ছিল এক দিরহাম কিংবা এক দিরহামের কিছু অংশের সমান।' আহমাদ ও বায়হাকি

আকিকা : নবাগত শিশুর আকিকা করা সুন্নত। অনেকে বলেন, এটি জন্মের সপ্তম দিন সম্পন্ন করা উচিত। ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, ছেলেদের জন্য দুটি এবং মেয়েদের জন্য একটি বকরি কুরবানি করা। সন্তানের জন্ম যেহেতু আনন্দ তৈরি করে, তাই এ উপলক্ষ্যে বন্ধু-বান্ধব ও নিকটাত্মীয়দের আমন্ত্রণ করা উচিত।

'প্রত্যেক শিশুর জন্মের সপ্তম দিনে তার আকিকা দেওয়া উচিত। অর্থাৎ তার জন্ম উপলক্ষ্যে পশু কুরবানি দেওয়া। একই দিনে নাম রাখা এবং মাথা মুণ্ডন করা।' আবু দাউদ ও আহমদ

'যে ব্যক্তি সন্তান লাভ করে এবং সে তার জন্য কিছু উৎসর্গ করতে চায়, সে যেন পুত্র সন্তানের জন্য দুটি এবং কন্যা সন্তানের জন্য একটি বকরি কুরবানি দেয়।' আবু দাউদ ও নাসায়ি

'প্রত্যেক শিশুর জন্য আকিকা দেওয়া উচিত। সুতরাং তার জন্য রক্ত প্রবাহিত করো এবং তার থেকে সকল ধরনের অকল্যাণ বিতাড়িত করো।' বুখারি, আবু দাউদ, তিরমিজি

www.nagorikpathagar.org

সুন্নতে খতনা : সুন্নতে খতনা এমন একটি বিধান, যা ইবরাহিম ﷺ-এর সুন্নাহ থেকে এসেছে। অনেকেই জন্মের সপ্তম দিনেই সুন্নতে খতনা সম্পন্ন করতে বলেন। আবার কেউ কেউ শিশুর প্রথম দাঁত পড়ে যাওয়ার পর খতনা করার পরামর্শ দেন। নিম্নোক্ত হাদিস মানুষের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিচ্ছন্ন করার গুরুত্ব বর্ণনা করে। তবে এর সাথে নিজের আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জনও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

> 'মানুষের ফিতরাত (সহজাত প্রবৃত্তি) পাঁচটি—খতনা, গোপনাঙ্গের চুল পরিষ্কার করা, গোঁফ ছোটো করা, নখ কাটা এবং বগলের চুল পরিষ্কার করা।' বুখারি ও মুসলিম

নাম রাখা : সুন্দর নাম একটি শিশুর অধিকার। কারণ, এই নামেই তাকে পুরো জীবনব্যাপী ডাকা হবে। মুসলিম পিতা-মাতার কর্তব্য হলো—সন্তানদের ভালো ও অর্থবহ নাম রাখার চেষ্টা করা। আল্লাহ ও তাঁর গুণাবলির সাথে সম্পর্কিত করে যেসব নাম রাখা হয়, সেগুলো উত্তম নাম। যেমন : আবদুল্লাহ, আবদুর রহমান ইত্যাদি। এ ছাড়াও নবিগণ ও পূর্ববর্তী মুসলিম মনীষীগণের নামের সাথে মিলিয়ে সন্তানের নাম রাখা উত্তম। তবে অবশ্যই নেতিবাচক ও অর্থহীন নাম পরিহার করতে হবে। কারণ, রাসূল ﷺ কুরুচিপূর্ণ ও খারাপ অর্থবোধক নামগুলোকে পরিবর্তন করে দিতেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'তাদেরকে তাদের পিতার নাম অনুযায়ী ডাকো, যা আল্লাহর মতে ন্যায়ের কাছাকাছি। তোমরা যদি তাদের পিতাকে না চেনো, তাহলে তারা দ্বীনের দিক দিয়ে তোমাদের ভাই এবং এমন মানুষ, যারা তোমাদের আশ্রয়ে রয়েছে।' সূরা আহজাব : ৫

সহোদরদের মধ্যে সমতা

পরিবারের নতুন সদস্য স্বাভাবিকভাবেই সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করে। ফলে ওই সময়টায় তার বড়ো সহোদর অপেক্ষাকৃত কম মূল্যায়িত হয়। এই ক্ষেত্রে পিতা-মাতাকে সতর্ক হয়ে অন্য সন্তানদের বোঝানো উচিত, তাদের প্রতি ভালোবাসা একটুও কমেনি। এক্ষেত্রে বয়স ও মেজাজ বুঝে তাদের ছোটোখাটো দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। যেমন : এটা-ওটা আনতে দেওয়া, মায়ের কাজে হালকা সাহায্য করা ইত্যাদি। এতে তারা ভাবে, তাদের মূল্যায়িত করা হচ্ছে। ফলে তারা নতুন সহোদরের সাথে আন্তরিক আচরণ করে, তাকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে না। পিতা-মাতার উচিত সহোদরদের একে অন্যের প্রতি যত্ন নেওয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করা।

www.nagorikpathagar.org

অন্যায্য উপায়ে ছেলে ও মেয়ের মাঝে বৈষম্য সৃষ্টি করা নিঃসন্দেহে ইসলামবিরুদ্ধ কাজ। ছেলেমেয়ে উভয়কে সমানভাবে আদর-যত্ন করতে হবে এবং সমান সুযোগ প্রদান করতে হবে। পাশাপাশি উভয়ের প্রতি সমপরিমাণ খেয়ালও রাখতে হবে। শিশুকালে সন্তানদের মাঝে ছেলেমেয়ে কোনো ভেদাভেদ থাকে না। বড়ো হয়ে তারা যখন কৈশোর ও যৌবন পায়, তখন তাদের মাঝে লিঙ্গভেদে চাহিদা ও বৈশিষ্ট্য আলাদা হয়। তারা যখন প্রকৃতিগতভাবে ধীরে ধীরে পুরুষ ও নারীর বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে থাকে। এ সময় তাদের চাহিদার মাঝেও বৈচিত্র্য দেখা দেয়। নারী-পুরুষ হয়ে গড়ে উঠার সময় পিতা-মাতার কর্তব্য হলো—তাদের সামনে একটু একটু করে লিঙ্গসংক্রান্ত বিষয়গুলো তুলে ধরা।

সচেতন পিতা-মাতা সন্তানদের বেড়ে উঠার বিভিন্ন ধাপের ব্যাপারে সতর্ক থাকেন এবং সবার মাঝে সমতা বিধান করেন। বালক ও বালিকা কখনো এক নয়; আবার তাকওয়ার মানদণ্ড ছাড়া তারা একজন অপরজন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠও নয়। কিয়ামতের দিন মানুষকে নিজের কর্মের ওপর ভিত্তি করে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে; সেখানে লিঙ্গ কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়। এক্ষেত্রে রাসূল ﷺ-এর শিক্ষা পরিষ্কার, যা তিনি বিভিন্ন উপলক্ষ্যে দেখিয়েছেন। যেহেতু আল্লাহর রাসূলের কোনো জীবিত ছেলে ছিল না, তাই তাঁর কন্যা ফাতিমা رضي الله عنها সহ অন্যান্য কন্যাদের সাথে তাঁর আচরণকে আদর্শ হিসেবে ধরা যেতে পারে।

> ‘তোমার সন্তানদের সাথে সমান আচরণ করো।’
> আহমাদ, আবু দাউদ ও নাসায়ি
>
> ‘যে প্রাপ্তবয়সে পৌঁছা পর্যন্ত দুই কন্যা সন্তানের যত্ন নেবে, পুনরুত্থান দিবসে আমি এবং সে এইভাবে থাকব—এ কথা বলার সময় তিনি তাঁর আঙুল দুটিকে কাছাকাছি নিয়ে আসেন।’ মুসলিম

নবাগত শিশুর যত্ন

নবাগত শিশুর যত্ন নেওয়া একটা অন্যরকম অভিজ্ঞতা। আর নিজের সন্তানকে বাহুডোরে আবদ্ধ করার আনন্দ অপ্রকাশযোগ্য। এটা বলে বোঝানো যায় না। এই অনুভূতি জীবনের অভিজ্ঞতাকে পূর্ণ করে দেয়। সন্তানকে কোলে নেওয়ার পর তার কোমল শরীরের স্পর্শ, শরীরের কচি গন্ধ এবং দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ পিতা-মাতার মনে এক অন্যরকম অনুভূতি তৈরি করে। সন্তানের বেড়ে উঠা পর্যবেক্ষণ করা এক অলৌকিক বিষয়। এই দৃশ্য যেন চক্ষুকে শীতল করে, অন্তরে প্রশান্তি জোগায় এবং আত্মায় প্রাণশক্তি সঞ্চার করে।

www.nagorikpathagar.org

শিশুদের চাহিদা অনেক বেশি থাকে এবং তা পূরণ করাও অনেক কষ্টসাধ্য। তাদের খাওয়ানো, কাপড় পরানো ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে দেওয়ার একটা চক্র শেষ হতে না হতেই আরেকটি চক্র শুরু হয়। প্রায় সারাদিনই তাদের এই কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। সন্তান জন্মদানের পর হরমোনের পরিবর্তন এবং ঘুমের ঘাটতির কারণে মায়ের মানসিক অস্থিরতা বা হতাশা অনুভব করা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এই সময়ে একজন মায়ের জন্য স্বামী ও পরিবারে অন্যান্য সদস্যদের পক্ষ থেকে সাহায্য-সমর্থন এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া অনেক বেশি প্রয়োজন। প্রসূতি মাকে অবিরত মাতৃত্বের দায়িত্ব থেকে প্রতিদিন খানিকটা বিরতি দেওয়া প্রয়োজন—যাতে সে ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করতে পারে এবং মানসিক, শারীরিক ও আধ্যাত্মিকভাবে সক্রিয় হতে পারে। এটি তাকে মানসিকভাবে প্রশান্তি দেবে এবং সামর্থ্য অনুযায়ী উত্তম অভিভাবক হওয়ার শক্তি জোগাবে।

আগেই উল্লেখ করেছি, সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব কেবল শিশুদের শারীরিক চাহিদা পূরণের চেয়েও অনেক বেশি কিছু। এই ছোট্ট বয়সেও তাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক পরিচর্যার প্রয়োজন পড়ে, কিন্তু পরিশ্রান্ত ও অজ্ঞ পিতা-মাতা এগুলো সরবারহ করতে পারে না।

নবজাতক শিশুরা নিজের প্রয়োজন প্রকাশের জন্য স্বতন্ত্র পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে। তারা জন্মের কয়েকদিনের মধ্যে বাবা-মা ও পরিবারের অন্য সদস্যদের আলাদাভাবে চিনতে পারে এবং সে অনুযায়ী আচরণ করে। আশপাশের বিভিন্ন পরিস্থিতি তারা অবলোকন করে, সাড়া দেয় এবং শেখে। নিজেদের কার্যক্রমের সময় হাত-পা নাড়াচাড়া করে। কান্না অথবা নাড়াচাড়ার মাধ্যমে ক্ষুধা, ক্লান্তি, ব্যথা ও মানসিক প্রয়োজনের ব্যাপারে জানান দেয়। তারা নিজের আশপাশে অসংখ্য ছবি, তথ্য ও অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়। এগুলো তাদের মস্তিষ্ক পুঞ্জীভূত করে রাখে এবং এখান থেকেই তাদের স্বতন্ত্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সূচনা হয়। ফলে প্রত্যেক শিশু আলাদাভাবে সাড়া দেয় কিংবা একে অন্যের চেয়ে বেশি আশ্চার্যান্বিত হয়। সাধারণত, ছোট্ট শিশুরা কোনো কারণ ছাড়া কান্না করে না। মূলত তারা কান্নার মাধ্যমে নিজেদের প্রয়োজনের কথা জানান দেয়।

সন্তানদের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির ব্যাপারে পিতা-মাতাকে সদা সচেষ্ট থাকতে হবে। তারা কী বলতে চাচ্ছে, তা বোঝার চেষ্টা এবং সে অনুযায়ী সাড়া দিতে হবে। পিতা-মাতা সন্তানদের যত্ন নেওয়ার ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতি অনুসরণ করছে, তার প্রভাব সন্তানের পরবর্তী জীবনের চরিত্রের ওপর পড়ে;

www.nagorikpathagar.org

এমনকী তারা ভবিষ্যতে কোন ধরনের সম্পর্কে জড়াবে, তাও এই পদ্ধতি ঠিক করে দেয়। পিতা-মাতা যখন 'আমি তোমার জন্য সর্বদা প্রস্তুত এবং তুমি আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ'—এমন মনোভাব নিয়ে সন্তানদের সঙ্গ দেয়, তখন সন্তানদের মাঝে নিশ্চয়তার অনুভূতি সৃষ্টি হয় এবং এই অনুভূতি তাদের ভারসাম্যপূর্ণভাবে বেড়ে উঠতে সহায়তা করে। একটি শিশুর যোগাযোগের বিভিন্ন ভাষা বোঝার জন্য অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। এই জন্য সন্তানের সমস্ত অঙ্গভঙ্গি বুঝতে অভিভাবকের অনেক সময় লেগে যায়।

অন্যান্য দায়িত্বের কারণে সন্তানের কান্না অগ্রাহ্য করা কিংবা উদ্ভূত পরিস্থিতিকে যথাযথভাবে সামাল দেওয়ার অক্ষমতা কোনোভাবেই সন্তান প্রতিপালনের উপযুক্ত পন্থা হতে পারে না। দিনশেষে তা শিশুর নিরাপত্তাহীনতা এবং পিতা-মাতার দুশ্চিন্তারই কারণ হবে।

প্রত্যেক শিশুকে পরিবারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। তার সাথে নিয়মিত সময় কাটানো উচিত। এই বিষয়টি শিশুর মানসিক বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। শিশুরা যখন বুঝতে পারে, কেউ তাদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করছে কিংবা সঙ্গ দিচ্ছে, তখন তারা খুব খুশি হয়। শিশুরা সর্বদা নিঃশর্তভাবে ভালোবাসে এবং পিতা-মাতার সঙ্গে আনন্দঘন সময় কাটাতে চায়। তারা পরিবারের বোঝা হয়ে থাকতে চায় না। সন্তানদের এটা বোঝাতে হবে, তারা আপনার কাছে অন্য সবকিছু থেকে গুরুত্বপূর্ণ; তবেই তাদের থেকে যথাযথ ফল পাওয়া সম্ভব হবে।

পিতা-মাতার ওপর সন্তানের অধিকার

পিতা-মাতার থেকে দুগ্ধ, পুষ্টিকর খাদ্য, স্নেহ এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা পাওয়া সকল সন্তানের মৌলিক অধিকার। ইসলামি সভ্যতা ওই সকল মুসলিমদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়েছে, যারা সন্তানদের এ সকল মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার দিকে যথাযথ নজর দিয়েছে। সন্তানদের এই সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত করা ইসলামে নিষিদ্ধ। এই ক্ষেত্রে উমর ﷺ-এর খিলাফতের একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য

এক ব্যক্তি খলিফা উমর ﷺ-এর কাছে নিজের ছেলেকে নিয়ে এলো এবং ছেলের অবাধ্যতা ও উদ্ধত আচরণের ব্যাপারে অভিযোগ করল। উমর ﷺ সেই ছেলেকে ভর্ৎসনা করার পরিবর্তে তার কাছে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন।

www.nagorikpathagar.org

জবাবে সে বলল—'পিতার ওপর কি আমার কোনো অধিকার নেই? তিনি কি আমার জন্য নির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব পালনে বাধ্য নন?'

জবাবে উমর ﷺ বললেন—'অবশ্যই পিতা-মাতার ওপর সন্তানের অধিকার রয়েছে।'

বালক তখন বললেন—'আমি সেই অধিকার সম্পর্কে জানতে চাই।'

উমর ﷺ বললেন—'যখন কেউ বিয়ে করতে চায়, তখন তার উচিত একজন সতী নারীকে বিবাহ করা, যাতে সে নারী তার সন্তানের যোগ্য মা হতে পারে। যখন মহান আল্লাহ তাকে একটি সন্তান দান করবে, তখন তার কর্তব্য হলো সন্তানের চমৎকার একটি নাম রাখা, তাকে কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া এবং পরিণত বয়সে উপনীত হলে সন্তানের বিবাহের আয়োজন করা।'

বালক শান্তভাবে এসব কথা শুনে বলল—'আমার বাবা এগুলোর একটাও আমার জন্য করেননি। আর মায়ের কথা যদি বলি, সে যতসব দুশ্চরিত্র লোকের সাথে মেলামেশা করে। আমি তাদের নাম নিতে চাই না; মানুষ তাদের যিনা-ব্যভিচারকারী হিসেবেই চেনে। আমি যখন জন্মগ্রহণ করি, তখন বাবা আমার নাম রাখেন খুনফাসা (কালো পোকা)। ফলে আমি যেখানেই যেতাম, অন্য ছেলেরা আমাকে তেলাপোকা বলে উপহাস করত এবং খেপাত। বাবা আমার জন্য কোনো ইসলামি শিক্ষার ব্যবস্থা করেননি। আমি কোনোদিন মাদরাসা-মসজিদে যাইনি এবং আমার কুরআন-হাদিস সম্পর্কে কোনো জ্ঞানও নেই।'

বালকের অভিযোগ বর্ণনা শেষ হলে উমর ﷺ বালকটির পিতার দিকে ঘুরে বললেন—'সন্তান তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার আগে তুমিই সন্তানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছ।'

শিশুর সাথে আস্থাপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি

নবাজতক শিশুর কার্যকর প্যারেন্টিং-এর সফলতা নির্ভর করে শিশুকে বোঝার সক্ষমতার ওপর। পিতা-মাতা সন্তানকে বুঝতে শেখে তাকে পর্যবেক্ষণ, শোনা এবং তার সাড়া দেওয়ার মাধ্যমে। শিশুরা সাধারণত সংকেতের মাধ্যমে অন্যের সাথে যোগাযোগ করে, আর তাদের এই সংকেতের পরিসর খুবই ছোটো। তারা শুধু পিতা-মাতার সাথেই যোগাযোগ করতে পারে। যদি পিতা-মাতা তাদের সংকেতে যথাযথ সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তারা অসহায় হয়ে পড়ে। তাই শিশুর সাথে প্রীতিমধুর সম্পর্ক উন্নত করা এবং আস্থাপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি খুবই গুরুত্বপূর্ণ; বিশেষত মায়ের জন্য।

www.nagorikpathagar.org

এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক হবে, যদি শিশুর সাথে আস্থাপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হওয়ার আগেই কোনো মুসলিম নারী মা হিসেবে নিজের দায়িত্ব থেকে দূরে সরে যান। এর ফলে তারা সন্তান লালন-পালনের আনন্দ থেকেও বঞ্চিত হবে। একান্ত বাধ্য না হলে কোনো মুসলিম মায়ের উচিত হবে না, নিজের সন্তানকে কোনো শিশু-মনস্ক মানুষের অধীনে লালন-পালন হতে দেওয়া। যদি শিশুকে দেখাশোনার জন্য অন্য মানুষ নিয়োগ দিতে হয়, সেক্ষেত্রে অবশ্যই বাড়তি সতর্কতা গ্রহণ করতে হবে। আমাদের সন্তানরা যখন অজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময়টা অতিবাহিত করে, তখন তাদের প্রকৃত মুসলিম হিসেবে বেড়ে উঠার সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে যায়। তাই মায়েদের উচিত সন্তানকে অন্যের হাতে ছেড়ে না দিয়ে নিজ হাতে লালন-পালন করার চেষ্টা করা। ইসলাম পরিবারের উপার্জনের দায়িত্ব দিয়েছে পুরুষের ওপর। নারীরা এই দায়িত্ব থেকে মুক্ত; বিশেষ করে যখন শিশুরা ছোটো থাকে। সন্তান পরিচর্যার ক্ষেত্রে গড়িমসি করা একজন মানুষের সকল কাজ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট। (আহমাদ ও আবু দাউদ)

সন্তান ছোটো থাকা অবস্থায় সংসারের ব্যয় নির্বাহ করা যদি পিতার জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে সেক্ষেত্রে মা চাইলে খণ্ডকালীন চাকরির মাধ্যমে পরিবারকে সহযোগিতা করতে পারে। তবে এর জন্য স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজন। অবস্থা যা-ই হোক না কেন, সর্বাবস্থায় পরিবারে শান্তিপূর্ণ অবস্থা জারি রাখা আবশ্যক। সব সময় মাথায় রাখতে হবে, সন্তান পালনের গুরুত্ব একজন চাকরিজীবীর অফিসিয়াল কাজের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।

www.nagorikpathagar.org

শৈশবকাল এবং স্কুলপূর্ব সময়

আপনার শিশু সন্তানকে শিশু হিসেবেই বিবেচনা করুন। তার সাথে খেলুন এবং তার সামনে নিজেকে বড়ো মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করা থেকে বিরত থাকুন।

টোডলার (Toddler)[১]

শিশুরা বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পিতা-মাতার দায়িত্বে পরিবর্তন আনতে হয়। অনেক পিতা-মাতা সন্তানদের চাহিদা পূরণ করার কৌশল যতদিনে রপ্ত করতে শেখেন; যেমন—তাদের ঘুম পাড়ানো, খাওয়ানো ইত্যাদি, ততদিনে শিশুর মাঝে একটা অকস্মাৎ পরিবর্তন ঘটে। ফলে পিতা-মাতা একটা হঠাৎ পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে যান। তাদের মনে হয়, তারা যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একটি শিশুকে লালন করছেন। এই প্রকৃতির শিশুদের বলা হয় Toddler।

শারীরিক ও মানসিকভাবে বড়ো হওয়ার সাথে সাথে শিশুর পৃথিবী আরও বিস্তৃত হতে থাকে। তখন এটা কেবল পরিবার ও পিতা-মাতার মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে না। এ সময় তারা আরও অনেক মানুষের সাথে পরিচিত হয়। চারপাশের পরিবেশ Toddler-দের মনে নানা ধরনের চিত্র অঙ্কন করে দেয়, যা তাদের চরিত্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

---

১. Toddler বলা হয় মূলত ১-৪ বছরের শিশুকে। এই সময়ে শিশুর শারীরিক ও মানসকি অবস্থায় দ্রুত পরিবর্তন ঘটে; বিশেষ করে তাদের মস্তিষ্ক, রুচিবোধ ও আবেগীয় পরিবর্তন লক্ষণীয়। এই সময়টায় শিশুর মাঝে আকস্মিক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।

www.nagorikpathagar.org

মানুষের সাথে মেলামেশার মাধ্যমে তারা প্রতিদিনই নতুন নতুন দক্ষতা অর্জন করে, নতুন নতুন কথা ও শব্দের সাথে পরিচিত হয়, খেলতে শেখে এবং বিভিন্ন নতুন বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করে। সময়ের সাথে সাথে তারা হামাগুড়ি দিতে দিতে জিনিসপত্র এলোমেলো করার উপায় জানতে পারে। এভাবে এক বছরের ব্যবধানে তারা অনেক দুষ্টুমি করতে শেখে। তারা এ সময় বিভিন্ন বিষয়ে অনেক বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠে : হাঁটতে শেখে, দৌড়াতে চায়, ঘরের জিনিসপত্র ঝাঁকুনি দিতে চায় ইত্যাদি। ফলে এই সময়ে তাদের নিরাপত্তার ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। টোডলার শিশুর জন্য প্রত্যেক ঘরকেই নিরাপদ করা আবশ্যক। ছোটো-বড়ো সমস্ত ঝুঁকিপূর্ণ জিনিস বা আসবাবপত্র তাদের নাগালের বাইরে রাখতে হবে। এই সময়ে শিশুকে তার মতো করে ছেড়ে দেওয়া উচিত না। সতর্কতার পরও এই সময়ের বাচ্চার যেকোনো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এমন জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রত্যেক পিতা-মাতার উচিত প্রাথমিক চিকিৎসার (First Aid) নিয়মকানুন শিখে নেওয়া এবং উপস্থিত বুদ্ধিকে কাজে লাগানো। কেননা, দুর্দশার চেয়ে নিরাপদ থাকাই উত্তম।

এই সময়ে শিশুর দ্রুত বুদ্ধির বিকাশ ও আধ্যাত্মিক চাহিদা পূরণ করার ক্ষেত্রে পিতা-মাতার অনেক কর্তব্য রয়েছে। এই সময় শিশুরা জীবনকে একধরনের রোমাঞ্চ হিসেবে বিবেচনা করে। ভেবে-চিন্তে কাজ করার মতো জটিল বিষয়ে তারা জড়াতে চায় না। তারা খেলতে চায় এবং এর মাধ্যমেই তারা জীবনের অনেক ধরনের দক্ষতা অর্জন করে ফেলে।

সন্তানদের বাস্তব জীবনের শিক্ষা দেওয়ার জন্য এবং তাদের স্বাভাবিক আচরণে অভ্যস্ত করার জন্য পিতা-মাতার উচিত শৈশবকাল থেকেই তাদের ওপর কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা। এটি তাদের নিরাপত্তার জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু অধিক পরিমাণ বিধিনিষেধ আবার হিতে বিপরিত হয়ে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। এই ক্ষেত্রে পিতা-মাতাকে কিছুটা সতর্ক হয়ে শুধু জরুরি বিষয়ে বিধিনিষেধ আরোপ করা উচিত।

সন্তানরা যেন প্রতিনিয়তই নতুন বিষয় শিখতে পারে এবং মাত্রাতিরিক্ত বিধিনিষেধ যেন তাদের স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধি, সৃষ্টিশীলতা ও নতুন চিন্তাশক্তিকে বাধাগ্রস্ত না করে, সেই দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। সন্তানদের শারীরিকভাবে শাস্তি দেওয়া থেকে যথাসম্ভব বিরত থাকতে হবে। একই সঙ্গে তাদের সঙ্গে কোনো ধরনের চিৎকার-চ্যাচামেচি ও কঠোর আচরণ থেকে বিরত থাকা জরুরি।

www.nagorikpathagar.org

সন্তানদের আস্তে আস্তে বোঝানো উচিত—এই সকল মৌলিক নীতিমালা তাদের নিরাপত্তা, স্বাভাবিক সমৃদ্ধি ও সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য হওয়ার সক্ষমতা অর্জনের জন্যই আরোপ করা হয়েছে। এই বয়সে কখনো কখনো পিতা-মাতার পক্ষ থেকে একটা মন্তব্য বা চাহনিই সন্তানের অনুপ্রেরণার জন্য যথেষ্ট হয়।

শিশুরা স্বতন্ত্র চরিত্রের অধিকারী হয়। ধীরে ধীরে তারা নিজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তৈরি করে। কেউ শান্ত প্রকৃতির হয়, কেউ আবার চঞ্চল স্বভাবের হয়।

প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি বোঝার চেয়ে শিশুদের স্বভাব-প্রকৃতি বোঝা এবং তাদের মনকে উপলব্ধি করা তুলনামূলক সহজ। কারণ, তারা নিজদের অনুভূতি গোপন রাখতে পারে না। তাদের নিষ্পাপ সরল চাহনি ও আবেগী কর্মকাণ্ড বলে দেয়, তারা কী চায়। অনেক শিশু অধিক পরিমাণে কান্না করে এবং সারাক্ষণ কাউকে না কাউকে সঙ্গী হিসেবে চায়। কেউ আবার তার পাশে আরেকজনকে ছাড়া একাকী ঘুমোতে পারে না। প্রত্যেক শিশু যেহেতু ভিন্ন, সেহেতু পিতা-মাতার উচিত তাদের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া এবং ত্যাগ স্বীকার করা।

শুরুর বছরগুলোতে সন্তানের জন্য পিতা-মাতাকে শারীরিকভাবে কাছে পাওয়ার গুরুত্বকে কোনোভাবেই অস্বীকার করার সুযোগ নেই। জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে অনেক পিতা-মাতা রাগের বশে সন্তানকে একা একা ঘুমোতে বাধ্য করে। এর মাধ্যমে তারা মূলত সন্তানদের সাথে নিজের মূল্যবান বন্ধনকেই দুর্বল করে ফেলে। সকল মুসলিম অভিভাবক বিশেষ করে মায়েদের কর্তব্য হচ্ছে নিজের সন্তানদের মানসিক সন্তুষ্টি নিশ্চিত করা। এক্ষেত্রে পিতা-মাতার অবশ্যই মাথা রাখতে হবে, সকল শিশু এক নয়।

প্যারেন্টিং পদ্ধতি

সচেতন পিতা-মাতার উচিত সন্তানদের জরুরি চাহিদা পূরণ করা; একই সঙ্গে তাদের স্বাভাবিক বেড়ে উঠাও নিশ্চিত করা—যাতে তারা একজন ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। ছোটো বয়সে সন্তানের পেছনে সময়, শক্তি ও শ্রম বিনিয়োগ করলে পরবর্তী সময়ে তার ফলাফল পাওয়া যায়। গবেষণায় দেখা যায়, সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে মূলত তিন ধরনের প্যারেন্টিং পদ্ধতি রয়েছে—

১. কর্তৃত্বমূলক

২. স্বীকৃতিমূলক

৩. পাণ্ডিত্যপূর্ণ

www.nagorikpathagar.org

১. **কর্তৃত্বমূলক** : এই পদ্ধতিতে পিতা-মাতা সন্তানদের গড়ে তুলতে এবং নিয়ন্ত্রণ করতে চান নিজের কর্তৃত্ব, নির্দেশ ও পারিবারিক ঐতিহ্যের মাধ্যমে। এই পদ্ধতিতে অভিভাবকদের বেঁধে দেওয়া নিয়ম-নীতির মানদণ্ডেই সন্তানদের যাচাই করা হয়। এখানে সন্তানের সৃষ্টিশীলতা ও ব্যক্তিগত পছন্দকে একেবারে অগ্রাহ্য করা হয় না ঠিক, কিন্তু এগুলোর খুব কমই স্বীকৃতি দেওয়া হয়। শিশুকাল থেকেই সামরিক কায়দায় আরোপিত এই নিয়ম-নীতি সন্তানের ব্যক্তিত্বের ওপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে; সেইসঙ্গে অন্য মানুষদের সাথে তাদের ভবিষ্যৎ আচরণও এর দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়।

সন্তান প্রতিপালনের এই পদ্ধতি ছোটোকাল থেকেই শিশুদের আনন্দের উপসর্গ নষ্ট করে ফেলে এবং তাদের ব্যক্তিত্বকেও দমন করে রাখে। ফলে শিশুরা পরিবারে নিজদের মূল্যহীন ভাবতে শুরু করে। একপর্যায়ে তারা নিজেদের গুটিয়ে নেয় এবং ভীত ও উদ্‌বিগ্ন অবস্থায় দিনাতিপাত করতে থাকে। সন্তানদের সাথে চিৎকার-চ্যাচামেচি কিংবা শাস্তি প্রদান সাময়িকভাবে পিতা-মাতার আদেশ পালনে বাধ্য করলেও পরবর্তী সময়ে এটা শিশুদের দুর্বল আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন হিসেবে গড়ে তোলে; এমনকী তাদের সৃজনশীলতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের সক্ষমতাও হ্রাস করে দেয়। গবেষণায় দেখা যায়, এই ধরনের আচরণ মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের ওপর বেশি নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

অনেক পিতা-মাতা সন্তানকে নিজের ইচ্ছেমতো গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এবং তার ওপর নিজের কর্তৃত্ব খাটানোর খায়েশে এই ধরনের পন্থা বেছে নেয়। নিজেদের হতাশা মেটানোর জন্যও তারা এই ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে। কিন্তু মনে রাখা দরকার, শিশুরা কারও অহংবোধ চরিতার্থ করার মতো কোনো বস্তু নয় অথবা তারা রোবটসদৃশ কোনো বস্তুও নয়, যাদের ওপর নিজেদের মর্জি মোতাবেক অযৌক্তিক নির্দেশনা প্রদান করা যাবে। শিশুরাও মানুষ। তাই সীমা-পরিসীমার মধ্যে রেখেও তাদের ব্যক্তিত্বকে গড়ে তোলার সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। তবে খেয়াল রাখতে হবে, এই সমস্ত সীমা-পরিসীমার সঙ্গে যেন রূঢ়তা ও কাঠিন্যের পরিবর্তে মায়া-মমতার পরিমাণ বেশি থাকে।

২. **স্বীকৃতিমূলক** : এই পদ্ধতিতে পিতা-মাতা সন্তানদের নিজের ইচ্ছামতো চলতে দেন। তাদের ওপর কোনো ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করেন না। অভিভাবক সন্তানদের নিকট কোনো কিছু দাবি করেন না। ফলে সন্তানরাই পরিবারের হর্তাকর্তা হয়ে যায়।

www.nagorikpathagar.org

এটি সন্তান ও পিতা-মাতার মধ্যকার সম্পর্কের অপব্যবহারের নামান্তর। পিতা-মাতার কর্তব্য হচ্ছে নিজেদের জীবনের বৃহৎ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সন্তানদের দিকনির্দেশনা দেওয়া এবং তাদের যথাযথ পরিচর্যা করা, যাতে তারা শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। কোনোভাবেই তাদের নিজের খামখেয়ালির ওপর ছেড়ে দেওয়া উচিত না। সন্তানদের ওপর এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া সম্পূর্ণরূপে অগ্রহণযোগ্য এবং দায়িত্বহীনতার পরিচায়ক। এমনটি করা হলে এই ধরনের সন্তানরা অপরিপক্ব ও স্বার্থপর হয়ে বেড়ে ওঠে। একইসঙ্গে সামাজিক দায়িত্ব ও স্বাধীনতার সাথে নিজেদের মানিয়ে নিতে হিমশিম খায়।

অনেক পিতা-মাতা সন্তান প্রতিপালনে নিজেদের সক্ষমতা নিয়ে আত্মবিশ্বাসের অভাবে ভোগেন। আবার কেউ কেউ ভাবেন, সন্তানদের কোনো পরামর্শ বা বিধিনিষেধ দেওয়া হলে তারা আবার অসন্তুষ্ট হয়ে যায় কি না—এই ভয়ে তারা এই ধরনের পদ্ধতি বেছে নেন।

মূলত সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্বের ব্যাপারে অজ্ঞতার কারণেই তারা এই পদ্ধতির আশ্রয় নেন। সন্তানকে ইচ্ছামতো চলতে দেওয়া কারণে তারা হয়তো তাৎক্ষণিকভাবে একটু সন্তুষ্টি প্রকাশ করে, কিন্তু এর মাধ্যমে তাদের ভবিষ্যৎকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়। পিতা-মাতা যদি একজন পথপ্রদর্শক ও পরামর্শক হিসেবে নিজের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারেন, তবে অবশ্যই তারা সন্তানদের ভালোবাসা ও সম্মান পাবেন।

৩. **পাণ্ডিত্যপূর্ণ :** এই পদ্ধতি সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভারসাম্যপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য উপায়। এখানে পিতা-মাতা কর্তৃপক্ষের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এবং তাদের বেঁধে দেওয়া সীমা অনুযায়ী শিশুরা চলাফেরা করে। এই পদ্ধতি গড়ে উঠে সন্তান ও অভিভাবকদের মাঝে পারস্পরিক ভালোবাসা, পরামর্শ, নমনীয়তা ও সুসম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে। সচেতন অভিভাবক সন্তানদের পরিচালনা করেন বুদ্ধিবৃত্তিক উপায়ে, কোনোরূপ উচ্চবাচ্য ছাড়াই। তারা সন্তানদের ওপর নিজের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে সন্তানদের কাছে এর কারণ ব্যাখ্যা করেন। কোনো প্রকার চিৎকার-চ্যাঁচামেচি না করে তারা সন্তানদের বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করান। সন্তানদের জন্য এমন এক পরিবেশ তৈরি করেন, যেখানে তারা নিজের ব্যক্তিত্ব, স্বাতন্ত্র্য ও আত্মমর্যাদা প্রকাশের সুযোগ পায়। সন্তানরাও এমনভাবে নিজেদের স্বকীয়তা প্রকাশ করে, যাতে পিতা-মাতার সম্মান বজায় থাকে এবং তাদের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশিত হয়।

www.nagorikpathagar.org

এই ধরনের পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে বেড়ে উঠা শিশুরা সাধারণত সুখী ও আত্মবিশ্বাসী হয় এবং জীবনে আগত সকল ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দক্ষতা অর্জন করতে শেখে। সামাজিকভাবে তারা দায়িত্বশীল, উদ্যমী ও মিশুক হয়। এই ধরনের সন্তানরা পিতা-মাতার অন্তরে প্রশান্তির জোয়ার এনে দেয়, যা পিতা-মাতার জন্য এক বিরাট সম্পদ। রাসূল ﷺ বলেছেন—

> 'এক মুমিন আরেক মুমিনের আয়নাস্বরূপ।' আবু দাউদ

পিতা-মাতা নিঃসন্দেহে সন্তানদের জন্য আয়নাস্বরূপ। সন্তানরা পিতা-মাতাকে গভীর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বুঝতে পারে, তারা কতটুকু ভালোবাসা, সম্মান ও আস্থা অর্জনের যোগ্য। শিশুরা কেবল তখনই পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান ও পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে, যখন তারা অনুভব করে—পরিবারে তাদের মূল্যায়ন এবং পরিবারের মূল্যবান সদস্য হিসেবে তাদের বিবেচনা করা হচ্ছে।

আত্মগঠনের সময়

বারো মাস বয়স থেকে শিশুর বোঝার সক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই সময় থেকেই শিশু জুতা পরিধান করা, নিজে নিজে হাঁটতে শেখার মতো প্রায়োগিক দক্ষতা অর্জন করতে শেখে। একই সঙ্গে তারা মুখে কথা বলতে শেখে এবং তাদের চারপাশের বিশ্বকে উপলব্ধি করতে ব্যস্ত থাকে। এই সময়ে পিতা-মাতার উচিত সার্বক্ষণিকভাবে শিশুর আশপাশে থাকা। কারণ, এই সময়ে পিতা-মাতাকে সন্তানের নিরাপত্তা নিয়ে সার্বক্ষণিক সচেতন থাকতে হয় এবং শিশুর সাধারণ কৌতূহল মেটানোর জন্য যোগ্য সঙ্গ দিতে হয়।

সন্তান ও পিতা-মাতার সম্পর্ক গতিশীল ও আদান-প্রদানমূলক। পিতা-মাতার কর্তব্য হলো ছোটোকালেই সন্তানদের সাথে এই দৃঢ় সম্পর্কের ভিত গড়ে তোলা। Toddler সন্তানদের প্রতিপালনের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার মনোবিজ্ঞানী কিংবা শিক্ষাবিদ হওয়ার প্রয়োজন নেই, তবে স্বাভাবিকভাবে সন্তানের চাহিদা ও মানসিক অবস্থা বোঝার মতো দক্ষতা অর্জন জরুরি—যাতে সন্তানদের পরিচর্যা ও প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা যায়।

শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও আবেগীয় বিকাশের পর্যায়গুলো বুঝলে তাদের চাহিদা বোঝা ও পূরণ করা সহজ হয়। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে শিশুদের দক্ষতা ও পৃথিবী সম্পর্কে জানাশোনা বৃদ্ধি পায়। তারা রপ্ত করতে থাকে—কীভাবে মানুষের সাথে চলাফেরা করতে হয় এবং অভ্যাস গঠন করতে হয়।

www.nagorikpathagar.org

একটি শিশুর বেড়ে উঠার প্রায় পুরোটা সময় নানা ধরনের খেলাধুলার মধ্য দিয়েই কেটে যায়। দৌড়াদৌড়ি, ধাওয়া-পালটা ধাওয়া, উঁচু জায়গায় উঠা, এটা-ওটা ছুড়ে মারাসহ বিভিন্ন শারীরিক কার্যক্রম তাদের শরীর গঠনে সহযোগিতা করে। এগুলো করতে করতে তারা অনেক ধরনের কথাও শিখে যায়।

প্রতিটি শিশুই আলাদা আলাদা প্রকৃতির। মজার ব্যাপার হলো—ছেলে ও মেয়ে শিশুরা ছোটোকাল থেকেই ভিন্ন ভিন্ন খেলাধুলা করে। ছেলে শিশুরা সাধারণত ঘরের বাইরে পাড়ার ছেলেদের সাথে খেলতে পছন্দ করে। তারা অপেক্ষাকৃত কঠিন বা শারীরিক পরিশ্রমের খেলা পছন্দ করে এবং খেলার মাধ্যমে অন্যকে পরাজিত করতে চায়। অন্যদিকে মেয়েরা ঘরোয়া ও কমজোর খেলায় অভ্যস্ত হয়। শিশুদের এই প্রকৃতিগত পার্থক্য খুবই চমৎকার!

খেলাধুলাকে ক্ষুদ্র বিষয় মনে হলেও এর মাধ্যমেই শিশুরা তাদের চারপাশের পৃথিবী সম্পর্কে জানতে পারে। খেলাধুলার মাধ্যমেই তাদের মধ্যে সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য চরিত্রের আত্মপ্রকাশ ঘটে। শারীরিক পরিশ্রমের কারণে আত্মমর্যাদা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে যে সমস্ত খেলায় চিন্তাশক্তির ব্যবহার করতে হয়, তা শিশুদের সৃজনশীল ও আত্মবিশ্বাসী হতে সহায়তা করে। দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়, বিশেষ করে নির্মল অবহাওয়ায় শিশুদের খেলার অনুমতি দেওয়া উচিত। এটা তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

শারীরিক কার্যক্রম ও বিনোদনের ওপর গুরুত্বারোপের ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ এক চমৎকার উদাহরণ। বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হওয়ার পরও তিনি তাঁর স্ত্রী আয়িশা ﵂-এর সাথে খেলাধুলা করতেন এবং শিশুদের খেলা দেখতে পছন্দ করতেন।

আকার-আকৃতিতে শিশুরা তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে, তবে খুব দ্রুত বেড়ে উঠে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে। শরীরের অন্যান্য অঙ্গের চেয়ে তাদের মগজ দ্রুত পরিণত হয়। বিজ্ঞানীদের গবেষণায় দেখা গেছে, পাঁচ বছর বয়সে শিশুর মস্তিষ্ক বড়োদের মস্তিষ্কের তুলনায় দশ ভাগের নয় ভাগ পরিণত হয়; অথচ একই বয়সে তাদের শরীর পরিণত হয় বড়োদের তুলনায় মাত্র এক-তৃতীয়াংশ। এই জন্য এই বয়সটা কুরআন মুখস্থ করার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ সময়। অনেক প্রখ্যাত ইসলামি মনীষী ছোটো বয়সেই কুরআনের হাফেজ হয়েছেন।

মুখস্থশক্তি নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা। তবে শিশুরা এই বয়সে যে গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতাটি অর্জন করতে শেখে, তা হলো চিন্তাশক্তি। তাই তাদের শেখাতে হবে—কীভাবে সৃজনশীল উপায়ে ও মুক্ত মনে চিন্তা করতে হয়

www.nagorikpathagar.org

মুক্ত মনের ব্যাপারে চমৎকার একটি প্রবাদ রয়েছে—

> 'তোমার মন একটা প্যারাসুটের মতো। এটা কেবল তখনই কাজ করে, যখন এটি খোলা হয়।'

সৃজনশীল চিন্তার অধিকারী ব্যক্তিরা এমন একটি উৎপাদনশীল ও গতিশীল সমাজ পরিচালনা করতে সক্ষম হয়, যেখানে সবাই নিজেদের কার্যক্ষমতাকে কাজে লাগাতে পারে।

অনেক পিতা-মাতা সন্তানদের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারানোর ভয়ে তাদের সৃজনশীলতা ও মুক্তচিন্তায় বাধা প্রদান করে। তারা মনে করে, এই ধরনের স্বাধীন মানসিকতা ও সৃজনশীলতা ইসলাম বিরুদ্ধ; কিন্তু এই ধারণা সত্য নয়। মূলত সৃজনশীল চিন্তা শিশুকে শেখায় নিজের মনকে চ্যালেঞ্জ করতে, মনের দিগন্ত বিস্তৃত করতে, বক্সের বাইরে চিন্তা করতে, নতুন সম্পর্ক তৈরি করতে এবং সৃজনশীল আইডিয়া তৈরি করতে।

ছোটো বয়স থেকেই শিশুরা যেন সৃজনশীল চিন্তাশক্তি অর্জন করতে পারে, এমন কিছু পদ্ধতি নিচে উল্লেখ করা হলো—

- মেধা খাটাতে হয়—এমন ধাঁধা ও খেলায় শিশুদের অংশগ্রহণ করান।
- শিশুকে নিয়ে নতুন নতুন জায়গায় ঘুরে বেড়ানো; হতে পারে আত্মীয়স্বজনের বাসায় কিংবা বাইরের কোনো এলাকায়।
- শিশুকে সাদৃশ্য ও বৈশাদৃশ্যের ব্যাপারে চিন্তা করতে দিন।
- তাদের দৈনন্দিন রুটিনকে ভিন্ন উপায়ে চিন্তা করতে উৎসাহিত করুন। আপনি যে কাজগুলো নিয়মিত করছেন, সেগুলো কীভাবে ভিন্ন উপায়ে করা যায়—সে ব্যাপারে তাদের জিজ্ঞেস করুন।
- বিভিন্ন অবস্থার আলোকে তাকে কাল্পনিক গল্প বলতে বলুন।
- কল্পনাশক্তি বৃদ্ধি করে—এমন বিভিন্ন ধরনের বই তাদের সামনে পড়ুন।
- দিনের বিভিন্ন কার্যক্রম, অনুভূতি ও চিন্তার ব্যাপারে তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করুন।

এটা খুবই আশ্চর্যজনক, খুব অল্প সময়ের ব্যবধানেই শিশু অসহায় অবস্থা থেকে একটি ছোট্ট মানুষে পরিণত হয়, যে কিনা নানান শব্দ, চিহ্ন ও তার দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ভাবতে পারে, দু-একটা কথা বলতে শেখে, স্মৃতিশক্তিকে কাজে লাগাতে পারে এবং যৌক্তিক চিন্তা করার সক্ষমতা অর্জন করে।

www.nagorikpathagar.org

শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের পুরো সময় জুড়ে কিছু মৌলিক নীতিমালা পিতা-মাতার মাথায় রাখা আবশ্যক। এই মূলনীতিগুলো তাদের সদ্য ভূমিষ্ঠ (১-২ মাস বয়স), ইনফ্যান্ট (২-১২ মাস বয়স) ও টোডলার (১-৪ বছর বয়স)—সব ধরনের সন্তান প্রতিপালনের জন্যই প্রযোজ্য। মূলনীতিগুলো হলো—

সন্তানের পেছনে সময় বিনিয়োগ : পিতা-মাতার উচিত সন্তানদের পেছনে অর্থবহ সময় ব্যয় করা, যাতে তারা সন্তানদের বুঝতে পারেন এবং তাদের জীবন ধারণের পদ্ধতি শিক্ষা দিতে পারেন। সন্তানদের সাময়িক শারীরিক চাহিদা পূরণে পিতা-মাতা যে সময় দেন, তা থেকে এই সময়টা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এটি এক দ্বৈত প্রক্রিয়া, যেখানে পিতা-মাতা সন্তানদের সাথে কথা বলবেন তাদের বয়সের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে, একই সঙ্গে তারা সন্তানদের বিষয়ে নিজের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকেও সমৃদ্ধ করবেন। সকল শিশুই অপার সম্ভাবনা নিয়ে জন্মায়। পিতা-মাতার উচিত যথার্থ সময়ে এই সম্ভাবনাকে সর্বোচ্চ উপায়ে কাজে লাগানোর জন্য তাদের সহযোগিতা করা।

সন্তানদের শক্তিশালী ও দুর্বল দিকগুলোকে সুনিপুণ উপায়ে নির্ধারণ করার জন্য তাদের পেছনে পর্যাপ্ত সময় ব্যয় করুন। পিতা-মাতার এই সময় ব্যয়টা কিছুটা বিবেচনাযোগ্য। তবে সচেতন পিতা-মাতা মাত্রই বুঝতে পারেন, সন্তানদের জন্য ব্যয় করা অর্থবহ সময় নষ্ট হয় না; বরং দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ অর্জনে ভূমিকা রাখে।

সন্তানকে বোঝা : সৃষ্টির বৈচিত্র্য আল্লাহর একটা অনুগ্রহ। এখানে নানান ধরনের মানুষ বসবাস করে বলেই পৃথিবী এত সুন্দর। শিশুদের মেজাজের মধ্যেও রয়েছে বিভিন্ন বৈচিত্র্য। শিশুরা তাদের পিতা-মাতা ও সহোদরদের থেকে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য ব্যক্তিত্ব নিয়ে বেড়ে উঠতে পারে। এটা কোনো দোষণীয় ব্যাপার না। গুরুত্বপূর্ণ হলো—তারা যে স্বাতন্ত্র্য ব্যক্তিত্ব নিয়ে বেড়ে উঠছে, তা আত্মবিশ্বাসের সাথে প্রকাশ ও উদ্‌যাপন করতে পারছে কি না। সন্তানদের পিতা-মাতার সদৃশ হতেই হবে—এমন কোনো নিয়ম নেই।

সন্তানকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখা : সন্তানদের কার্যকর উপায়ে গড়ে তুলতে হলে মুসলিম পিতা-মাতার অবশ্যই সন্তানের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার পদ্ধতি শিখতে হবে। কারও অনুভূতির মধ্যে প্রবেশ করার সক্ষমতা এবং উদ্ভাবনী কল্পনাশক্তির মাধ্যমে কারও অভিজ্ঞতার মধ্যে পরিভ্রমণ করা এক চমৎকার দক্ষতা। মানবজাতির সবচেয়ে কার্যকর প্রশিক্ষক মুহাম্মাদ ﷺ এই টেকনিকে ছিলেন সফলতম ব্যক্তি।

www.nagorikpathagar.org

পিতা-মাতা যদি নিজেকে সন্তানের বয়সে কল্পনা করেন, তাহলে তারা বুঝতে পারবেন সন্তানের চাহিদার প্রকৃতি কী এবং তাদের দুনিয়া কীভাবে প্রসারিত হয়। সহানুভূতি (Empathy) পিতা-মাতাকে জানিয়ে দেয় সন্তানদের দৈনন্দিন জীবন, ভালোবাসা, ভয়, আগ্রহ ও অন্যান্য সহজাত প্রবৃত্তির কথা। সহানুভূতি (Empathy) ও সুক্ষ্মদর্শিতার মাধ্যমে পিতা-মাতা সন্তানের মূল্যবোধকে জাগ্রত করতে পারেন এবং পরবর্তী জীবনে নিজ সিদ্ধান্ত গ্রহণে উৎসাহিত করতে পারেন। পিতা-মাতার এই ধরনের আচরণ সন্তানদের জন্য উত্তম দীক্ষা। কারণ, এর মাধ্যমে তারা অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল (Empathy) হওয়ার উপায় রপ্ত করতে পারে।

সন্তানকে সম্মান করা : সন্তানদের সাথে সম্মানজনক আচরণ করার ব্যাপারটিকে মামুলি বলে মনে হলেও মূলত এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ, সন্তান ব্যাগ-বস্তার মতো গৃহস্থালি কোনো বস্তু নয় যে পিতা-মাতা তাদের টানা-হ্যাঁচড়া করে এখানে-সেখানে রাখবে এবং তাদের সাথে যাচ্ছেতাই ব্যবহার করবে। একজন প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে আমরা অন্য প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির থেকে ন্যূনতম একটা সম্মান প্রত্যাশা করি, কিন্তু আমরা নিজ সন্তানের ক্ষেত্রে এই সম্মানের কথা ভুলে যাই।

অনেক পিতা-মাতা সন্তানদের সাথে কথা শুরু করেন নির্দেশজ্ঞাপক শব্দ দিয়ে। তাদের কথায় কখনো 'প্লিজ' বা 'ধন্যবাদের' মতো কোমল শব্দ থাকে না। বাচ্চারা একটু দুষ্টুমি করলেই 'শয়তান' বলেও সম্বোধন করে বসেন।

বাচ্চাদের সাথে যখন সম্মানজনক আচরণ করা হয়, তাদের সাথে কোমল স্বরে কথা বলা হয় এবং মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করা হয়, তখনই তারা সম্মান করতে শেখে। যখন কোনো বড়ো মানুষ বাচ্চাদের সামনে সময় নিয়ে কোনো জিনিস ব্যাখ্যা করে, তারা এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। যেমন : কোনো বিয়ের অনুষ্ঠানে যাওয়ার সময় পাঁচ মিনিট সময় নিয়ে বাচ্চাকে বুঝিয়ে বলুন—আপনারা কোথায় যাচ্ছেন, কেন যাচ্ছেন, যেতে কতক্ষণ সময় লাগবে, অনষ্ঠানটি কেন গুরুত্বপূর্ণ ইত্যাদি। সন্তানের প্রতি এই সম্মানের পুরস্কার সম্মান হিসেবেই ফিরে আসবে।

ভারসাম্যপূর্ণভাবে বেড়ে উঠার জন্য যা প্রয়োজন

পিতা-মাতা হিসেবে আমরা সন্তানদের জীবনে একটা শ্রেষ্ঠ শুরু এনে দিতে চাই। এই উদ্দেশ্যে আমরা তাদের জন্য অর্থ জমিয়ে রাখি, প্রাইভেট শিক্ষার ব্যবস্থা করি

www.nagorikpathagar.org

এবং আমরা ছোটোকালে যে জিনিস পাইনি, তা তাদের কিনে দেওয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু পিতা-মাতার পক্ষ থেকে সন্তানদের জন্য সর্বোত্তম উপহার হলো—তাদের এমন একটি জাদুর কাঠি ধরিয়ে দেওয়া, যা তাদের দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা এনে দেবে। এই জাদুর কাঠি হলো—অন্তর ও আত্মার প্রশান্তি। এই প্রশান্তি আনয়নের জন্য পিতা-মাতার কর্তব্য হলো—সন্তানদের শারীরিক, মানসিক, আত্মিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতি নজর দেওয়া। পিতা-মাতা যখন এই বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে পূর্ণ মনোযোগী হবেন, কেবল তখনই তাদের এমন সন্তানের প্রত্যাশা করা সাজবে, যে হবে আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান ও গতিশীল মানুষ। জীবনের ব্যাপারে তার থাকবে স্বচ্ছ ধারণা। দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ অর্জনের ক্ষেত্রে সে হবে ভারসাম্যের প্রতীক।

জীবনের বিভিন্ন সমস্যা, দুর্দশা কিংবা হতাশা থেকে আমরা সব সময় সন্তানদের রক্ষা করতে পারব না। সব সময় তাদের জন্য মনের মতো করে শান্তির ব্যবস্থা করতে পারব না। তবে জীবনের বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের সাথে মানিয়ে নেওয়ার যে দক্ষতা তাদের শিক্ষা দিয়েছি, তার ওপর সন্তুষ্ট থাকতে পারি।

শিশুরা পিতা-মাতা ও আশপাশের মানুষদের দেখতে দেখতে বেড়ে ওঠে। এ সময় তারা যার ব্যক্তিত্বকে ইউনিক মনে, তার মতো করেই নিজের ব্যক্তিত্ব গঠন করে। তাই একটি শিশুর জীবনে বংশীয় প্রভাবের পাশাপাশি পরিবেশগত প্রভাবও গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর প্রতিপালন, শারীরিক যত্ন, শিক্ষা, ভালোবাসা, পারিবারিক নিয়মকানুন ইত্যাদি বিষয় শিশুর বেড়ে উঠার ক্ষেত্রে প্রভাবক হিসেবে কাজ করে এবং এর ওপর ভিত্তি করেই তাদের ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। সবশেষে পিতা-মাতার খতিয়ে দেখতে হবে, শিশুকে কাঙ্ক্ষিত মানে গড়ে তুলতে তারা নিজ সামর্থ্যের কতটুকু ঢেলে দিতে পেরেছে। এরপর বাকি অবস্থার জন্য আল্লাহর ওপর ভরসা করতে হবে। অর্থাৎ নিজের যতটুকু করার তা সম্পন্ন করার পর ভরসা করতে হবে আল্লাহর ওপর।

এই উত্তরাধুনিক শিল্পোন্নত বিশ্বে মুসলিম শিশুরা বস্তুবাদের জয়জয়কার অবস্থার মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠছে। এই আধিপত্যবাদী সংস্কৃতির অর্থ হলো আত্মকেন্দ্রিকতা, স্রষ্টার কর্তৃত্বের প্রতি অবিশ্বাস এবং অসুস্থ প্রতিযোগিতা। ভোগ ও প্রবৃত্তির অনুসরণই এখানে নৈতিকতার মানদণ্ড। পারিবারিক নিয়মানুবর্তিতার অভাব এবং শক্তিশালী নৈতিক ভিত্তির অনুপস্থিতি তরুণদের অবাধ যৌন মেলামেশা, মাদকাশক্তি ও সহিংসতার মতো অপরাধে অভ্যস্ত করে ফেলছে। পাশাপাশি তাদের নারী-পুরুষের নির্ধারিত দায়িত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ করে তুলছে। ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া এই অবাধ স্বাধীনতাকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছে, যার ঢেউ এসে পড়েছে আমাদের ঘরেও।

www.nagorikpathagar.org

সন্তানের অভিভাবক হিসেবে এই সমস্ত সামাজিক অবস্থা নিয়ে উদ্‌বিগ্ন হওয়াকে হয়তো অযৌক্তিক মনে হতে পারে, কিন্তু বাস্তবতা হলো—এই সমাজেই আমাদের সন্তানরা বেড়ে উঠবে। এই পরিস্থিতিতে মুসলিম পিতা-মাতা সন্তানদের সমাজ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করতে পারেন না, আবার এই জাহেলিয়াতের সাগরে তাদের নিমজ্জিতও করতে পারেন না। এই বিশাল সমুদ্রে তাদের পথ দেখানোর সবচেয়ে ভালো উপায় হলো—তরুণ বয়সেই তাদের এমন জীবনে অভ্যস্ত করাতে হবে এবং এমন দক্ষতা শেখাতে হবে, যা সে প্রাপ্তবয়সে কাজে লাগাতে পারবে। একটি শিশুকে ভারসাম্যপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ—

জীবনের সূচনালগ্নেই ইসলামি চেতনা জাগ্রত : এই নেতিবাচক আধুনিক সমাজব্যবস্থায় নিজেকে রক্ষা করার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো—শিশুদের জীবনের শুরুতেই ইসলামি চেতনার বীজ বপন করে দেওয়া। শিশুরা সাধারণত এক বছর বয়স থেকেই দুই-একটা করে কথা বলতে শেখে। দুই বছর বয়সে তারা গড়ে প্রায় দুইশো শব্দ শিখে ফেলে। দুই বছর বয়সের পর তাদের এই উন্নতি আরও ত্বরান্বিত হয়। তখন তারা শব্দগুলো বুঝতে পারে এবং চিন্তা করতে শেখে। তাদের ভাষাগত দক্ষতা আরও বৃদ্ধি পায়, যখন তাদের চারপাশের সবাই তাদের সাথে শিশুসুলভ কথা বলে। তাই পিতা-মাতার উচিত শিশুদের সাথে ছোটো ছোটো বাক্যে অর্থপূর্ণ কথা বলা। তাদের সামনে ভালো মানের ছড়া আবৃত্তি করা, আকর্ষণীয় উপস্থাপনশৈলী ও অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে ছোটো গল্প বলা এবং পারিবারিক বিভিন্ন ঘটনা বলা ইত্যাদির মতো বিষয়গুলো শিশুদের আলোকিত করে এবং বিভিন্ন বিষয় শেখার ক্ষেত্রে তাদের আগ্রহী করে তোলে।

শিশুরা সেই শব্দগুলোই বেশি শেখে, যা তারা আশপাশের মানুষদের স্বাভাবিক কথাবার্তায় শোনে। সুতরাং প্রাপ্তবয়স্করা যদি একে অপরকে অভিবাদন জানানোর ক্ষেত্রে সালামের ব্যবহার করে এবং কথাবার্তায় ইনশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ প্রভৃতি দুআর ব্যবহার করে, তাহলে শিশুরাও বড়োদের দেখাদেখি আপনা থেকেই এসব বাক্য শিখে যাবে। দেখা যাবে, যেখানে দরকার, সেখানে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এসব বাক্য ব্যবহার করছে এবং তা কোনোরূপ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ ছাড়াই। একইভাবে পরিবারের দৈনন্দিন কাজের মধ্যে যদি সালাত আদায়, কুরআন তিলাওয়াত ও জিকির অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাহলে শিশুরাও অবচেতন মনে এই সমস্ত বিষয়ে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে।

www.nagorikpathagar.org

সন্তানদের উপযুক্ত সঙ্গ দেওয়ার জন্য পিতা-মাতার উচিত তাদের বিভিন্ন বই পড়ে শোনানো। এই বইগুলো অবশ্যই তাদের বয়সোপযোগী হতে হবে। এতে শিশুদের জ্ঞানের দিগন্ত যেমন বিস্তৃত হয়, তেমনি তাদের মনে বইয়ের প্রতি স্থায়ী আকর্ষণও তৈরি হয়। বাজারে সাধারণ বইয়ের পাশাপাশি অনেক সুন্দর সুন্দর ইসলামিক বইও পাওয়া যায়, যেগুলোয় চমৎকার সব বিষয় আলোচিত হয়েছে। ইসলামি বই বলতে শুধু নবি-রাসূলদের গল্প কিংবা ইসলামের ইতিহাস সংশ্লিষ্ট বিষয়কেই বোঝায় না; বরং বাজারে এমন অনেক বই রয়েছে, যেগুলো কোনো মুসলিম মনীষী কিংবা মুসলিম সভ্যতার ঘটনা নিয়ে লিখিত হয়েছে, সেগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত। বাচ্চাদের সামনে এগুলো পড়ে শুনে এই সমস্ত বিষয়ের সাথে তারা পরিচিত হতে পারে।

সন্তানেরর সক্ষমতা বুঝে উপদেশ : অনেক পিতা-মাতা অনভিজ্ঞতার কারণে অল্প বয়সেই সন্তানদের উচ্চতর পর্যায়ের দ্বীনি শিক্ষা দিতে চান। এক্ষেত্রে তারা সন্তানদের বয়সের ব্যাপারটা বিবেচনা করেন না। কিন্তু মনে রাখা দরকার, জীবনের অন্যান্য দক্ষতাগুলোর ন্যায় দ্বীনের উপলব্ধিও বয়সের সঙ্গে আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পায়। তাই সন্তানদের বয়স এবং বোঝার সক্ষমতার বিষয়টি মাথায় রেখেই তাদের আস্তে আস্তে ধারবাহিকভাবে দ্বীন শেখাতে হবে।

নবি-রাসূলদের কাহিনি কিংবা ইসলামের ইতিহাসে অন্য কোনো ঘটনা বলার সময় সন্তানদের এই কথা বোঝাতে হবে—এগুলো বাস্তব ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা; কোনো সাজানো গল্প নয়। বর্তমানে শিশুদের বিনোদন জগতের পুরোটাই রূপকথার গল্প, ঔপন্যাসিক চরিত্রও তথাকথিত মিডিয়া সেলিব্রেটিদের দখলে। সন্তানদের মধ্যে এই দুই ধরনের বিনোদনের মধ্যে পার্থক্য করার সক্ষমতা তৈরি করতে হবে। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

সন্তানদের সামনে দ্বীনের কোনো বিষয় এমন কঠিনভাবে উপস্থাপন করা যাবে না, যাতে তারা ভুল বুঝে বসে। উদাহরণস্বরূপ, কিছু অভিভাবক সন্তানদের ভয় দেখানোর জন্য আল্লাহর ক্রোধ, শাস্তি এবং মানুষের খারাপ কর্ম লিখে রাখার মতো বিষয়গুলো তাদের সামনে ঘনঘন তুলে ধরেন। এতে শিশুদের মনে আল্লাহর ব্যাপারে অনাকাঙ্ক্ষিত ধারণা সৃষ্টি হয়। তারা মনে করে, আল্লাহ হচ্ছে প্রতিহিংসাপরায়ণ ও শাস্তিদাতা, যাকে শুধু ভয়-ই করা যায় (আসতাগফিরুল্লাহ!)। কোমল অন্তর ও মন কেবল তখনই সবকিছু গ্রহণ করার জন্য তৈরি হয়, যখন তাদের ভয় ও লজ্জার পরিবর্তে ভালোবাসা ও দয়ার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়।

আচার-আচরণ ও অভ্যাস : 'সন্তানের নিকট পিতার পক্ষ থেকে উত্তম আচরণ, উত্তম চরিত্র ও উত্তম শিক্ষার থেকে বড়ো উপহার আর নেই।' তিরমিজি

www.nagorikpathagar.org

ইসলামি শিক্ষা শুধু শিশুদের সৎ কাজ ও ধর্মীয় রীতিনীতি শেখানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং জীবনের সার্বিক বিষয়ের প্রতিটি পদক্ষেপে এটি বিস্তৃত। জীবনের প্রতিটি বিষয়ের জন্যই শিশুদের ইসলামি চরিত্র শিক্ষা দিতে হবে। শিশুদের ইসলামি চরিত্রে অভ্যস্ত না করে শুধু ফিকহের নিয়মকানুন ও কুরআন শুদ্ধ করার প্রশিক্ষণ প্রদান করলে সে শিক্ষা অসম্পূর্ণই রয়ে যাবে। কারণ, একজন মুসলিমের চরিত্রই ইসলামের প্রতিফলন ঘটায়। রাসূল ﷺ চরিত্রবান মানুষ তৈরির জন্যই প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সচ্চরিত্র ও সুমহান মর্যাদার মূর্ত প্রতীক।

সন্তানদের শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম হিসেবে গড়ে তোলার মূল শর্ত হলো—তাদের সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের নীতি শিক্ষা দেওয়া। এই ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে—সন্তানদের সর্বোচ্চ মূল্যবোধ ও নৈতিকতার মধ্য দিয়ে গড়ে তোলা, যাতে একজন গর্বিত মুসলিম হিসেবে তারা ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে। তারা যেন শুরু থেকেই ইসলাম ও সমসাময়িক বিষয়ের ওপর যথাযথ জ্ঞান অর্জন করতে পারে, সে ব্যাপারেও আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে। এই বিষয়টি সন্তানদের কিশোর ও যুবক বয়সে নীতি বিসর্জন দিয়ে সমাজ থেকে দূরে সরে যাওয়ার পরিবর্তে সমাজের সকলের সাথে মিশতে সহযোগিতা করে। এর পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করতে এবং সমাজের উন্নয়নে অবদান রাখার ক্ষেত্রেও তা নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে। এটা বিশ্বের সকল প্রান্তের ভবিষ্যৎ মুসলিম উম্মাহর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মূল্যবোধ ও নৈতিকতা মানুষের উত্তম চরিত্র গঠন ও প্রকাশে সাহায্য করে। আপনি চরম প্রতিকূল মুহূর্ত অতিক্রম করছেন—এমন পরিস্থিতিতেও যদি কাউকে কিছু বলার ক্ষেত্রে 'দয়া করে' বা 'ধন্যবাদ'-এর মতো সৌজন্যমূলক শব্দ ব্যবহার করেন কিংবা করেও প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে অমায়িক ও আন্তরিকতার সাথে উত্তর দেন, তাহলে তা আপনার চারিত্রিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতাকে উত্তমভাবে প্রকাশ করবে। মহৎ চরিত্র গঠিত হয় কথা ও কাজে, ভদ্রতা, উত্তম বচন, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, কৃতজ্ঞতাবোধ, সহানুভূতি, স্পষ্টবাদিতা প্রভৃতির মাধ্যমে; যা কারও ক্ষতি বা কষ্টের কারণ হয় না। ওই ব্যক্তিই মহৎ চরিত্রের অধিকারী, যে কঠিন পরিস্থিতিতেও দান করে এবং অপরের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখে। রাসূল ﷺ-এর চরিত্র কতটা অনুকরণীয় ছিল, সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করার জন্য তাঁর জীবনী অধ্যয়ন খুবই জরুরি। আমাদের কর্তব্য হলো—ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে এই ধরনের শিষ্টাচার রক্ষা করা, যাতে আমাদের সন্তানরা উত্তম চারিত্রিক গুণাবলিসম্পন্ন মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

যেমনটি আগেই বলা হয়েছে, শিশুদের শিক্ষাদান প্রক্রিয়া গর্ভধারণের দিন থেকেই শুরু করা উচিত। শিশুদের জীবনের প্রাথমিক বছরগুলো অর্থাৎ জন্ম থেকে পঞ্চম কিংবা ষষ্ঠ বছর পর্যন্ত সময়গুলো তাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ে তাদের অন্তর চারপাশে সংঘটিত যেকোনো কিছু গ্রহণে জন্য সদা প্রস্তুত থাকে। ফলে এই সময়ে শেখা বিষয়গুলো তাদের অন্তরের দীর্ঘস্থায়ী ছাপ এঁকে দেয় । শিক্ষাদান একটি প্রাকৃতিক ও ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এখানে কোনো প্রকার জোর-জবরদস্তি করা উচিত না। তত্ত্বের চেয়ে উদাহরণের মাধ্যমে শিখলে তা বেশি কার্যকর হয়। শিশুরা যখন পাঠ্যপুস্তকে কোনো জিনিস শেখে, কিন্তু বাস্তবে পিতা-মাতাকে ঠিক তার উলটোটা করতে দেখে, তখন তারা সন্দেহ-সংশয়ের মধ্যে পড়ে এবং এই অবস্থার মধ্য দিয়েই বেড়ে ওঠে।

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ হলো গতিশীল ও সক্রিয় প্রক্রিয়া। চেষ্টা ও ভালো মানুষের সাহচর্যের মাধ্যমে উত্তম মানবীয় গুণাবলির বিকাশ ঘটে। ইসলাম এমন এক সহজবোধ্য জীবনব্যবস্থা, জীবনের সকল ক্ষেত্রে যার পরিষ্কার ও পূর্ণাঙ্গ নির্দেশনা রয়েছে। এই সমস্ত দিকনির্দেশনা শিশুরা কেবল বড়োদের মাধ্যমেই জানতে পারে। তাই বড়োদের উচিত এসব নির্দেশনা আস্তে আস্তে তাদের চরিত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া; যাতে তারা সূচনালগ্ন থেকেই সৎ কর্মের চর্চা করতে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে পারে। এক্ষেত্রে ভালো ফলাফলের জন্য সর্বোত্তম উপায় হলো—পিতা-মাতার পক্ষ থেকে ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ। সতর্কতার সাথে এবং ধারাবহিকভাবে শিশুদের পথ দেখানোর ক্ষেত্রে পিতা-মাতার ভূমিকা অপরিসীম। অতি উৎসাহ নিয়ে শিশুদের ওপর অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেওয়া তাদের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার জন্য ক্ষতিকর। শিশুদের থেকে উন্নত আচরণের প্রত্যাশা করার আগে পিতা-মাতার উচিত তাদের পরিপক্বতা ও বয়সের বিষয়টি মাথায় রাখা।

প্রতিদান, নিয়মানুবর্তিতা ও আত্মমর্যাদা : সামাজিকভাবে দক্ষ হওয়ার সাথে সাথে ছেলেমেয়েদের মাঝে আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি পায়। এটি জীবনের এমন এক পর্যায়, যখন তাদের মধ্যে ভালো-মন্দের যথাযথ ধারণা সৃষ্টি করা জরুরি। এই সময় সফলতা তাদের খুব বেশি আত্মবিশ্বাসী করে তোলে, আবার ব্যর্থতা, সংশয় ও নিরাশায় নিমজ্জিত করে। পিতা-মাতার উচিত সন্তানদের এই ধরনের মানসিক উত্থান-পতন থেকে রক্ষা করা। এর জন্য পিতা-মাতার কর্তব্য হলো—সন্তানদের মানসিক স্থিরতা দেওয়ার জন্য নিজেদের শান্ত রাখা, তাদের বুঝতে শেখা এবং তাদের সামনে নিজেদের নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে উপস্থাপন করা।

www.nagorikpathagar.org

ছোট্ট শিশুরা হচ্ছে 'কাঁচামালের' ন্যায়। পিতা-মাতা ও বড়োদের কর্তব্য হলো—তাদের 'উন্নতমানের পণ্য' হিসেবে তৈরি করা। শিশুদের নিয়মের মধ্যে বড়ো করা উচিত। কারণ, তারা তাদের চারপাশের সবকিছুর মাধ্যমে প্রভাবিত হয়। এর অর্থ হচ্ছে—তাদের সচেতনতা ও দায়িত্বশীলতার সাথে মানুষের সঙ্গে চলাফেরা করার আদব শিক্ষা দেওয়া। সন্তানদের এমনভাবে শিক্ষা দিতে হবে, যেন তাদের মধ্যে সৎ কর্মের পর আনন্দদায়ক অনুভূতি এবং মন্দ কর্মের পর অনুশোচনার অনুভূতি সৃষ্টি হয়। ছোট্ট বয়সেই যদি এ ধরনের শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহলে তাদের পরবর্তী জীবনের কার্যক্রমে এর প্রতিফলন ঘটবে।

অনেকে মনে করে, শাস্তি প্রদান ও ধমকই শিশুদের নিয়মের মধ্যে রাখার একমাত্র উপায়। এই ধারণা সঠিক নয়। শিশুদের ওপর বিধিনিষেধ আরোপের ক্ষেত্রে সঠিক বিচার, ধারাবাহিকতা ও সুবিচারের দিকে অবশ্যই নজর রাখতে হবে। সন্তানদের প্রতিপালনের সময় কিংবা তাদের শৃঙ্খলা শিক্ষা দেওয়ার সময় তারা যেন পিতা-মাতা উভয়ের কাছ থেকে একই ধরনের শিক্ষা লাভ করে—এই দিকে খেয়াল রাখতে হবে। পিতা-মাতার কাছ থেকে ভিন্ন ধরনের আচরণ সন্তানদের মাঝে সন্দেহের সৃষ্টি করে, যা তাদের বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে নিপতিত করে।

কোনো কাজে পিতা-মাতার বিধিনিষেধ শিশুদের জন্য সবচেয়ে বড়ো শাস্তি। এই জন্য শিশুদের ওপর কোনো ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করা হলে তার কারণ তাদের কাছে স্পষ্ট করতে হবে। এতে তারা বুঝতে পারবে, পিতা-মাতা তদের অপছন্দ করার কারণে নয়; বরং তাদের আচরণকে ঠিক করার জন্যই এই ধরনের নির্দেশনা দিয়েছে। তবে শুধু মারাত্মক অশোভনীয় আচরণের ক্ষেত্রে সন্তানদের ওপর শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে; অন্যথায় সন্তানদের শাসনের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। সন্তান পরিশেষে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে। বড়ো ধরনের শাস্তি তাদের সাময়িকভাবে কোনো কাজ থেকে বিরত রাখলেও তা কখনো আচরণগত মন্দ অভ্যাস কাটিয়ে উঠার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে না। ভারী শাস্তি শিশুদের থেকে ভয় পাওয়ার অনুভূতি কেড়ে নেয়। এতে তারা 'খোরাই কেয়ার' হয়ে ওঠে।

সবার সামনে শিশুদের লজ্জা দেওয়া কিংবা হেয় করা তাদের আত্মমর্যাদার ক্ষেত্রে হানিকর। কিছু প্রবাদ রয়েছে। যেমন : 'সবার সামনে ভালোবাসুন', 'গোপনে সংশোধন করুন' এই ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিশুদের মধ্যে এই বিশ্বাস জাগ্রত করতে হবে যে, শাস্তি দেওয়ার পরও পিতা-মাতা তাদের ভালোবাসে।

সন্তানের যেকোনো ধরনের সফলতায় (তা যত ছোটোই হোক না কেন) পিতা-মাতা গর্ববোধ করেন। সন্তানের যেকোনো অর্জনে সরাসরি ও খোলামেলাভাবে নিজেদের অনুভূতি প্রকাশ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোনো কিছু অর্জনের পর তার

www.nagorikpathagar.org

যথাযথ স্বীকৃতি আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি করে। পিতা-মাতা ও বড়োদের কাছ থেকে স্বাভাবিক প্রশংসামূলক বচন শিশুদের অন্তরে নিজেদের সম্পর্কে ভালো অনুভূতির সৃষ্টি করে। তা তাদের আত্মবিশ্বাসকে পুনর্জাগরিত করার পাশাপাশি সক্ষমতাও বৃদ্ধি করে। 'কঠিন পরিশ্রম করার পর সফল না হলেও কষ্ট পেয়ো না, তুমি ভবিষ্যতে ভালো করবে, ইনশাআল্লাহ'—পিতা-মাতার পক্ষ থেকে এই ধরনের আন্তরিক কথা এবং উৎসাহ শিশুদের আত্মমর্যাদা রক্ষার ক্ষেত্রে সহায়ক। কারও আত্মবিশ্বাস ধ্বংস করা খুবই সহজ; শুধু একটি নেতিবাচক চাহনি কিংবা কষ্টদায়ক মন্তব্যই এর জন্য যথেষ্ট।

বড়োদের পক্ষ থেকে শিশুদের প্রতি বলা প্রত্যেকটি শব্দ তারা খুব মনোযোগের সাথে শ্রবণ করে; যদিও বড়োরা এই সমস্ত শব্দ ঠাট্টাচ্ছলে উচ্চারণ করে। শিশুদের প্রশংসা ও শাসনের ক্ষেত্রে পিতা-মাতাকে সাবধান থকতে হবে। তাদের সঙ্গে উচ্চ আওয়াজে কথা না বলাই উত্তম। ছোটো কোনো ভুলের সংশোধনের জন্য শাস্তি প্রদান কিংবা ধমক দেওয়া কখনো উত্তম সমাধান নয়; বরং তাদের মধ্যে এই অনুভূতি তৈরি করতে হবে, এ ধরনের ভুল করা তাদের জন্য হানিকর এবং অমঙ্গলজনক।

অনেক পিতা-মাতা একটি সাধারণ ভুল করে থাকেন। তারা সন্তানদের ভালো আচরণকে উপেক্ষা করে শুধু তাদের শাসনই করতে থাকেন। ভালো কাজের প্রশংসা না করে শুধু মন্দ আচরণের শাসন শিশুদের মূলত মন্দ কাজের দিকেই ধাবিত করে। সন্তানদের ভালো কর্মের স্বীকৃতি, প্রশংসা ও উৎসাহ দিতে হবে। এটা তাদের আচরণগত সমস্যা দূর করার ক্ষেত্রে জাদুকরি ভূমিকা পালন করে। কিছু মুহূর্ত রয়েছে, যে সময় শিশুদের অবশ্যই প্রশংসা করতে হবে। যেমন : তারা যখন অন্যদের প্রতি সততা, আন্তরিকতা, সম্মান, শিষ্টাচার, প্রদর্শন করে তখন।

শিশুদের শাসন করার উত্তম উপায়গুলো নিচে দেওয়া হলো—

- প্রশংসা কিংবা শাসন করার ক্ষেত্রে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করুন
- উপযুক্ত সময়ে প্রশংসা কিংবা শাসন করুন
- প্রশংসা করার ক্ষেত্রে সংগত আচরণ করুন এবং সতর্ক হোন
- কাজের ধরন অনুযায়ী প্রশংসা এবং শাসন করুন
- প্রশংসা ও শাসনের যথাযথ কারণ তাদের অবহিত করুন
- প্রশংসা কিংবা শাসন কাজ করছে কি না, সেদিকে লক্ষ রাখুন
- শাসনের পরও সন্তানদের ভালোবাসা প্রদর্শন থেকে বিরত থাকবেন না।

www.nagorikpathagar.org

এই বয়সে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়

টয়লেট ট্রেইনিং এবং স্বাভাবিক পরিচ্ছন্নতা : ইসলামে তাহারাত (পরিচ্ছন্নতা) বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সালাত আদায়ের পূর্বশর্ত। জন্ম থেকেই শিশুদের পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে পিতা-মাতাকে সচেতন হতে হবে। শিশুদের পরিধানের নিচের অংশ পরিবর্তনের সময় তাদের নিম্নাংশ শুধু মোছার পরিবর্তে ধুয়ে ফেলাই উত্তম।

শিশু যখন শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করতে শেখে, তখন থেকেই তাদের টয়লেট করার পদ্ধতি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং পবিত্রতা অর্জনের প্রক্রিয়া শেখাতে হবে। এই ব্যাপারে অনেক বই আছে—যেগুলোতে বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে, যা শিশুদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

খাদ্য : একটি প্রবাদ রয়েছে—'তুমি তা-ই, যা তুমি আহার করো।' এই কথাটি একদম বাস্তব সত্য। পিতা-মাতার কর্তব্য হচ্ছে জন্ম থেকেই সন্তানদের আহার এবং পানীয়র দিকে লক্ষ করা। খাদ্য শুধু হালাল হলে চলবে না; সেটি পুষ্টিকর ও সুখাদ্য কি না, সেদিকেও নজর রাখতে হবে। বড়ো হওয়ার সাথে সাথে শিশুদের হালাল-হারামের ব্যাপারে যথাযথ ধারণা দিতে হবে।

ব্যস্ততার সময় রেডিমেড খাদ্যসামগ্রী অনেক কাজে লাগতে পারে। তবে খাঁটি উপাদান দিয়ে নিজ ঘরে তৈরিকৃত খাদ্যের অনেক উপকার রয়েছে। পরিবারের সবাই যদি দিনে অন্তত একবেলা একসঙ্গে বসে খেতে পারে এবং সবার সাথে ওই দিনের অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে পারে, তাহলে পারিবারিক কল্যাণে তা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এই ধরনের অভ্যাসের ফলে শিশুরা সবার সাথে একসঙ্গে বসে খাওয়ার শিষ্টাচার শিখতে পারবে। একই সঙ্গে এই ধরনের অনুশীলন পারিবারিক বন্ধনের এক উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে। শিশুরা যেন তাদের পুরো শৈশবজুড়ে এই ধরনের কাজে অভ্যস্ত হয়, সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। অনেক শিশু রয়েছে, যারা খেতে বসলে অস্বস্তি অনুভব করে, আবার অনেক ধীরে ধীরে খায়। তাদের জন্য সবার সাথে একসাথে বসে খাওয়াটা কার্যকর। কারণ, এতে তারা সবার মতো করে খেতে উৎসাহিত হয়, বিশেষ করে যখন তাদের সাথে তাদের সহোদররা খেতে বসে।

ক্রোধ ও হতাশা নিয়ন্ত্রণ : Toddler খুব অল্প সময়ের মধ্যে বিরাট আকারের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের মুখোমুখি হয়। তারা এই সময় বাস্তব পৃথিবীর অনেক কিছুই বুঝতে পারে না এবং একই সঙ্গে নিজেদের অবেগ নিয়ন্ত্রণ করতেও হিমশিম খেতে হয়। যদি কোনো কারণে হতাশা, মানসিক অস্বস্তি ও রাগ তাদের গ্রাস করে, তখন তারা নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ে; হাত-পা ছোড়াছুড়ি করে।

www.nagorikpathagar.org

এই ধরনের মানসিক ভারসাম্যহীনতা কাটিয়ে উঠার ক্ষেত্রে দুই ধরনের সমাধান রয়েছে এবং উভয় ধরনের সমাধান একই সঙ্গে প্রয়োগ করতে হবে। প্রথমে মানসিক ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টিকারী কারণসমূহ দূর করতে হবে। যে সকল শিশু প্রতিনিয়ত ভালোবাসা ও যত্নের মধ্যে বেড়ে ওঠে এবং যাদের মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণ করা হয়, তাদের মধ্যে সাধারণত মানসিক ভারসাম্য বজায় থাকে।

এইজন্য শিশুদের জন্য সুষম খাদ্য ও পানীয় নিশ্চিত করা, তারা যেন খুব বেশি ক্লান্ত, বিরক্ত, অতিরিক্ত আবেগী কিংবা শঙ্কিত না হয়—সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এর মাধ্যমে শিশুরা পিতা-মাতার ভালোবাসার যথাযথ প্রতিদান দেওয়ার উপায় সম্পর্কে জানতে পারে। পিতা-মাতা যদি সন্তানদের সামনে নিজেদের অনিয়ন্ত্রিত আবেগের বহিঃপ্রকাশ এবং তাদের সামনে চিৎকার-চ্যাঁচামেচির মতো খারাপ উদাহারণ তৈরি করেন, তাহলে ওই শিশুরাও এই সমস্ত কাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। পিতা-মাতার ধৈর্যহীনতা, অসহনশীলতা ও অস্থিরতা শিশুদের ওপর অনেক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এর ফলে শিশুরা ভীত হয়ে পড়ে এবং আবেগ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে ভুল ধারণা পায়।

সকলের জীবন একরকম নয়। সকল শিশু সন্তানই জীবনের প্রাথমিক বছরগুলোতে মানসিক ভারসাম্যহীনতায় ভোগে। অনেক শিশু অস্বাভাবিক আচরণ করে। উদাহরণস্বরূপ, তারা বিশৃঙ্খলাপূর্ণ আচরণ কিংবা অস্বাভাবিক চিৎকার-চ্যাঁচামেচি করতে পারে। সন্তানদের মধ্যে এই ধরনের সমস্যা তৈরি হলে পিতা-মাতার উচিত তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া। এই সময় পিতা-মাতার কর্তব্য হলো নিজেদের শান্ত রাখা। কারণ, রাগ করার ফলে মানসিক অস্বস্তি আরও বেড়ে যায়। পরিস্থিতি এবং সন্তানের বয়স ও পরিপক্বতার লেভেল অনুযায়ী পিতা-মাতা তাদের এই পরিস্থিতি থেকে বের করে আনতে অথবা এই ধরনের আচরণ মেনে নিয়ে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে আবেগের বহিঃপ্রকাশ করার অনুমতি দিতে পারেন। এক্ষেত্রে একটু আলিঙ্গন কিংবা সান্ত্বনা অনেক ভালো কাজে দেয়।

শিশুরা প্রতিনিয়ত নানান কারণে আবেগী হয়ে ওঠে। সুতরাং প্রাত্যহিক জীবনে এমন কতগুলো উপায় অবলম্বন করতে হবে, যা তাদের আবেগ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। এ ধরনের কিছু উপায় নিচে তুলে ধরা হলো—

- তাদের সামনে গল্প বলা, যেখানে আবেগের বিষয় আছে এবং এই ব্যাপারে তাদের সাথে আলোচনা করা।
- তারা যে ধরনের চিন্তা কিংবা ঘটনার কারণে সমস্যা অনুভব করছে, তার সচিত্র ব্যাখ্যা প্রদান করা।

www.nagorikpathagar.org

- খেলাধুলা করা। বিশেষ করে আউটডোরের খেলা আগ্রাসী মানসিকতা থেকে বাঁচার অন্যতম উপায়।
- কারাতে কিংবা মার্শাল আর্ট শেখা যেতে পারে। এটা আবেগকে প্রশান্ত এবং নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

টেলিভিশন ও কম্পিউটারের ব্যবহার : বেঁচে থাকার সংগ্রাম পিতা-মাতাকে ব্যস্ত রাখে। চাকরি, ব্যাবসা কিংবা অন্য কোনো উপার্জনের কাজে পিতা-মাতা ব্যস্ত থাকে। ফলে সময় খুবই অপ্রতুল জিনিস হয়ে দাঁড়ায়। সন্তানদের সাথে পর্যাপ্ত সময় দেওয়া সম্ভব হয় না। এই পরিস্থিতিতে টেলিভিশন, কম্পিউটার ও মোবাইল শিশুদের সময় কাটানোর অন্যতম মাধ্যম হিসেবে ভূমিকা পালন করে। অনেক পিতা-মাতা মনে করে, এগুলো শিশুদের সুস্থ বিনোদন দেয়—যা তাদের দীর্ঘ সময় ধরে শান্ত করে রাখে।

টেলিভিশনে শিশুদের জন্য তৈরি অনেক অনুষ্ঠানে অনেক অশালীন পোশাক পরিহিত মডেলদের দেখানো হয়। অতিরিক্ত পপ মিউজিক, অশালীন নৃত্য, বড়োদের অসম্মান এবং খাবারে অপচয়ের মতো অনেক কিছুই প্রোগ্রামে দেখানো হয়। দীর্ঘদিন ধরে এই ধরনের প্রোগ্রাম মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটাচ্ছে।

প্রায় সবার নিকট টেলিভিশন এক অপরিহার্য বিষয়, যা আমাদের জীবনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। এটি আমাদের মতামতকে প্রভাবিত করে, আলোচনার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে দেয় এবং আমাদের ব্যক্তিত্ব তৈরি করে। টেলিভিশন শিশুদের বিনোদন এবং শিক্ষার্জনের বেশ কিছু অংশ পূরণ করে। তবে এই ক্ষেত্রে সীমিত আকারে নির্দিষ্ট সময়ে টিভি দেখার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে।[২]

পরিবারের বাইরে ব্যস্ত সময় পার করে—এমন পিতা-মাতার ছোট্ট সন্তানরা সাধারণত দীর্ঘ সময় ধরে টিভি দেখতে অভ্যস্ত। এই অভ্যাস তাদের অপরের সাথে মেলামেশা করার, চিন্তাশক্তি অর্জন এবং সৃজনশীলতা থেকে দূরে রাখে, অন্তরকে আবদ্ধ করে রাখে এবং তাদের একাগ্রতা নষ্ট করে ফেলে। পাশাপাশি এই ধরনের অভ্যাস তাদের চিন্তাগ্রস্ত করে তোলে এবং চোখ ব্যথাসহ নানান ধরনের শারীরিক সমস্যার সৃষ্টি করে।

---

২. টিভি পোগ্রামসমূহে কখনোই ইসলামি শিষ্টাচার, হালাল-হারাম লক্ষ করা হয় না। পর্দার লঙ্ঘন টিভি প্রোগ্রামের প্রধান সংকট। এমনকী ধর্মীয় অনুষ্ঠান চলাকালীন বিরতিতেও বিজ্ঞাপনের সুবাদে দৃষ্টি হেফাজত সম্ভবপর হয়ে উঠে না। তাই গুনাহের রাস্তা খোলা থাকা অবস্থায় টিভিতে বৈধ প্রোগ্রাম দেখার ব্যাপারেও উৎসাহিত করা যায় না। এক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনমুক্ত অনলাইন প্রোগ্রাম বিকল্প হতে পারে।—সম্পাদক

www.nagorikpathagar.org

শিশুরা স্বভাবতই শারীরিক ও সামাজিকভাবে সক্রিয় হয়। তারা খেলাধুলা করতে এবং অপরের সাথে মেলামেশায় আগ্রহী। গবেষণায় দেখা যায়—শিশুর যখন কোনো কিছু করার থাকে না কিংবা তারা যখন বিষণ্নতা অনুভব করে, ঠিক তখনই তারা টেলিভিশনের শরণাপন্ন হয়। পিতা-মাতার কর্তব্য হচ্ছে—শিশুসন্তানকে সময় দেওয়ার জন্য এবং তাদের সাথে সৃষ্টিশীল কাজে অংশগ্রহণ করার জন্য জুতসই সময় নির্ধারণ করা। এর মানে এই নয়, পিতা-মাতা তাদের অন্য সকল কাজ বাদ দিয়ে শুধু এই কাজটিই করবে। ছোট্ট শিশুরা শুধু মায়ের সাথে রান্নাঘরে বসে মায়ের রান্না দেখতে কিংবা চামচ ও পাতিল দিয়ে খেলতে পারলেই খুশি। বড়ো শিশুরা রান্নাঘরের টেবিলে কোনো কিছু আঁকতে কিংবা ছোটো ছোটো এবং ঝুঁকিহীন কাজে মাকে সাহায্য করার মাধ্যমে খুশি থাকতে পারে।

ক্রমবর্ধমান গেম ও অ্যাপস-এ পরিপূর্ণ কম্পিউটার, ট্যাবলেট ও স্মার্টফোনের ক্ষেত্রেও ঠিক একই কথা। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান, বিশেষ করে বিয়েতে ছোট্ট শিশুদের দেখা যায়, তারা নিজেদের মোবাইল থেকে গান-বাজনা শুরু করে দেয়। আমাদের সন্তানরা কীভাবে বড়োদের সাথে মেলামেশা এবং অন্যদের সাথে কথা বলার আদব শিখবে? তারা যদি সামাজিক আদব, শিষ্টাচার সম্পর্কে না জানে, তাহলে তারা কীভাবে বৃহৎ সমাজের অংশ হয়ে থাকতে পারবে? মুসলিম পরিবারে এই ধরনের ডিভাইস কিছু শিক্ষাগত উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারে, কিন্তু তা কখনো মানুষের সাথে মেলামেশার বিকল্প হতে পারে না।

স্কুলপূর্ব সময়ে চাইল্ডকেয়ারে রাখা

অধিকাংশ দেশেই পাঁচ-ছয় বছরের আগে শিশুদের ফুলটাইম শিক্ষার জন্য যোগ্য হিসেবে বিবেচনা করে না।

যে সব পিতা-মাতা সন্তানের সাথে ঘরে অবস্থান করে, তাদের জন্য কোনো ধরনের আনুষ্ঠানিক সিলেবাসের প্রয়োজন নেই। তবে সচেতন পিতা-মাতা ছোটোকাল থেকেই নিজ ঘরে সন্তানদের শিক্ষা দেওয়ার লক্ষ রাখে। তারা সন্তানদের বয়স ও পরিপক্বতা অনুযায়ী তাদের সাথে আচরণ করে, যাতে করে স্কুলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত নিজ ঘর একটি আদর্শিক পরিচর্যাকেন্দ্র হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে। শিশুরা ওই সকল ব্যক্তির পরিচর্যা থেকে বেশি উপকার লাভ করতে পারে, যারা তাদের পৃথিবীর অন্য সকলের চেয়ে বেশি ভালোবাসে। নিরাপদ ও ভালোবাসাপূর্ণ পারিবারিক পরিবেশেই উপযুক্ত লক্ষ্যসমূহ অর্জন করা সম্ভব হয়।

www.nagorikpathagar.org

শিশুরা যখন তিন বছর কিংবা চার বছর বয়সের কাছাকাছি সময়ে উপনীত হয়, তখন অভিভাবকরা ছোট্ট সন্তানদের সপ্তাহে কিছু সময়ের জন্য নার্সারি স্কুল কিংবা প্রি-স্কুলে) পাঠানোর চিন্তা করতে পারেন। এটি তাদের স্কুল রুটিনে অভ্যস্ত হতে সাহায্য করবে।

যে সকল নারী সন্তান জন্মদানের চেয়ে ফুলটাইম বাইরে কাজ করাকে বেশি প্রাধান্য দেন, তারা একপর্যায়ে হতাশায় ভোগেন। মানসিক প্রেষণা এবং মা হয়ে ঘরে অবস্থান করার মতো সামাজিক জীবন উপভোগের অভাবই তাদের হতাশার মূল কারণ। তারা তখন নিজেদের আয়-উপার্জনের অর্থহীনতা এবং স্বাধীনতার অভাব অনুভব করতে থাকেন। এই সবকিছুই যৌক্তিক ও স্বাভাবিক অনুভূতি। পারতপক্ষে, মাতৃত্ব একটি সম্মান; একই সঙ্গে এক বিরাট সুযোগ। সবাই এই সুযোগ পায় না। শৈশবকালের প্রাথমিক বছরগুলো খুব দ্রুতই কেটে যায়। তাই সন্তান স্কুলে যাওয়ার বয়সে উপনীত হওয়ার পর মা চাইলে পুনরায় বাইরে পুরোদমে কাজ করতে পারেন।

নতুন সন্তানের আগমন অতিরিক্ত আর্থিক চাপের বিষয়টি সামনে নিয়ে আসে। ইসলাম পুরুষের ওপর পরিবারের আর্থিক উপার্জনের দায়িত্ব অর্পন করে। এই সময় মায়ের দায়িত্ব হচ্ছে, যত বেশি সম্ভব ঘরে অবস্থান এবং নিজ সন্তানের দেখভাল করা। এ সময়ে বিলাসিতাপূর্ণ আয়েশ পূরণ করা সম্ভব না-ও হতে পারে। ঘরে অবস্থানকারী মায়ের যত্নে থেকে সাধারণ জীবনযাপনের মধ্যেও শিশুরা অনেক ভালো থাকতে পারে।

মাঝেমধ্যে এমন পরিস্থিতিও তৈরি হতে পারে, যখন পরিবারের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য উভয়ের বাইরে কাজ করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। এই ক্ষেত্রে এমন কিছু উপায় রয়েছে, যার ফলে সন্তানদের কোনো ধরনের নেতিবাচক পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া থেকে রক্ষা করা যায়। পিতা-মাতার যেকোনো একজন পার্ট-টাইম অথবা তাদের উভয়জন আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের-সুবিধাজনক সময়ে ঘরে অবস্থান করতে পারেন। তা ছাড়া পরিবারের অন্যান্য সদস্য যেমন : দাদা-দাদি কিংবা অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবের কাছে নিজ সন্তানের দায়িত্ব দেওয়া যায়, যারা সম্পূর্ণ পারিবারিক এবং ইসলামিক পরিবেশে সন্তানদের দেখভাল করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে। এই ক্ষেত্রে বাবা-মায়ের অপরিহার্য কর্তব্য হলো—বাসায় যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ সন্তানের সাথে সার্থক ও উপভোগ্য সময় কাটানো।

www.nagorikpathagar.org

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বছরগুলো

'যখন কোনো ব্যক্তি তার সন্তানের জন্য গল্প তৈরি করে, তখন সে একই সঙ্গে পিতৃত্ব এবং সন্তানের সত্তাকে লালন করে।'—রুমি

সাধারণত পাঁচ থেকে এগারো বছরের সময়টাকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপযুক্ত সময় হসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাজ হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ভিত্তি তৈরি করে দেওয়া; পাশাপাশি শিশুদের প্রাথমিক সাক্ষরতা, গণনা, মানুষের সাথে যোগাযোগ এবং সামাজিক মেলামেশার মতো মৌলিক শিক্ষা প্রদান করা।

প্রাথমিক স্কুল বাছাই

এই বয়সে সন্তানরা কী উপায়ে শিক্ষা অর্জন করবে, তা বাছাই করা একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। এটা তাদের ভবিষ্যৎ শিক্ষাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। সুতরাং ধীরে-সুস্থে, চিন্তা-ভাবনা করে এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। তবে এক্ষেত্রে অস্বাভাবিক দেরি করা কোনোভাবেই কাম্য নয়। সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য চারটি বড়ো ধরনের অপশন রয়েছে—

- সরকারিভাবে পরিচালিত স্থানীয় স্কুল
- প্রাইভেট স্কুল
- ইসলামিক স্কুল এবং
- হোম স্কুলিং।

www.nagorikpathagar.org

সাধ্য ও সক্ষমতা অনুযায়ী পছন্দসই যেকোনো স্কুলে সন্তানকে ভর্তি করান। মাঝেমধ্যে সন্তানরা কোন পরিবেশে শিক্ষা গ্রহণ করছে এবং তাদের মূল্যবান সাত ঘণ্টা কোন পরিবেশে ব্যয় করছে—তা দেখার উদ্দেশ্যে স্কুল ভিজিট করুন। স্কুলের শিক্ষক ও অন্যান্য স্টাফরা কী ধরনের আচার-আচরণে অভ্যস্ত, তা জানার জন্য স্কুল ভিজিটের কোনো বিকল্প নেই। এই ক্ষেত্রে যে সকল বিষয় লক্ষ রাখা উচিত, সেগুলো হলো—শ্রেণিকক্ষের আকার এবং শিক্ষার্থী সংখ্যা, শ্রেণিকক্ষের অবস্থা এবং বিনোদনের স্থান, শিক্ষাদানে শিক্ষকদের আগ্রহ, স্কুল স্টাফদের আচরণ, পাঠদান এবং নিয়মানুবর্তিতা প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠানের গৃহীত পদক্ষেপ ইত্যাদি।

স্কুল নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো খেয়াল রাখা উচিত—

- প্রাইভেট স্কুলের ব্যয় কি বহন করা সম্ভব?
- আশপাশের এলাকায় কোন স্কুল রয়েছে?
- স্কুলগুলো কোন ধরনের নীতি ও সংস্কৃতি ধারণ করে?
- স্কুলের ডেমোগ্রাফি কী ধরনের?
- ছাত্র-ছাত্রীদের দৃষ্টিভঙ্গী কীরকম?
- শিক্ষক ও অন্যান্য স্টাফদের আচরণ কী ধরনের?
- সেখানে কী ধরনের সুবিধা দেওয়া হয়?
- স্কুলের ব্যাপারে পরিদর্শন রিপোর্ট প্রতিবেদন, শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকদের মন্তব্য কী?
- স্কুলের এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিস কতটুকু মানসম্মত?
- আপনি কি মনে করেন, আপনার সন্তানের জন্য উক্ত স্কুল উপযুক্ত?

স্কুলজীবনের শুরু

স্কুলজীবনের শুরুটা শিশুদের জন্য খুবই রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। কারণ, এর মাধ্যমে তাদের স্বাধীন শৈশব জীবনের শুরু হয়। স্কুলে তারা নানা ধরনের শিক্ষা এবং অনেক বন্ধু তৈরির সুযোগ পায়। কিছু কিছু শিশু স্কুলজীবনের শুরুতে একা একা স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে স্কুলে যাওয়াকে উপভোগ করে। আবার কিছু শিশু ভয় পায়। অধিকাংশ শিশুর ক্ষেত্রে স্কুলের এই কাঠামোবদ্ধ নিয়মকানুন

www.nagorikpathagar.org

এবং কয়েক ঘন্টার জন্য পিতা-মাতার থেকে বা বাড়ির পরিবেশের বাইরে থাকায় অভ্যস্ত হতে সময় লাগে। তারা সময়মতো নিজেদের ভয় ও বিরক্তি প্রকাশ করতে পারে না, যা তাদের আচরণে স্পষ্ট পরিবর্তন নিয়ে আসে। সেখানে তাদের আচরণে আরও বেশি কান্না, অন্তর্মুখিতা, আঙুল চোষা ইত্যাদি বিষয় দেখা দেয়।

এই সময়টি অভিভাবকদের কাছে খুবই কঠিন একটি সময়। কেননা, কোনো পিতা-মাতাই সন্তানদের অখুশি দেখতে চায় না। শিশুদের এমন আচরণগত পরিবর্তনের জন্য তাদের কোনো শাস্তি কিংবা বকাবকি করা উচিত নয়। কারণ, এতে বিপরীত প্রতিক্রিয়াও হতে পারে। বাবা-মায়ের উচিত হলো—স্কুলের সাথে আলাপ করে ছেলেমেয়েদের স্কুলের পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে সহায়তা করা। যত্ন ও সংবেদনশীলতা প্রয়োগ করলে এ সময়টা খুব দ্রুত পার হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ।

প্রাইমারি স্কুলে কিছু সমস্যা

প্রাইমারিতে শিশুরা সাধারণ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়। এর মধ্যে কিছু সমস্যার জন্ম হয় স্কুল থেকে। তাদের মধ্যে অস্বাভাবিক কোনো আচরণ দেখা দেওয়ার আগেই অভিভাবকদের এই ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত।

ক. স্কুলভীতি : নতুন কিছুতে ভয় পাওয়া মানবীয় চরিত্রের একটি সহজাত বিষয়। শিশুদের মধ্যে কিছু সাধারণ ভয় কাজ করে, যা কম সময়ই থাকে। কিন্তু এ সময়টা অভিভাবকদের দুশ্চিন্তায় ফেলে দেয়। কিছু শিশু কোনো দৃশ্যমান কারণ ছাড়াই স্কুলে যেতে চায় না। এক্ষেত্রে পিতা-মাতার কর্তব্য হলো—আগে এর কারণ নির্ধারণ করা। অর্থাৎ সে কি ক্লাসের শিক্ষক কিংবা সহপাঠীদের সঙ্গে কোনো ঝামেলার কারণে যেতে চায় না, নাকি এর পেছনে কোনো শারীরিক বা মানসিক সমস্যা জড়িত, নাকি নিছক মনের ভয়। অনেক সময় শিশুরা মায়েদের থেকে দূরে থাকার কারণে দুশ্চিন্তায় ভোগে। নির্দিষ্ট কারণ খুঁজে বের করা সময় ও ধৈর্যের ব্যাপার। কেননা, বয়সের স্বল্পতার কারণে অনেক সময় শিশুরা তাদের মনের আবেগটি ভালোভাবে ব্যক্ত করতে পারে না। কারণ যাই হোক, পিতা-মাতার উচিত তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া, তাদের প্রচুর ভালোবাসা ও আশ্বাস দেওয়া। শিক্ষকদের সহায়তা নিয়ে সঠিক কারণ নির্ধারণ করা এবং তা বাস্তবায়নের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।

www.nagorikpathagar.org

খ. হেনস্তার শিকার (Bullying) : কিছু বাচ্চা আছে, যারা প্রচুর হইহুল্লোড় ও আনন্দ করতে ভালোবাসে; বিশেষ করে খেলার মাঠে। কিছু আছে নির্জনবাসী, আবার কিছু আছে দুরন্ত। যারা কোলাহল সৃষ্টি করে, তাদের কেউ কেউ আক্রমণাত্মকও হতে পারে। তারা অন্যান্য শিশুদের হেনস্তা করে। বিশেষ করে তারা কোনো নিরীহ শিশু পেলেই হেনস্তা করার পাঁয়তারা করে। এটি মৌখিক, মানসিক কিংবা শারীরিক যেকোনো ধরনের হতে পারে। হেনস্তার শিকার শিশুরা স্কুলে যেতে এমনকী বড়োদের সাথে কথা বলতেও অনাগ্রহ প্রকাশ করে। যদি অভিভাবকগণ এ রকম কোনো লক্ষণ শিশুদের মাঝে দেখতে পায়, তাহলে তাদের উচিত দ্রুত স্কুলে গিয়ে এর সমাধানে শিক্ষকদের সাথে কথা বলা।

গ. আত্মসম্মানবোধের সংকট : প্রত্যেক মানুষের জীবনে আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটি মানুষকে জীবনে সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে শক্তি জোগায়। সন্তানদের আত্মসম্মানবোধ বাড়ানোর ক্ষেত্রে পিতা-মাতার অবদান সবচেয়ে বেশি। পিতা-মাতা যদি তাদের স্নেহ করে, তাদের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলে, তাদের অর্জনগুলোর স্বীকৃতি দেয়, তাহলে বাচ্চাদের আত্মসম্মানবোধ বাড়ে। অন্যদিকে তারা যদি পিতা-মাতা থেকে সব সময় নেতিবাচক ও খারাপ আচরণ ও চাহনি পায়, তাহলে তাদের আত্মসম্মানবোধ কমে যায়।

কিছু বাচ্চা আছে অনেক বেশি লাজুক। তাদের লজ্জাবোধের ২টি কারণ হতে পারে—

১. শালীনতা

২. আত্মকেন্দ্রিকতা।

এর মধ্যে শালীনতাকে ইসলাম শুধু পছন্দই করে না; বরং উৎসাহ দেয়। অন্যদিকে আত্মকেন্দ্রিকতা হলো আত্মবিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত। একজন মুসলিমের কখনোই আত্মকেন্দ্রিক হওয়া উচিত নয়। আত্মবিশ্বাসহীন শিশুরা পরনির্ভরতায়ও ভোগে। তাই শিশুদের থেকে আত্মকেন্দ্রিকতা দূর করতে হবে।

ঘ. আচরণগত সমস্যা : বাচ্চারা সাধারণত চায় তাদের আশপাশের মানুষগুলো সব সময় তাদের অনেক ভালোবাসুক, তাদের ভালোভাবে গ্রহণ করুক, তাদের সাথে সংবেদনশীল আচরণ করুক বা ভালো কথা বলুক। যদি কোনো কারণে তারা মনে করে, তাদের পিতা-মাতা বা শিক্ষকরা তাদের মূল্যায়ন করছে না, তাহলে তারা নিজেদের প্রত্যাখ্যাত মনে করে। পিতা-মাতা যদি অনবরত নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি করতে থাকে বা কথা কাটাকাটি করতে থাকে,

www.nagorikpathagar.org

তাহলে বাসার এ পরিস্থিতি শিশুর জীবনে মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করে। শিশুরা এসব সমস্যার জন্য নিজেদের দোষী মনে করে এবং হীনম্মন্যতায় ভোগে।

কিছু বাচ্চার মধ্যে খারাপ সামাজিক আচরণও লক্ষ করা যায়। তারা বিভিন্ন নিয়মকানুন ভঙ্গ করে এসব দুশ্চিন্তা থেকে বেঁচে থাকতে চায়। আবার কিছু শিশু সমাজ থেকে নিজেদের আলাদা করে, শিশুসুলভ আচরণ থেকে দূরে থেকে এসব সমস্যা থেকে বাঁচতে চায়। এ প্রতিক্রিয়া হালকা কিংবা তীব্রও হতে পারে। যেসব বাচ্চা সবার সাথে খারাপ সামাজিক আচরণ করে, তারাই নীরবে কষ্টে ভোগে। পিতা-মাতা ও শিক্ষকদের অবশ্যই শিশুদের আচরণগত পরিবর্তনের দিকে লক্ষ রাখা উচিত। দ্রুত খুঁজে বের করা দরকার, এই পরিবর্তন কি বাসার পরিবেশের কারণে হচ্ছে, নাকি স্কুলের পরিবেশের কারণে। শিশুদের আশ্বস্ত করতে হবে, এটা তাদের সমস্যা না। ধৈর্যের সাথে তাদের ব্যবহারিক সমস্যা সমাধান করা দরকার। যখন শিশুরা অনুভব করে, নির্ভরযোগ্য বড়োরা তাদের কথা শোনে এবং তাদের বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করে, তখন তারা চরম ব্যবহার থেকে আস্তে আস্তে দূরে আসার চেষ্টা করে।

ঙ. প্রতিভাধর বাচ্চাদের জন্য চ্যালেঞ্জ : বড়ো হওয়ার সাথে সাথে স্পষ্ট হতে থাকে, শিশুরা সাধারণ প্রতিভাবান নাকি অস্বাভাবিক প্রতিভাবান; তারা সহজেই বুঝতে পারে, নাকি আলাদা যত্নের দরকার পরে? বাচ্চারা যদি অস্বাভাবিক প্রতিভাবান হয়, তাহলে সাধারণত পিতা-মাতা তাদের নিয়ে গর্ব করে। ভাবে, মেধাবী বিধায় সব বিষয়েই তারা পারদর্শী হবে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হলো—সব শিশু প্রতিভাবান হলেই সামাজিক ও মানসিকভাবে পরিপক্ব হয় না। এটি একটি বড়ো সমস্যা। ছোটোবেলা থেকেই বাচ্চাদের ভালো ফলাফলের দিকে নজর দিতে গিয়ে অধিকাংশ পিতা-মাতাই বাচ্চাদের অনুভূতিসংক্রান্ত বা মনস্তাত্ত্বিক চাহিদার কথা ভুলে যান। তারা ভুলেই যান, বাচ্চাদের সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সবদিক থেকেই তৈরি করা পিতা-মাতার একটি বড়ো দায়িত্ব। শিশুরা অনেক বুদ্ধির অধিকারী হতে পারে, তাই বলে পিতা-মাতার উচিত নয় তাদের এই মেধাকে অসৎ কোনো কাজে ব্যবহার করা; বরং তাদের পরিকল্পনা করা দরকার, কীভাবে শিশুর এই প্রতিভা কল্যাণকর কাজে লাগানো যায়।

অনেক অতি উৎসাহী অভিভাবক সন্তানদের ছোটোবেলা থেকেই নানান কথা বলে চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। যেমন : 'তোমাকে এ অর্জন করতে হবে, তোমাকে ক্লাসে প্রথম হতে হবে, ওই বাচ্চার চেয়ে বেশি অর্জন করতে হবে' ইত্যাদি।

www.nagorikpathagar.org

এসবের দ্বারা পিতা-মাতার উদ্দেশ্য হলো অন্যান্যদের সামনে গর্ব করা। কিন্তু একজন মুসলিমের জীবনের সফলতা শুধু প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনায় ভালো হওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং তাদের প্রতিভা সমাজে কিংবা সাধারণ মানুষের কতটুকু কাজে লাগে—এটাও সফলতার জন্য বিবেচ্য বিষয়।

১৯৯০ দশকের শেষ পর্বে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী বিস্ময় বালিকা সোফিয়া ইউসুফের কথা স্মরণ করা যায়। অল্প বয়সেই তার খ্যাতি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু পরবর্তী সময়ে তার জীবনের বিপদগুলো একটা জ্বলন্ত প্রমাণ। শিশু বয়সকে উপভোগ করার পরিবর্তে তাকে সে সময় মিডিয়া ও পরিবারের চাপ সামলাতে হয়েছিল। এখন সারা বিশ্বের সব শিক্ষাবিদ একমত—শিশু যতই জ্ঞানী বা প্রতিভাবান হোক না কেন, তাদের কোনো বিষয়ে এমন চাপ দেওয়া উচিত নয়—যা তার শৈশব জীবনের আনন্দ-উপভোগকে নষ্ট করে দেয়।

চ. শেখার ক্ষেত্রে সমস্যা : কিছু শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে স্কুলে অতিরিক্ত যত্নের দরকার পড়ে। কারণ, শারীরিক ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে তারা কিছু সমস্যার মধ্যে থাকে। এতে আপাত দৃষ্টিতে তাদের অপরিপক্ব বলে মনে হয়। এটা তাদের শিক্ষার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। পিতা-মাতা ও শিক্ষকের উচিত বাচ্চাদের স্কুলজীবনের শুরুতেই এই ধরনের সমস্যা সতর্কতার সাথে চিহ্নিত করা।

সাধারণত নিচের সমস্যাগুলোর কারণে শিশুদের অপরিপক্ব বলে মনে হতে পারে—

শারীরিক সমস্যা : সুস্থ শরীর কার্যকর উপায়ে শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রাকৃতিকভাবে কিছু বিষয় আছে, যা পড়াশোনায় প্রভাব বিস্তার করে। যেমন : শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি। শারীরিকভাবে সুস্থ না হলে শিশুরা পড়াশোনায় কিছুটা ধীর লয়ের হয়। ফলে তাদের বাড়তি যত্নের দরকার পড়ে।

কগনিটিভ সমস্যা : স্পেশাল নিডস গ্রুপের শিশুদের মধ্যে বড়ো একটি অংশ আছে, যারা আস্তে আস্তে শেখে। এই ধরনের শিশুরা সাধারণত বয়সের সাথে পাল্লা দিয়ে ভাষা ও জ্ঞানে পরিপক্ব হতে পারে না। এই ভাষাগত সমস্যার কারণে তারা ক্লাসে অনেক কিছুই বুঝতে পারে না। তাই বিষয়গুলো তাদের কাছে কঠিন লাগে এবং পড়াশোনায় তারা অমনোযোগী হয়।

www.nagorikpathagar.org

বোধশক্তি বা আচরণগত সমস্যা : অনেক শিশু আচরণগত কিংবা আবেগের দিক থেকে নিয়ন্ত্রণহীনতায় ভোগে। এই ধরনের শিশুরা ক্লাসের অন্যদের সাথে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে না। ফলে ক্রমান্বয়ে তাদের আত্মসম্মানবোধ কমতে থাকে এবং তারা একাডেমিক কারিকুলামের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে ব্যর্থ হয়।

ভাষাগত সমস্যা : এটার শুরু হয় ভাষাগত কাঠামো না জানার কারণে অথবা কোন পরিবেশে কীভাবে কথা বলতে হবে—তা না জানার কারণে। শিশুদের মধ্যে সাধারণত কথা শুনতে পারা এবং বলতে পারার সমস্যা দেখা যায়। এর কারণে তারা ক্লাসে শিক্ষকের কথা ভালোভাবে শুনতে পায় না অথবা যা বুঝেছে, তা ভালোভাবে বলতে বা উপস্থাপন করতে পারে না। এই কারণে তারা ক্লাসে পিছিয়ে পড়ে।

সামাজিক সমস্যা : শিশুদের সুস্থভাবে বেড়ে উঠার জন্য একটি সুন্দর পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ দরকার। যখন তারা একটি উপযুক্ত পরিবেশে বেড়ে উঠে, তখন তারা নিজেদের মুক্তভাবে মেলে ধরতে পারে, স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে এবং যেকোনো কিছু দ্রুত শিখতে পারে। কিন্তু যদি একটি শিশুর বেড়ে উঠা একটি ভালো পরিবারে না হয়, তবে সে ভালোবাসাহীন বা স্নেহহীনভাবে কৈশোরে পা রাখে।

বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন মানেই এটা বোঝায় না, সে অক্ষম বা দুর্ভাগা। আল্লাহ একেক মানুষকে একেক গুণাবলি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। সবাই কোনো না কোনো দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। সবাইকে তার প্রভু কোনো না কোনো গুরুত্বপূর্ণ সক্ষমতা দিয়ে তৈরি করেছেন। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই প্রাকৃতিকভাবে কিছু শক্তির জায়গা এবং কিছু দুর্বলতার জায়গা রয়েছে। সুতরাং পিতা-মাতার কখনোই উচিত নয় সন্তানদের অন্য সহোদর কিংবা বন্ধুদের সাথে তুলনা করার মাধ্যমে তাদের ভিত্তি দুর্বল করে দেওয়া। অগ্রাহ্যতা তাদের আত্মবিশ্বাসকে ধ্বংস করে দিতে পারে। যদি কোনো বাচ্চার মধ্যে বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার লক্ষণ দেখা দেয়, তবে অভিভাবকের উচিত দ্রুত এক্সপার্টের সাথে পরামর্শের মাধ্যমে তা মূল্যায়ন এবং তার জন্য যথার্থ স্কুল খুঁজে বের করা।

ছ. রূঢ় ভাষা

‘সে সকল বিশ্বাসীরা সফল হয়েছে, যারা তাদের নামাজে বিনয়ী এবং অনর্থক কথাবার্তা থেকে বিরত থাকে।’ সূরা মুমিনুন : ১-৩

www.nagorikpathagar.org

অন্যান্য মানুষদের সাথে ভাবের আদান-প্রদান করার ক্ষেত্রে ভাষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি মাধ্যম। এর দ্বারা একজন মানুষের চরিত্র ও মর্যাদার প্রকাশ ঘটে।

এক্ষেত্রে মুখের ভাষা মূল বিষয়। মুখের ভাষা ভালো হওয়ায় একজন মানুষ যেমন মহান আল্লাহ তায়ালার ও মানুষের খুব কাছের মানুষ হতে পারে, তেমনি মুখের ভাষা খারাপ হওয়ার কারণে সে মহান রব ও অন্য মানুষের শত্রুতেও পরিণত হতে পারে। একজন মুসলিমকে অন্যের সাথে কথা বলার সময় শালীন ভাষা প্রয়োগের দিকে অবশ্যই জোর দিতে হবে। একজন সভ্য ও ভদ্র মানুষ আচরণের ক্ষেত্রে খুবই বিনয়ী ও রুচিশীল হয়। ভাষাই হচ্ছে সভ্যতা ও রুচিশীলতার ক্ষেত্রে আয়নাস্বরূপ। সমাজ যখন পতনের দিকে এগোয়, অশালীন ভাষা তখন সমাজে ছড়িয়ে পড়ে।

একটি সুখী পরিবার পরিচালনা করতে এবং সমাজে সবার সাথে সুন্দর সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে শালীন ভাষা প্রয়োগ করা অপরিহার্য। আমাদের উচিত খুব সুন্দর ও শালীনভাবে সবার সাথে কথা বলা; এমনকী বাচ্চাদের সাথেও, যেমনটা আমরা তাদের থেকে আশা করি। দুঃখজনকভাবে বর্তমানে মূল্যবোধহীন আধুনিক সংস্কৃতির প্রভাবে শালীন ভাষা সমাজ থেকে উঠে যাচ্ছে। বর্তমানে রাস্তা-ঘাটে, অনলাইন দুনিয়ায়, খেলার মাঠে পর্যন্ত আধুনিক বিনোদনের ভাষা হিসেবে স্পষ্টভাবে যৌনতা ও নিষিদ্ধ ভাষার প্রয়োগ দেখা যাচ্ছে। বলা চলে, এটাই এখন সাধারণ বিষয় হয়ে গেছে।

মুসলিম অভিভাবকদের নিশ্চিত করা উচিত, যাতে কোনোভাবে সোশ্যাল মিডিয়ার ফাঁদে পড়ে বা টেলিভিশনের দ্বারা এসব খারাপ অভ্যাসে সন্তানরা জড়িয়ে না পড়ে। যদি কখনো খেয়াল করেন, আপনার বাচ্চা স্কুল থেকে বাসায় আসার সময় কিছু খারাপ শব্দ নিয়ে এসেছে, তবে মনে রাখবেন—এটি আপনার জন্য বড়ো ধরনের বিপদসংকেত। এক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে তাদের বলে দিতে হবে, কেন এমন শব্দের ব্যবহার ভালো নয়। এগুলো তাদের অভ্যাসে পরিণত হওয়ার আগেই ত্যাগ করানোটা খুবই জরুরি।

মুসলিম পিতা-মাতার কখনোই উচিত নয় ইসলামের বেসিক আদর্শের সাথে আপস করা। একটি শিশুর বেড়ে উঠার সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের সদস্যদের সাথে এবং সমাজের অন্যান্যদের সাথে কীরকম আচরণ করছে, তা পিতা-মাতাকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

একজন মুসলিম হতাশ কিংবা রাগান্বিত হতে পারে—এটা কোনো বিষয় নয়, কিন্তু তাকে অবশ্যই তার মুখের ভাষা নিয়ন্ত্রণ করা শিখতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

পড়ার গুরুত্ব

একটা অভ্যাস ছোটোবেলা থেকেই আমাদের সন্তানদের মাথায় গেঁথে দিতে হবে, তা হচ্ছে—বইয়ের প্রতি ভালোবাসা এবং বই পড়ার অভ্যাস। এটা হচ্ছে একটা জাতির সফলতার সূচক এবং সভ্যতার নির্দেশক। একটি শিক্ষিত সমাজ শুধু তাদের সময়েই সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও পথ দেখায়।

'বই' শুধু প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার উপাদান নয়; বরং এটি উপভোগ ও বিনোদনেরও উৎস। এটি শিশুর মাথায় নতুন পৃথিবীর সন্ধান দেয়, যেখানে সে কল্পনার রাজ্যে হারিয়ে যায়। একটা ভালো বই পাঠকের অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ জোগায়। চিন্তা করার সক্ষমতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও গৌরাবাকাঙ্ক্ষা তৈরি করে। যখন আমরা পড়ি, তখন অনেক বেশি সচেতন হই। কেননা, বই পড়ার মাধ্যমে আমরা অন্য একজন ব্যক্তির অভিজ্ঞতা ও মতামত জানতে পারি। এটি আমাদের চিন্তার জগৎকে শাণিত করতে এবং আমাদের উদ্দেশ্যগুলোকে আরও বড়ো করতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, বই আমাদের এবং আমাদের বাচ্চাদের জীবনের সাথি হওয়া উচিত। প্রত্যেক অভিভাবকের কর্তব্য হলো—সন্তানদের ছোটোবেলা থেকেই বইয়ের প্রতি আকৃষ্ট করা। প্রত্যেকটি মুসলিম পরিবারের উচিত বাসায় বই রাখা এবং সম্ভব হলে ছোটো আকারের একটা লাইব্রেরিও গড়ে তোলা। যখন শিশুরা সহজে হরেক রকমের মজাদার এবং চিন্তা-ভাবনা উদ্দীপক বই দেখবে, তখন তারা নিজ থেকেই তা পড়া শুরু করবে। এতে তাদের চিন্তার স্তর উন্নত হবে।

অভিভাবক-স্কুল পার্টনারশিপ

পিতা-মাতা সন্তানদের ভালোভাবে জানেন, কিন্তু বাচ্চাদের শিক্ষা দেওয়ার অভিজ্ঞতা সব সময় তাদের থাকে না। আবার শিক্ষকদের শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা থাকে, কিন্তু তারা বাচ্চা সম্পর্কে পিতা-মাতার চেয়ে বেশি জানেন না। তাই এক্ষেত্রে বাচ্চাদের শিক্ষার জন্য অভিভাবক ও শিক্ষকদের সমন্বিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন।

এটা অপরিহার্য, পিতা-মাতা প্রশ্ন করার মাধ্যমে বাচ্চা থেকে জেনে নেবে—সে আজ সারাদিন স্কুলে কী কী করেছে। কিছু বাচ্চা আছে যারা খুব সহজেই সবকিছু বিস্তারিত বলতে পছন্দ করে। আবার কিছু আছে, যাদের থেকে উৎসাহ দেওয়ার মাধ্যমে বা প্রশ্ন করার মাধ্যমে জেনে নিতে হয়। পিতা-মাতা যদি যথেষ্ট সময় ও মনোযোগের সাথে তাদের কথা শোনে, তবে তারা নিজের স্কুল অভিজ্ঞতা

www.nagorikpathagar.org

অভিভাবকদের সাথে শেয়ার করতে আগ্রহী হবে। পিতা-মাতার উচিত সন্তানদের সকল ভালো কাজ ও প্রচেষ্টার প্রসংশা করা। তাদের প্রত্যেকটি এটা তাদের আত্মবিশ্বাসকে বাড়াবে।

পিতা-মাতা উভয়েরই উচিত মাঝেমধ্যে শিক্ষকদের সাথে বসে নিজ চোখে বাচ্চাদের ক্লাসওয়ার্ক দেখা। যদি বাচ্চাদের পড়াশোনা অথবা তাদের সঠিক উন্নতির ব্যাপারে কোনো কারণে আভিভাবকদের মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়, তবে দ্রুত প্রাসঙ্গিক কোনো শিক্ষককে এই ব্যাপারে অবহিত করতে হবে। শিশুদের ভালোভাবে মানুষ করার জন্য স্কুল ও বাড়ির মধ্যে একটি গঠনমূলক সম্পর্ক থাকতে হবে। অনেক স্কুল আছে, যারা বিভিন্ন জরিপ ও প্রশ্নমালার মাধ্যমে অভিভাবকদের স্কুলের কাজকর্মে অন্তর্ভুক্ত করে, এমনকী কোনো কোনো জায়গায় তাদের গভর্নিং বডিতেও রাখেন। এ সবকিছুর মূল উদ্দেশ্য হলো—পিতা-মাতা যেন সন্তানদের পড়াশোনায় এবং তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য গঠনমূলক মন্তব্য করার পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিতে পারেন। পেছনে বসে একটা প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করা বা অসন্তোষ প্রকাশ করা ইসলামে অপছন্দনীয়।

পিতা-মাতার জন্য প্রথম পদক্ষেপ হলো—সন্তানকে যেখানে দেওয়া হয়েছে, তার ব্যাপারে ভালো জ্ঞান রাখা। স্কুলে সম্প্রতি কী কী ঘটেছে, স্কুলের কারিকুলাম এবং স্কুলের শক্তির জায়গা এবং দুর্বল দিক সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা রাখা। প্রতিষ্ঠানে মতামত ব্যক্ত করা কিংবা চিন্তা-ভাবনা বিনিময়ের ক্ষেত্রে বিনয়ের সাথে, এমনকী প্রয়োজনে দৃঢ় হওয়া উচিত। স্কুল অপরিবর্তনশীল জায়গা নয়; সেখানে দশকের পর দশক একই বিষয় পড়ানো হয়। গতিশীল প্রতিষ্ঠানগুলো সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন হয়।

শিশুদের একটি ভারসাম্যপূর্ণ বেড়ে উঠা নিশ্চিত করার জন্য পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে সম্পূরক সম্পর্ক থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঐতিহাসিক শিক্ষাবিদগণ সব সময় বাচ্চাদের জন্য বাড়ির পরিবেশ এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশের মিলের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। স্কুলের সাথে পারিবারিক সম্পর্ক একটি শিশুর স্কুলে পারফরমেন্সের উন্নতি এবং তার আচার-ব্যবহারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। অভিভাবক ও শিক্ষক সংঘ, পিতা-মাতার সাথে মিটিং ইত্যাদি সমন্বিত প্রচেষ্টা অভিভাবকদের সাথে স্কুলের শক্তিশালী যোগসূত্র তৈরি করে, যা শিশুর জন্য অনেক কল্যাণ বয়ে আনে। ইসলাম একটি শিশুর পড়াশোনা ও বেড়ে উঠার ক্ষেত্রে একটি নিরাপদ বাসার পরিবেশ, সমাজ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ওপর গুরুত্বারোপ করে থাকে।

www.nagorikpathagar.org

পারিবারিক পরিবেশ

'আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের ঘরকে শান্তির আবাস বানিয়েছেন।'
—সূরা নাহল : ৮০

স্কুল হচ্ছে একটি আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকেন্দ্র; যা মানুষকে সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করতে সাহায্য করে। শিশুর জীবনে পরিবারই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নোঙর। যখন আমাদের চারপাশের পৃথিবী প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হচ্ছে এবং বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে, তখন পরিবার একটি বিশ্বস্ত আশ্রয়স্থল হওয়া উচিত; যেখানে শিশুরা পাবে নিরাপদ ও উপযুক্ত পরিবেশ। পরিবার এমন একটা স্থান হওয়া উচিত, যেখানে বড়োদের যত্ন ও ভালোবাসাই হবে তাদের সুখ ও আনন্দের কেন্দ্রবিন্দু। ঘরই হবে শিশুদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আশীর্বাদ। এটা বলতে কোনো দ্বিধা নেই—একটি সুস্থ, সুন্দর, বলিষ্ঠ সমাজ তৈরি করতে সুখী ও স্থিতিশীল পরিবারের বিকল্প নেই। এই ধরনের পরিবার এমন এক প্রতিষ্ঠানের ন্যায়, যেখানে এর হাল ধরার জন্য ভালো লিডার রয়েছে।

পরিবার এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া উচিত, যেখানে পিতা-মাতা ভালো কাজের ও নৈতিকতার নেতৃত্ব দেয়। ইসলামের দৃষ্টিতে পিতা-মাতা মেষপালকের মতো, যারা একটা শিশু বড়ো হওয়ার আগ পর্যন্ত তার শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের দায়িত্ব পালন করে। যে দায়িত্বের শুরু হয় শিশুদের খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান নিশ্চিত করার মাধ্যমে। এর উচ্চতম পর্যায় হলো মহামানবদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার শিক্ষা দেওয়া।

ভালোভাবে দায়িত্ব পালননের জন্য পিতা-মাতা উভয়কেই স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করতে হবে। নিরাপদ ও বিশ্বস্ত আশ্রয়স্থল হওয়ার পাশাপাশি পরিবারকে শিশুর ব্যক্তিগত ও চারিত্রিক উন্নতির বিষয়গুলোও শিক্ষা দেওয়া জরুরি।

www.nagorikpathagar.org

শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে পরিবারের কর্তব্য

আধুনিক স্কুল শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের সন্তানদের দুনিয়াবি সমৃদ্ধির জন্য নিজের মেধার সর্বোচ্চটা ব্যবহার করতে শেখায়। অর্থনৈতিক ও বস্তুগত উন্নতিই এর মূল লক্ষ্য। সেখানে মানবীয়, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়গুলোকে গৌণ ও ছোটো হিসেবে বিবেচনা করা হয়; অথচ কোনো মানুষ তার আত্মিক উন্নতি করা ছাড়া পরিপূর্ণ হতে পারে না।

> 'সেদিন সম্পদ ও সন্তান কোনো কাজে আসবে না; শুধু পবিত্র ও পাপমুক্ত আত্মা ছাড়া।' সূরা আশ-শুআরা : ৮৮-৮৯

এটি এমন একধরনের শিক্ষা, যা পারিবারিক পরিবেশে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। এটি এ রকম কোনো শিক্ষা নয়, যেটা সন্তানদের সপ্তাহে একদিন কোনো ইসলামিক স্কুল কিংবা মাদরাসায় পাঠানোর মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া যাবে; যদিও এক্ষেত্রে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা রয়েছে। এ লক্ষ্যে পিতা-মাতাকে এমন একটি পরিবেশ তৈরি করতে হবে, যেখানে সন্তানরা সহজে ইসলামিক জ্ঞানার্জন, বিশ্বাসের চর্চা এবং আমল করতে পারবে। এর অর্থ এই নয়, প্রত্যেক পিতা-মাতাকে ইসলামিক স্কলার হতে হবে। তবে তাদের অবশ্যই সন্তানদের শিক্ষার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করা প্রয়োজন এবং যারা ইসলামের গভীর জ্ঞান রাখেন, তাদের দ্বারা শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

অন্যান্য সৃষ্টি থেকে মানুষকে প্রাধান্য দেওয়ার মূল কারণই হলো জ্ঞান বা ইলম। প্রত্যেকটি ইসলামিক পরিবারে ছোটো পরিসরে হলেও একটি লাইব্রেরি থাকা উচিত, যেখানে ইসলামিক এবং অন্যান্য বিষয়ের বই থাকবে। পিতা-মাতাকে অবশ্যই সে সকল বইয়ের উৎসের বিশ্বস্ততা বা নির্ভরযোগ্যতার ওপর লক্ষ রাখতে হবে। আংশিক সঠিক কিংবা উগ্রবাদী মন-মানসিকতাপূর্ণ বই তাদের ইসলামের প্রতি দ্বিধায় ফেলতে পারে, যা সার্বিকভাবে তাদের ইসলাম থেকে দূরে রাখবে। যে সকল বই শিশুদের পড়ার প্রতি আগ্রহী করে তুলবে, সেগুলো নির্বাচন করতে হবে। বই নিতে হবে মূল উৎস থেকে—যা ইন্টারনেট, অডিও বা ভিডিও দ্বারা পুনঃস্থাপন করা যাবে না।

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ রয়েছে—যা আমাদের ত্যাগী, বস্তুবাদহীন এবং সমাজের অন্য মানুষদের প্রতি বিনয়ী হতে শিক্ষা দেয়। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আমাদের সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে ভাবতে, তাঁর শোকর আদায় করতে এবং তাঁর রাহে মাথা নত করতে শেখায়। জাকাত উম্মাহর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ় করে।

www.nagorikpathagar.org

রমজানের রোজার মাধ্যমে অনেক গুণাবলি অর্জন করা যায়। তাই আমাদের ইসলামের মৌলিক ইবাদতের ক্ষেত্রে থাকতে হবে আপসহীন।

একজন প্র্যাক্টিসিং মুসলিমের কখনোই শারীরিক কিংবা মানসিকভাবে অলস বা গালগল্পের মধ্যে ডুবে থাকা উচিত নয়। ইসলাম আমাদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের বিধান রেখেছে, যেখানে কিছু সূরা ও জিকির মুখস্থ করতে এবং মুখ দিয়ে তা জপতে হয়। এগুলো বাচ্চাদের ছোটো বয়সেই শেখাতে হবে। শিশুদের মধ্যে কোনো কিছু দ্রুত আয়ত্ত করার অসাধারণ ক্ষমতা রয়েছে। প্রাইমারি স্কুলের বয়সে শিশুদের কুরআন মুখস্থ করা, সরল অনুবাদ এবং আরবি ভাষার সঠিক উচ্চারণ এবং আরবি ভাষা শেখার শ্রেষ্ঠ সময়। পিতা-মাতা হিসেবে আমরা আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী ইসলামি বিধান বাসায় মানার চেষ্টা করব এবং সন্তানদের বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে তা শেখানোর চেষ্টা করব, বাকিটা নির্ভর করবে মহান আল্লাহর হাতে।

ব্যক্তিগত উন্নয়নের কেন্দ্র হিসেবে পরিবার

শিশুরা প্রাকৃতিকভাবে উদ্যমী ও চঞ্চল। তারা সব সময় ছোটাছুটির মধ্যে থাকে। তাদের এ বাধা-বিপত্তিহীন শারীরিক ও মানসিক চঞ্চলতাকে সুন্দরভাবে কাজে লাগাতে পিতা-মাতার উচিত তাদের শারীরিক ও মানসিক কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করা, যা শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সাহায্য করবে। তবে অবশ্যই তাদের সাধ্যের বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে, এটা কেবলই শিশুদের আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতা বাড়ানোর জন্য।

শিশুদের ঘরের বাইরেও একটি সুস্থ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ দিতে হবে, যেখানে তারা খেলাধুলা করবে এবং বিনোদন গ্রহণ করবে। এটা হতে পারে পার্কে হাঁটাহাঁটি করা, তাদের সাথে ফুটবল খেলা কিংবা দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া। এ ছাড়াও বই পড়ে, ছবি আঁকাআঁকির দ্বারা তাদের মানসিক কার্যক্রম উৎসাহিত করা যেতে পারে।

সন্তানকে পরিবারের একজন মূল্যবান সদস্য হিসেবে পরিবারের প্রতি তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে তাকে পরিবারের কিছু ছোটোখাটো কাজও দিতে হবে। যেমন—

- তাদের নিজেদের রুমগুলো গুছিয়ে এবং পরিষ্কার করে রাখা
- খাবার গ্রহণের শেষে টেবিল পরিষ্কার রাখা

www.nagorikpathagar.org

- তাদের অপরিষ্কার জামা-কাপড় নির্দিষ্ট স্থানে রাখা
- বাগান করার ক্ষেত্রে সাহায্য করা
- স্কুলের বইপত্র ও ড্রেসের ক্ষেত্রে সচেতন হওয়া
- গাড়ি পরিষ্কারে সাহায্য করা
- সময়মতো হোমওয়ার্কগুলো সম্পাদন করা
- দাদা-দাদি এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের সাথে যোগাযোগ রাখা এবং
- বাবা-মায়ের গৃহস্থালি কাজে সাহায্য করা।

শিশুদের অহেতুক চাপের মধ্যে রাখা এ সকল কাজের উদ্দেশ্য নয়; বরং তাদের দায়িত্ব-কর্তব্যের সঙ্গে পরিচিত করানো এবং পারিবারিক দায়িত্ব-কর্তব্যের প্রতি সচেতন করাই মূল উদ্দেশ্য। শিশুরা যখন বাড়িতে বাবা-মায়ের কাছ থেকে এ সকল দায়িত্ব সম্পর্কে জানে, তখন তারা অন্যান্য শিশুর থেকে অনেক বেশি নিজেদের বিকশিত করতে পারে এবং তাদের শৈশবটাও হয় বর্ণালি।

তাদের মধ্যে যদি এমন কিছু দেখা যায়—যা ইসলাম ও মানবতার সাথে সাংঘর্ষিক, তবে সময় নিয়ে তাদের সঠিক ধারণা দিতে হবে। তাদের আদর ও সংবেদনশীলতার সাথে বোঝাতে হবে—'তোমার এ ধারণাটি বা তোমার অভ্যাসটি ইসলামের এবং নৈতিক শালীনতার সাথে যায় না বা ইসলাম এটি সমর্থন করে না।' পিতা-মাতা যখন সন্তানদের সাথে সময় কাটাবে, তখন এ সকল বিষয় বোঝানো অনেক সহজ হবে।

সন্তানদের সাথে অর্থবহ সময় কাটানো

সারাদিন স্কুলে কাটানোর পরও কিছু শিশুর মধ্যে ক্লান্তি আসে না। ফলে তারা ঘুমোনোর আগেও কিছু করতে পছন্দ করে। যদি অভিভাবকরা সন্তানদের এ সময়টুকু ভালো কোনো কাজে লাগাতে না পারে, তবে তারা টিভি দেখে অথবা কম্পিউটারে গেমস খেলে এ সময়টা অতিবাহিত করবে।

সব অভিভাবকই জীবিকা অর্জনের পেছনে অনেক ব্যস্ত সময় পার করেন। অনেকে আবার বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকেন। ফলে অনেক বাবাই বাস্তবতার কারণে সন্তানদের যথেষ্ট সময় দিতে পারেন না। সারাদিন উপার্জনের পেছনে ব্যস্ত সময় কাটানোর পর তারা শারীরিক ও মানসিকভাবে অনেক ক্লান্ত হয়ে পড়েন। সন্তানদের খাওয়া-দাওয়া, স্কুলের জন্য তাকে প্রস্তুত করা,

www.nagorikpathagar.org

তার জামা-কাপড় পরিষ্কার করাসহ যাবতীয় বিষয়াদি মায়ের একাই দেখতে হয়। সন্তানকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা এবং অতিরিক্ত কাজ অনেক সময় তার ওপর চাপ সৃষ্টি করে। ফলে একসময় মনের অজান্তেই মা সন্তানকে বকা দিয়ে বসেন। মায়ের বকা খেয়ে শিশু নিজেকে একটি আবদ্ধ রুমের মধ্যে আটকে রেখে টিভি দেখে অথবা কম্পিউটারে গেমস খেলে।

আর যখন পিতা-মাতা উভয়ই চাকরি করে, তখন এর পরিণতি হয় আরও ভয়াবহ। এতে শৈশব শেষে দেখা যায়, শিশু তার জীবনের অধিকাংশ সময় ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহারের মাধ্যমেই কাটিয়েছে, যার কোনো পজেটিভ ফলাফল নেই। পিতা-মাতার মধ্যে বিভেদ থাকলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় শিশুরা। এতে সন্তানের সাথে তাদের বন্ধন হয় দুর্বল এবং সন্তান পরবর্তী জীবনে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।

সুতরাং সন্তানদের সাথে সময় কাটানো আয়েশ হিসেবে নয়; বরং অতি জরুরি হিসেবে দেখতে হবে। পিতা-মাতার উচিত দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা। শুধু ব্যয়বহুল কোনো প্রাইভেট স্কুল শিশুর জন্য শিক্ষা ও ভবিষ্যৎ কিনে আনতে পারে না। ভালো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভালো সার্টিফিকেট বা ডিগ্রি অর্জন জীবনের সফলতা নয়। কী হবে এ জীবন দিয়ে, যদি শুধু ধন-সম্পদ অর্জনের পেছনেই জীবনের মূল্যবান সময়গুলো ব্যয় করি এবং ভবিষ্যতের জন্য কিছু তৈরি করতে না পারি?

সন্তানদের সাথে একটা উল্লেখযোগ্য সময় কাটাতে হবে, যা কখনো কখনো একান্ত ব্যক্তিগত হবে। এই সময়টুকু হবে মায়া-মমতায় ভরা ও অর্থবহ। তাদের সাথে একসঙ্গে বসে কিছু দেখা, খোশগল্প করা, বাইরে ঘুরতে নিয়ে যাওয়া, পারিবারিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মজা করা, তাদের হোমওয়ার্ক তৈরিতে সাহায্য করা ইত্যাদি। ছোটোখাটো পদক্ষেপগুলো শিশুদের সাথে অভিবাবকদের বন্ধন সুদৃঢ় করে, বিশ্বাস ও ভালোবাসা বাড়ায়, আত্মীক ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয়।

আমাদের প্রিয়নবি মুহাম্মাদ ﷺ শিশুদের সঙ্গে শিশুর মতো আচরণ করার উপদেশ দিয়েছেন। তিনি তাঁর চাচা আব্বাস ؓ-এর তিন সন্তানকে নিয়ে একসঙ্গে খেলতেন এবং তাঁর দিকে দৌড়ানোর জন্য বলতেন। তাঁরা তাঁর ওপর লাফাত এবং দৌড়াত, আর নবিজি তাঁদের বুকে নিয়ে চুমু খেতেন। যখন তাঁর দুই নাতি হাসান ও হুসাইন ؓ তাঁর পিঠের ওপর উঠে খেলত, তখন মাঝে মাঝে তিনি তাঁর হাত ও হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে হামাগুড়ি দিতেন।

www.nagorikpathagar.org

অনেক সময় অনেক কাজের ব্যস্ততার কারণে শিশুদের সাথে কোয়ালিটি টাইম ব্যয় করা সম্ভবপর হয়ে উঠে না। এই জন্য সবার উচিত পারিবারিক কাজকর্মের একটা রুটিন করা এবং পারিবারিক নোটিশবোর্ডে লিখে রাখা। এতে লেখা থাকতে পারে পিতা-মাতার সাথে সন্তানদের বিভিন্ন কার্যক্রম, বাড়ির কাজ, নামাজের সময়, খাবার সময়, শোয়ার সময় ইত্যাদি। যখন সময়ের কাজ সময়মতো করা হবে, তখন এটাকে একটা দায়িত্ব বলেই মনে হবে।

সবকিছু আস্তে আস্তে করা গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, মানুষের অভ্যাস পরিবর্তন হতে সময় নেয়। অনেক সময় পিতা-মাতা যখন কোনো প্রকার ক্ষেত্র প্রস্তুত ছাড়াই সন্তানদের ওপর হঠাৎ আইন জারি করে বসেন। এতে সন্তানরা ক্ষুব্ধ হয়। পিতা-মাতার উচিত আইন জারি করার আগে তাদের মানসিক ও শারীরিকভাবে সেই নিয়মের জন্য প্রস্তুত করা। ইসলাম আস্তে আস্তে প্রস্তুত করতে উৎসাহ দেয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইসলাম সন্তানদের দশ বছর থেকে নামাজ পড়া বাধ্যতামূলক করেছে। কিন্তু পিতা-মাতাকে সাত বছর থেকে তাদের নামাজের প্রতি উৎসাহিত করার আদেশ দিয়েছে। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন—

> 'তোমাদের সন্তানদের সাত বছর থেকে নামাজের আদেশ দাও এবং দশ বছর থেকে তাদের শাস্তি দাও (যদি নামাজ না পড়ে) এবং তাদের বিছানা আলাদা করে দাও।' আবু দাউদ, আল হাকিম

একইভাবে, রোজার ব্যাপারে এবং কন্যাদের হিজাব বা পর্দার ব্যাপারে বালেগ হওয়ার আগে থেকেই আস্তে আস্তে চর্চা করানো বুদ্ধিমানের কাজ। আগে থেকে এগুলোতে অভ্যস্ত না করে হঠাৎ তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হলে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ইসলাম চায় মানুষের ব্যক্তিজীবনে ও সমাজজীবনে শৃঙ্খলা নিয়ে আসতে। সৃষ্টিকর্তাকে ভালোবাসতে, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হতে এবং আমাদের আরও ভালো মানুষ হতে। ইচ্ছার বিপরীত বা লোক দেখানো কাজ ইসলামে অর্থহীন। পিতা-মাতারই দায়িত্ব হলো কথা ও কাজের মাধ্যমে সন্তানদের উত্তম আচরণ শেখানো। মানুষের মতো মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান শিক্ষা দেওয়া এবং তা মানার ক্ষেত্রে নিশ্চিত হওয়া।

ইসলামিক আদব

নির্দিষ্ট সময়ে কিছু আমল করার নাম ইসলাম নয়; বরং ইসলাম হচ্ছে জীবনের পূর্ণাঙ্গ একটা পদ্ধতি, যা একজন ব্যক্তিকে জীবনের প্রত্যেকটা ধাপে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে পরিচালিত এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ে যেতে সাহায্য করে।

www.nagorikpathagar.org

কীভাবে খেতে হয়, কীভাবে পান করতে হয়, অন্য মানুষদের সঙ্গে কীভাবে সম্পর্ক বজায় রাখতে হয়—সবই ইসলাম শেখায়। যখন সমাজের প্রতিটি মানুষ ইসলামি আদব মেনে চলে, তখন পুরো সমাজ উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন হয়। সে সমাজ অন্ধকারে বাতিঘরের ন্যায় জ্বলজ্বল করতে থাকে, তখন অন্যান্য সমাজ তাদের দিকে আকৃষ্ট হয়।

একটা শিশুর খাওয়া ও পান করার আদব, খেলাধুলা, কথা বলা সবকিছুই তার পরিবারের পরিচয় বহন করে। একটি সুন্দর চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে কোনো কিছুকে নগণ্য মনে করা কাম্য নয়। আবু হাফস উমর ইবনে আবি সালামা ﵁ বলেন—

> 'আমি রাসূল ﷺ-এর যত্নে গড়া একটি শিশু ছিলাম। যখন আমি খেতে বসতাম, আমার বেখেয়াল হাত প্লেটের চারপাশে ঘুরত। রাসূল ﷺ বলতেন—"আল্লাহর নাম নিয়ে ডান হাতে শুরু করো এবং কাছ থেকে শুরু করো।" তখন থেকে তিনি আমাকে যেভাবে শিখিয়েছেন, সেভাবে আমি খাওয়ার চেষ্টা করি।' বুখারি ও মুসলিম

মুসলমানদের সমাজজীবনের আত্মা হচ্ছে আদব। আদব ছাড়া মুসলিম সমাজ কল্পনাও করা যায় না। নবুয়ত পাওয়ার আগেও নবি করিম ﷺ-এর ব্যবহার ছিল চমৎকার। তিনি তাঁর আশপাশের মানুষের মধ্যে সবচেয়ে দরদি ছিলেন। তিনি খুব সুন্দর ও মোলায়েম ভাষায় কথা বলতেন এবং অন্যদের সাথে ভালো ব্যবহার করার শিক্ষা দিতেন। এর জন্য তিনি কোনো প্রকার বিনিময় গ্রহণ করতেন না। তাই সাধ্যমতো তাঁকে অনুসরণ করাই একজন মুসলমানের জীবনের সবচেয়ে বড়ো সফলতা।

ইসলামি আদবের যে অপরিহার্য উপাদানগুলো প্রতিটি অভিভাকের শেখা এবং সন্তানদের শেখানো উচিত, তা হলো—

অভিবাদন : কীভাবে অন্য একজন মুসলিম বা অমুসলিমকে অভিবাদন জানাবে, কে প্রথমে কাকে সালাম দেবে এবং কীভাবে অন্য একজনের সালামের জবাব দেবে ইত্যাদি বিষয়গুলো সন্তানদের উত্তম উপায়ে শেখানো উচিত।

অনুমতি : অন্য কারও রুমে কিংবা বাড়িতে প্রবেশের ক্ষেত্রে কীভাবে অনুমতি নিতে হবে, তা বাচ্চাদের শেখাতে হবে।

কথা বলা : কীভাবে নিচু স্বরে কথা বলবে এবং বড়োদের ইজ্জতের সাথে সম্বোধন করবে। প্রতিদিন কথা বলার ক্ষেত্রে কোন কোন ভালো শব্দগুলো চয়ন করবে। কথা বলার সময় কোন পরিস্থিতিতে ইনশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ প্রভৃতি ইসলামিক শব্দগুলো চয়ন করবে।

www.nagorikpathagar.org

অঙ্গীকার রক্ষা : যত ছোটো অঙ্গীকারই হোক না কেন, অভিভাবকদের পূরণ করা কর্তব্য। সন্তানদের সাথে তাদের কখনোই এমন ওয়াদা করা উচিত না, যা তারা পূরণ করতে পারবেন না। এমনটি হলে তাদের মিথ্যার আশ্রয় নিতে হবে, যা সন্তানদের মিথ্যার দিকে উৎসাহিত করবে। সন্তানদের শিক্ষা দিতে হবে—কোনো বিষয়ে ওয়াদা করলে তা অবশ্যই পূরণ করতে হয়; তা যতই ছোটো হোক না কেন।

সময়ানুবর্তিতা : অভিভাবকদের উচিত তাদের প্রত্যেকটা কাজ সময়মতো করা; তা হতে পারে সন্তানদের স্কুলে নিয়ে যাওয়া, নামাজ পড়া অথবা কোনো দাওয়াতে অংশগ্রহণ করা। এতে সন্তানরাও পিতা-মাতার সাথে সাথে তাদের কাজগুলো সময়মতো করার উৎসাহ পাবে।

খাওয়া ও পান করা : একটা পরিবারের জন্য এটা খুব ভালো অভ্যাস যে, প্রতি বেলা খাবারের শুরুতে ও শেষে দুআ পাঠ করে খাবে। শুধু হালাল খাবারই নয়; বরং সুসম খাদ্য গ্রহণেও অভ্যস্ত হতে হবে। শিশুদের শেখাতে হবে—তারা কীভাবে খাবে এবং পান করবে। দাঁড়িয়ে বা রাস্তায় হেঁটে হেঁটে খাওয়া পরিহার করতে হবে।

ভালো আচরণ : দৃষ্টি নত রাখা, হাসি মুখে থাকা, হাঁটার ক্ষেত্রে নম্রভাবে হাঁটা; যখন অন্য কোনো ব্যক্তি রুমে থাকে, তখন একজনের সঙ্গে ফিসফিস করে কথা না বলা, কোনো কিছু শেয়ার করা, অন্য কারও বিপদে হাসাহাসি না করাই একজন মুসলিমের চরিত্র। এই বিষয়গুলো সন্তানদের শিক্ষা দিতে হবে।

এর মধ্যে অনেক কিছু আছে, যা খুবই সহজ এবং আমরা আমাদের দৈনন্দিন অভ্যাসে তা খুব সহজেই আয়ত্ত করতে পারি।

পবিত্রতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা : অনেক ইবাদতের প্রথম শর্ত হচ্ছে পবিত্রতা। যেমন : নামাজ, কুরআন স্পর্শ করা ইত্যাদি। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'নিশ্চয় এটা মহিমান্বিত কুরআন, যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে। যারা সম্পূর্ণ পবিত্র, তারা ছাড়া অন্য কেউ তা স্পর্শ করে না।'
> সূরা ওয়াকিয়া : ৭৭-৭৯

আল্লাহ নিজে পবিত্র এবং তিনি শারীরিক ও আধ্যাত্মিক পবিত্রতাকে ভালোবাসেন।

> 'আল্লাহ তওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং তাদেরও, যারা নিজেদের পবিত্র করে।' সূরা ওয়াকিয়া : ৭৭-৭৯

www.nagorikpathagar.org

অজু পবিত্রতা অর্জনের অন্যতম পদ্ধতি। রাসূল ﷺ বলেন—

'সালাত বেহেশতে চাবি আর অজু সালাতের চাবি।' তিরমিজি : ৪

আমরা কুরআন-হাদিস থেকে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পবিত্রতার গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে পারি, যা ঈমানের বড়ো একটি অংশ এবং এটা একজন মুসলমানের দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত করে।

শারীরিক পবিত্রতার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি সর্বদা নজর দিতে হবে—

- গোসল শারীরিক পবিত্রতা অর্জনের প্রধান মাধ্যম। গোসল ফরজের কারণ এবং ফরজ গোসলের পদ্ধতি বাচ্চারা একটু বড়ো হওয়ার সাথে সাথেই শেখাতে হবে। বাচ্চাদের যদি শুক্রবার সকালে গোসল দেওয়া হয়, তবে তা অনেক ভালো। এতে শুধু কীভাবে গোসল করতে হয় তা-ই শেখাবে না; বরং জুমার দিনের গুরুত্ব সম্পর্কে তারা জানতে পারবে।
- অজু পবিত্রতা অর্জনের দ্বিতীয় পদ্ধতি। সর্বদা অজু অবস্থায় থাকা খুবই ফজিলতপূর্ণ একটি কাজ। এটা দৈনন্দিন কাজের ক্ষেত্রে মনে আধ্যাত্মিক শক্তি জোগায়। জীবনের শুরুতেই সন্তানদের অজুর নিয়ম শিক্ষা এবং অজু অবস্থায় থাকতে উৎসাহ দিতে হবে। এক্ষেত্রে পানির পর্যাপ্ত ব্যবহার ও অপচয় রোধে তাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়াও জরুরি।
- হাতের নখ থাকবে ছোটো ও পরিষ্কার। ছেলে বাচ্চাদের চুল ছোটো করে কাটাতে হবে। আর ছেলেমেয়ে সবার চুল পরিষ্কার রাখার শিক্ষা দিতে হবে। নিয়মিত ব্রাশ করার অভ্যাস গড়তে হবে। বাচ্চাদের সব সময় পরিষ্কার কাপড় পরানো অভিবাকদের কর্তব্য।

বাড়ির পরিবেশ বাচ্চাদের জীবনে প্রভাব বিস্তার করে। তাই বাড়ির পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুশৃঙ্খল রাখতে হবে। যে বাড়িতে খাবারের জিনিস নিচে এলোমেলোভাবে পড়ে থাকে, ময়লা জামা-কাপড়ের বাক্স জায়গামতো থাকে না এবং কাগজপত্র যেখানে-সেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে, সে বাড়ি কখনো সুন্দরভাবে বসবাস কিংবা ইবাদত-বন্দেগির জন্য যথোপযুক্ত নয়। এটা বলার সুযোগ নেই, বাড়িঘরের সবকিছু গুছিয়ে রাখা সব সময় মায়ের দায়িত্ব। একটি পরিবারকে গুছিয়ে রাখা পরিবারের সকল সদস্যের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

www.nagorikpathagar.org

লজ্জা : লজ্জা ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। লজ্জা মানুষের একটি সহজাত বৈশিষ্ট্যও বটে। সৃষ্টির প্রথম মানুষদ্বয় নিজেদের শরীর আবৃত করার মাধ্যমে তাঁদের সহজাত প্রতিক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ করেছিলেন। নিচের হাদিসগুলোতে লজ্জা সম্পর্কে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে—

> 'ঈমানের ৭০টিরও বেশি শাখা রয়েছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে লজ্জা।' সহিহ বুখারি
>
> 'অশ্লীলতা সবকিছুকে বিকৃত করে, আর হায়া বা লজ্জা সবকিছুকে আকর্ষণ করে।' তিরমিজি

লজ্জাহীনতা সমাজে খুব দ্রুত যৌনাচার ছড়ায়। তাই আমাদের উচিত সন্তানদের ঘর থেকেই লজ্জা বা হায়া সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া। কিছু পন্থা আছে, যেগুলোর মাধ্যমে আমরা সন্তানদের হায়া বা লজ্জাবোধ শেখাতে পারি—

- ১০ বছর বয়সেই সন্তানদের বিছানা আলাদা করে দিন। আর যৌবনে পা দিলেই ছেলে ও মেয়ের জন্য আলাদা বেডরুমের ব্যবস্থা করতে হবে।
- পরিবারের সকল সদস্যকে আরেকজনের রুমে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে অনুমতি নিয়ে প্রবেশের শিক্ষা দিতে হবে।
- পরিবারের সদস্যদের উচিত একে অপরের সামনে কাপড় পরিধান কিংবা খোলা থেকে বিরত থাকা। পরিবারের সকলের জন্য পোশাক পরিধানের নীতিমালা প্রয়োজন। পরিবারের সবাই যদি মাহরাম হয়, তাদের ক্ষেত্রে পর্দার বিধান কার্যকর নয়। তবে সবাই যেন নিজের সতর ঢেকে পোশাক পরে—এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।
- সাত বছরের ওপরের শিশুরা যেন একসঙ্গে গোসল না করে, যদিও তারা সমলিঙ্গের হয়।
- কারও সাথে অশালীন আলোচনা থেকে যেন বিরত থাকে। কোনো ধরনের অশালীন মুভি কিংবা প্রোগ্রাম দেখায় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে হবে। বর্তমান সময়ে সকল ভাষার মিউজিকের বিশাল এক অংশ শালীনতা থেকে বহু দূরে। কোনো মুসলিম পরিবারে যেন এই ধরনের মিউজিকের অনুমতি না থাকে, সেই দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

শ্রবণের নীতিমালা

শিশুরা কথা বলার সময় অপ্রয়োজনীয়ভাবে কথা পুনরাবৃত্তি করে। মাঝেমধ্যে তারা এমন কথা বলে, যার পরিষ্কার কোনো অর্থ নেই। এভাবেই তারা অন্যদের সাথে মেলামেশা করতে শেখে। তাদের কথা শোনার ক্ষেত্রে পিতা-মাতার অধিক ধৈর্যের প্রয়োজন। নিঃশর্তভাবে কারও কোনো কিছু শ্রবণ করার দক্ষতা এক বড়ো গুণ। মানুষের মধ্যে অধিক বলার এবং কম শোনার প্রবণতা বেশি। তবে আমাদের দুই কান এবং এক মুখের পেছনের প্রজ্ঞাকে আচরণের মাধ্যমে প্রতিফলিত করতে হবে।

সক্রিয়ভাবে শ্রবণ করার অর্থ হলো—কারও কথা পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে শোনা এবং তা বোঝার চেষ্টা করা। আপনি যখন কারও কথা সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারবেন, তখন সে অনুযায়ী কাজ করা আপনার জন্য সহজ হয়ে যাবে। অবুঝ সন্তানরা কোনো ধরনের সহমর্মিতা চাচ্ছে কি না, কাজের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের সাহায্য চাচ্ছে কি না, কারও আলিঙ্গন প্রত্যাশা করছে কি না অথবা কথা বলার জন্য কাউকে পাশে চাচ্ছে কি না, সেদিকে মাতা-পিতাকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে।

পিতা-মাতা যখন সন্তানদের কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে, তখন তাদের মধ্যে এই ধরনের আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়—পিতা-মাতার কাছে তাদের কথার কিছুটা হলেও মূল্য রয়েছে। এটি তাদের পিতা-মাতার কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করারও শিক্ষা প্রদান করে। মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ। তিনি যখন কারও কথা শুনতেন, তখন পূর্ণ মনোযোগ সহকারে শুনতেন। তিনি বক্তার দিকে তাকিয়ে কথা শুনতেন এবং নিজে শরীরকে তাঁর দিক ফিরিয়ে নিতেন। এটি প্রকৃতপক্ষে শিশুদের অন্যদের মূল্যায়ন করার প্রশিক্ষণ দেয়। পাশাপাশি তা তাদের চারপাশের মানুষের সাথে আরও বেশি করে মেলামেশায় অভ্যস্ত করে তোলে।

উত্তর দেওয়ার সময় পিতা-মাতার কর্তব্য হলো—সন্তানদের সাথে সুন্দর উপায়ে অর্থপূর্ণ কথা বলা, যাতে তারা তা বুঝতে পারে। রাসূল ﷺ একজন মনোযোগী শ্রোতা এবং উত্তম বক্তা ছিলেন।

আয়িশা رضي الله عنها বর্ণনা করেন—

> 'রাসূল ﷺ এমন পরিষ্কারভাবে কথা বলতেন, যাতে শ্রোতারা তাঁর কথা পুরোপুরি বুঝতে পারে।' আবু দাউদ

www.nagorikpathagar.org

ওই সমস্ত পরিবার সুখী হয় এবং কম হতাশায় ভোগে, যেখানে সবাই সবার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে। কারণ, তখন পরিবারের সবার মধ্যে এই ধারণা তৈরি হয়, তারা প্রত্যেকে নিজেদের কথাগুলো উপস্থাপনা করতে পারে।

সংযম

পিতা-মাতার দায়িত্ব হচ্ছে শিশুদের সাথে শিশুদের উপযোগী আচরণ করা এবং তাদের সামর্থ্যের বাইরে অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেওয়া থেকে বিরত থাকা। আমাদের কখনো তাৎক্ষণিক ফলাফল আশা করা ঠিক নয়। কারণ, সন্তানদের লালন-পালন এক দীর্ঘস্থায়ী বিনিয়োগ। আমরা আল্লাহর ইচ্ছায় আখিরাতে যার ফলাফল প্রত্যাশা করি।

> 'আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ওপর সাধ্যাতীত বোঝা চাপিয়ে দেন না।' সূরা বাকারা : ২৮৬

আমাদের মুসলিমদের জীবনযাপনে অর্থ, সময় ও শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় করার ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে।

> 'নিজের হাত গলায় বেঁধে রেখ না এবং তাকে একেবারে খোলাও ছেড়ে দিয়ো না, তাহলে তুমি নিন্দিত ও অক্ষম হয়ে যাবে।' সূরা বনি ইসরাইল : ২৯

> 'তারা যখন ব্যয় করে, তখন অযথা ব্যয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না; বরং উভয় প্রান্তিকের মাঝামাঝি তাদের ব্যয় ভারসাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে।' সূরা ফুরকান : ৬৭

রাসূল ﷺ বলেন—

> 'উত্তম আচরণ, স্থিরতা ও মধ্যমপন্থা নবুয়তের ২৫ ভাগের ২৪ ভাগ।' আবু দাউদ ও তিরমিজি

> 'রাসূল ﷺ-কে যখন দুটি বিষয়ের যেকোনো একটি বিষয় পছন্দ করার কথা বলা হতো, তখন তিনি তুলনামূলক সহজটিকে বাছাই করে নিতেন; যতক্ষণ না সেটি অবৈধ কোনো কিছু হতো। নিষিদ্ধ কিছু হলে তিনি তা গ্রহণ করতেন না।' বুখারি

www.nagorikpathagar.org

শিশুদের কাছে স্কুলের প্রত্যেক বিষয়ে ভালো করার কিংবা দ্বীনের সকল বিষয়ের অনুসরণের প্রত্যাশা করা বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। এগুলো তাদের সঠিক উপায়ে গড়ে উঠার ক্ষেত্রে সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। তারা সবেমাত্র গড়ে উঠছে। তাদের কাছ থেকে সর্বোচ্চ ফলাফল বের করে আনা আমাদের দায়িত্ব, কিন্তু তাদের ওপর উচ্চাকাঙ্ক্ষার বোঝা চাপিয়ে দিয়ে তাদের মেধাকে নষ্ট করা আমাদের কাজ নয়। এটি শুধু তাদের চেতনাকেই নষ্ট করে না; অভিভাবকদের সাথে সম্পর্ককেও নষ্ট করে। মধ্যমপন্থা অবলম্বন যেকোনো কাজকেই সহজ করে দেয়।

কঠিন আচরণের মোকাবিলা

পরিপূর্ণ ইসলামিক পরিবেশে বেড়ে উঠা সত্ত্বেও পুরো সমাজের সাথে মানিয়ে নিতে শিশুদের অনেক সংগ্রাম করতে হয়। কিশোর বয়সে ব্যবহারিক বা আচরণগত ভারসাম্যহীন পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠলেও নিজ পরিবারে কিছু আচরণগত সমস্যা দেখা দেয়। যে ধরনের সমস্যাই হোক না কেন, সন্তানদের সাথে শাসকসুলভ আচরণ থেকে বিরত থাকতে হবে। মানসিক বা অন্যান্য কারণে তাদের মধ্যে আচরণগত সমস্যা দেখা দিতে পারে। এর ওপর ভিত্তি করে পিতা-মাতার উচিত সমস্যাগুলোকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা। যেমন :

- সমস্যার আধিক্য
- মাত্রা
- সময়কাল
- জেদ

সন্তানের আচরণগত সমস্যা কীভাবে মোকাবিলা করব—তা মূলত নির্ভর করে পরিস্থিতি, সন্তান-অভিভাবক সম্পর্ক এবং সন্তানের বুদ্ধিবৃত্তিক পরিপক্বতার ওপর। কোনো সমস্যা দেখা দেওয়ার পর পিতা-মাতাকে অবশ্যই রাগান্বিত হওয়া, চিৎকার-চ্যাঁচামেচি এবং সন্তানদের অপবাদ দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। নিজেদের সমস্যা উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে শিশুদের সাহায্য করতে হবে। যেকোনো অবস্থায় তাদের অসম্মান করা কিংবা আত্মসম্মানহানি করা থেকে বিরত থাকতে হবে। আত্মবিশ্বাসী সন্তানরা তাদের ভুলের ফলাফল সম্পর্কে সম্যক অবগত থাকে। তারা এই সমস্যা কাটিয়ে উঠে নিজেদের পুনর্গঠনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়।

www.nagorikpathagar.org

কোনো শিশুর চ্যালেঞ্জিং আচরণগত সমস্যা কাটিয়ে উঠার জন্য অতিরিক্ত সহনশীলতা প্রয়োজন। কারণ, প্রত্যেক পিতা-মাতারই নিজের সন্তানের ব্যাপারে অনেক বেশি প্রত্যাশা থাকে। সন্তানদের আচরণগত কোনো সমস্যা দেখলে তারা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু আমরা প্রায় ভুলে যাই—'মানুষ মাত্রই ভুল করে।' আমরা আমাদের প্রিয় সন্তানকে সবকিছুতে স্বয়ংসম্পূর্ণ দেখতে চাই, কিন্তু আমরা নিজেরাই সর্বোচ্চ মান রক্ষা করতে ব্যর্থ! এই ক্ষেত্রে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ এবং মধ্যমপন্থা অবলম্বন ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনে।

সন্তানদের মাঝে কোনো ধরনের অপ্রত্যাশিত আচরণগত সমস্যা দেখা দিলে নিম্নোক্ত ছয়টি বিষয় লক্ষ রাখা উচিত—

- **শান্ত থাকা** : কখনো চিৎকার-চ্যাঁচামেচি করবেন না।
- **আত্মবিশ্বাস** : অভিভাবক হিসেবে আপনার মাঝে এই সমস্ত বিষয় মোকাবিলার সামর্থ্য রয়েছে—এই বিশ্বাস রাখুন।
- **সংগতি** : সন্তানরা যেন গ্রহণযোগ্য আচরণে অভ্যস্ত হওয়ার উপায় সম্পর্কে পরিষ্কার ও সংগতিপূর্ণ বার্তা পায়।
- **স্বচ্ছতা** : সন্তানদের ন্যায়-অন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের আবেগকে স্থান দেবেন না। ন্যায়ের ব্যাপারে স্বচ্ছ ও আপসহীন থাকুন।
- **নিয়ন্ত্রণ** : কখনো রাগান্বিত হবেন না কিংবা জবরদস্তি করবেন না।
- **যোগাযোগ** : সন্তানের আচরণগত সমস্যা মোকাবিলার ক্ষেত্রে আপনার জীবনসঙ্গী ও সন্তানের সঙ্গে আলোচনার পথ খোলা রাখুন।

সংস্কৃতি ও মাতৃভাষা

ইসলামি পারিবারিক পরিবেশে সংস্কৃতি ও মাতৃভাষার প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক। নিঃসন্দেহে ইসলামি নীতিমালা মুসলিম পরিবার পরিচালনার সঠিক দিক-নির্দেশনা প্রদান করে। সমাজ যতই সেকেলে বলুক না কেন, ইসলামে নিষিদ্ধ কোনো কিছুই মুসলিম পরিবারের জন্য সংগত নয়। মানুষের মাঝে পোশাক, ভাষা, খাদ্য ও সামাজিক প্রথার বৈচিত্র্যতাই মুসলিম উম্মাহর সৌন্দর্য। মৌলিক ইসলামি অনুশাসনই আমাদের বন্ধনকে মজবুত করে।

www.nagorikpathagar.org

একটি ইসলামিক পারিবারিক পরিবেশে পিতা-মাতার নিজস্ব সংস্কৃতি ও ভাষার চর্চায় কোনো সমস্যা নেই। নিজস্ব সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান মেনে চলাতে ইসলাম কোনো আপত্তি তোলে না, যতক্ষণ না তা ইসলামি অনুশাসনের বাইরে যায়; বরং এটি বহুমাত্রিক সমাজের অপরিহার্য অঙ্গ। এটি এমন এক বৈচিত্র্যময় পরিবেশ তৈরি করে, যা মানবজাতিকে পূর্ণতা দেয়।

কুরআন বোঝার ক্ষেত্রে আরবি ভাষার জ্ঞান অপরিহার্য। প্রত্যেক শিশুরই পবিত্র কুরআন বোঝার জন্য আরবি ভাষার ওপর প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করা উচিত। সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে মাতৃভাষার অনেক ভূমিকা রয়েছে। আত্মীয়স্বজন এবং বড়োদের সাথে মেলামেশার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার বিকল্প নেই। মাতৃভাষার মাধ্যমে নৃগোষ্ঠীর মাঝে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো সহজ হয়। মনে রাখতে হবে, মুসলিম সমাজের প্রত্যেকটি ভাষাই সম্মানিত, ঐতিহাসিভাবে সমৃদ্ধ। ভাষা মূলত ইসলামি বার্তাই বহন করে।

হালাল ও হারাম

আপনার বাড়িটা কত বড়ো বা আপনার সম্পত্তির পরিমাণ কত—এটা বড়ো প্রশ্ন নয়; বরং যা কিছু ভোগ করা হচ্ছে, তা হালাল কি না—সেটাই বড়ো প্রশ্ন। যখন একটি পরিবার হালালের ওপর ভিত্তি করে চলবে, তখনই শুধু তারা মহান আল্লাহর রহমতের অধিকারী হবে।

আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন—

> ‘আল্লাহ পবিত্র এবং তিনি পবিত্র জিনিসই গ্রহণ করেন।’
> মুসনাদে আহমাদ

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন—

> ‘ওহে আমার বার্তাবাহকরা! তোমরা হালাল রিজিক গ্রহণ করো, যা তোমাদের রব তোমাদের জন্য হালাল করেছেন (হালাল প্রাণীর গোশত, দুধ, তেল, শাকসবজি ও ফলমূল) এবং সৎকর্ম করো। তোমরা যা করো, তার ব্যাপারে আমি জ্ঞাত।’ সূরা মুমিনুন : ৫১

অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন—

> ‘ওহে আমার বিশ্বাসীরা! আমি তোমাদের যে হালাল রিজিক দিয়েছি, তা তোমরা খাও এবং পান করো।’ সূরা বাকারা : ১৭২

www.nagorikpathagar.org

মুসলিম চরিত্র গঠন

'হে আমার পুত্র! আল্লাহর সাথে শিরক করো না। নিশ্চয়ই শিরক একটি বড়ো জুলুম। হে আমার পুত্র! সালাত কায়েম করো, ভালো কাজের আদেশ করো, মন্দ কাজ থেকে বাধা প্রদান করো এবং বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করো। নিশ্চয়ই এটি মজবুত সংকল্পের কাজ। দম্ভ করে মানুষদের অবজ্ঞা করবে না, জমিনে ঔদ্ধত্যের সাথে চলাফেরা করবে না। কারণ, আল্লাহ দাম্ভিকদের পছন্দ করেন না। চলাফেরায় মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবে এবং তোমার কণ্ঠস্বর রাখবে সংযত। নিশ্চয়ই সবচেয়ে নিকৃষ্ট আওয়াজ হলো গাধার ধ্বনি।'—সূরা লোকমান : ১৩, ১৭-১৯

ইসলামি শিক্ষা; সামগ্রিক পদক্ষেপ

তরুণ প্রজন্মকে শুধু নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক কিংবা চিকিৎসাবিষয়ক শিক্ষা প্রদানই যথেষ্ট নয়; তাদের ইসলামি শিক্ষায়ও শিক্ষিত করতে হবে। শ্রেণিকক্ষগুলোতে এখন নাগরিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কেও শিক্ষা প্রদান করা হয়। যেমন : স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার, পরমত সহিষ্ণুতা ও সমতা। এ সকল বিষয় শিশুদের বৈষয়িক উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা দেয়। কোনো শিক্ষাব্যবস্থা যদি পৃথিবীতে আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব-কর্তব্যের বিষয়টি এড়িয়ে যায়, তাহলে এই সকল বৈষয়িক জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে কোনো কাজেই আসবে না।

সন্তানের জন্য আর্টস ও বিজ্ঞান সম্পর্কিত শিক্ষা অর্জন অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। তবে এই সমস্ত জ্ঞান যেন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান এবং অনুশীলনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে, সেই দিকে খেয়াল রাখতে হবে। আর এই ধরনের ভিত্তি তৈরি করতে হবে তাদের জীবনের শুরু থেকেই। বাস্তবিক অর্থে এর মানে হচ্ছে—

www.nagorikpathagar.org

একজন ব্যক্তি ইসলামে নিষিদ্ধ নয়—এমন যেকোনো বিষয়ের ওপর জ্ঞান অর্জন এবং যেকোনো পেশাকে নিজের ক্যারিয়ার হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে। তবে এই ক্ষেত্রে তাদের অন্তরে সর্বশক্তিমান আল্লাহর কথা স্মরণ রাখেত হবে; যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন এবং যাঁর নিকট আবারও ফিরে যেতে হবে। এই ধরনের বিশ্বাস সর্বক্ষেত্রে এমন এক নিয়ামকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, যা হালাল অবলম্বনে উদ্‌বুদ্ধ করে; যাকে সারাজীবন অন্তরে ধারণ করতে হয়। এটি এমন একধরনের নির্দেশনা, যা তাদের মানসিক স্থিরতা, আত্মমর্যাদাবোধ, ও দৃঢ় প্রত্যয় প্রদান করে। এটি তাদের কখনো সৎ পথ থেকে বিচ্যুত হতে দেয় না। এর ফলে তারা অন্য মানুষদের প্রতি দায়িত্ববান হয় এবং আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতার বিষয়টি সর্বদা স্মরণে রাখে; যেখানে সমাজের অন্যরা প্রতিনিয়তই ক্রমবর্ধমান আশা-আকাঙ্ক্ষা ও নিজের খায়েশ পূরণ করার কাজে ব্যস্ত থাকে। ইসলামের পরিমিতিবোধ ও স্বচ্ছ নিয়মকানুন আনুযায়ী শিক্ষা অর্জনকারী তরুণরা দুনিয়া ও আখিরাতে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করতে পারে।

ইসলামি ইতিহাসের শিক্ষার সোনালি যুগে মুসলিম শাসকরা কলা, পদার্থবিদ্যা, জীববিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও ধর্মতত্ত্বসহ জ্ঞানের সকল শাখা-প্রশাখার উৎকর্ষ সাধনের প্রতি সর্বদা মনোযোগী ছিলেন। দুনিয়াবি ও ইসলামি উভয় ধরনের জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষার কারণে ইসলামি সমাজগুলো অন্য সকল সমাজব্যবস্থা থেকে সমৃদ্ধ ছিল। ইউরোপীয় শিক্ষাবিদরা জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে প্রতিনিয়িতই ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে আগমন করত। তখন মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় সমাজব্যবস্থা ছিল অন্ধকারে নিমজ্জিত। পরবর্তী সময়ে ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধিপূর্বক গ্রহণ করার ফলে ইউরোপীয় সমাজে উৎকর্ষ সাধিত হয়, যা একপর্যায়ে ইউরোপীয় রেনেসাঁসে রূপ নেয়। যে সমস্ত সমাজ এই উভয় ধরনের জ্ঞান অর্জনে ভারসাম্য রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়, সে সমস্ত সমাজ খুব দ্রুতই ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়।

ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থা কেবল কুরআন-হাদিস, ফিকহ ও শরিয়াহর গভীর জ্ঞান অর্জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং জাগতিক সকল ধরনের জ্ঞান অর্জনই ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্গত। আল্লাহর ইবাদত, মানুষের সেবা, সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখা এবং নির্দিষ্টসংখ্যক ব্যক্তিগত অর্জন ইসলামি শিক্ষার মূল লক্ষ্য। এর ফলে আর্থিক উন্নতি ও মানসিক প্রশান্তি দুটোই অর্জিত হয়। মুসলিম বিশেষজ্ঞদের মাঝে এই ব্যাপারে ঐকমত্য হয়েছে যে, নিম্নোক্ত বিষয়ের সঙ্গে মানুষের পরিচয় করে দেওয়াই ইসলামি শিক্ষার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত।

www.nagorikpathagar.org

- আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত অধিকার (হুকুকুল্লাহ)।
- মানুষের সাথে সম্পর্কিত অধিকার (হুকুকুল ইবাদ)। নিজের পরিবার, একান্নবর্তী পরিবার, সমাজ, মেহমান, ভ্রমণকারী, গরিব, মিসকিন, বিধবা, সহকর্মী, মুসলিম, অমুসলিম সকলের সাথে আমাদের আচার-আচরণ, দায়িত্ববোধ ও লেনদেন হুকুকুল ইবাদ-এর অন্তর্ভুক্ত।
- অন্যান্য সৃষ্টির সাথে সম্পর্কিত অধিকার। যেমন : পশু-পাখি ও পরিবেশের সাথে সম্পর্কিত অধিকারসমূহ।
- বিশ্বের সাথে আমাদের সম্পর্ক জানা এবং পৃথিবীর সম্পদসমূহের ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ও শারীরিক নিয়মাবলি সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া।
- আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টিশীল প্রজ্ঞার প্রশংসা জ্ঞাপন এবং তাঁর সৃষ্টি নিয়ে গভীর অধ্যয়ন।

পিতা-মাতা হিসেবে আমাদের সন্তানদের এই সমস্ত বিষয়ে কীভাবে অভ্যস্ত করতে পারি, তা নিয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে।

মুসলিম চরিত্র গঠনে পিতা-মাতার কর্তব্য

এটা পরিষ্কার, সন্তানদের শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা পুরোপুরি স্কুলের ওপর নির্ভর করি না। সুতরাং তারা যে সময় স্কুলে থাকে না, আমাদের উচিত সে সময় তাদের শিক্ষার বাকি অংশ পূর্ণ করা।

মুসলিম চরিত্র গঠনের লক্ষ্যে পিতা-মাতা ও সন্তানের জন্য প্রতিনিয়ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কার্যকর প্রশিক্ষণের জন্য চমৎকার মানবীয় যোগ্যতাসম্পন্ন দক্ষ প্রশিক্ষক প্রয়োজন, যিনি আস্থা ও আত্মবিশ্বাস অর্জনের ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান করতে পারেন। এজন্যই বলা হয়ে থাকে—একটি শিশুকে গড়ে তোলার জন্য বিশাল একটি গ্রামের প্রয়োজন। যে শিশু অনুকরণীয় মানুষের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পায়, সে যেকোনো জায়গায় নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে, যেকোনো স্থানে পৌঁছতে পারে। কারণ, সে তাদের থেকে সকল ধরনের নির্দেশনা পেয়ে থাকে।

প্রথম পদক্ষেপে পিতা-মাতা হিসেবে আমাদের জানতে হবে, কী কী অবলম্বন আমাদের রয়েছে। সন্তানদের পেছনে আমরা কতটুকু সময় দিতে পারব।

www.nagorikpathagar.org

তাদের যথাযথ উপায়ে গড়ে তোলার জন্য কতটুকু জ্ঞান রাখি ইত্যাদি। সন্তানদের প্রতিপালনের জন্য বাইরের অনেক কিছুই প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ—পরিবার, সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ, স্থানীয় মসজিদ, ছুটির সময় ইত্যাদি।

সাধারণত, পিতা-মাতাই সন্তানদের প্রথম শিক্ষক, রোলমডেল ও প্রশিক্ষক। সন্তানদের প্রতি পিতা-মাতা বিশেষ করে মায়েদের বিশেষ এক আকর্ষণ রয়েছে। এই আকর্ষণ পিতা-মাতা ছাড়া অন্য কেউ অনুভব করতে পারে না। জন্মের পর থেকেই সন্তানদের প্রতি পিতা-মাতার এই ধরনের আকর্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মূলত, এর ওপরই একটি সফল মুসলিম প্রজন্মের বেড়ে উঠা নির্ভর করে। ভালোবাসা ও দয়া এমন বিষয়, যার মাধ্যমে ভয় ও রূঢ়তাকে কাটিয়ে সন্তানদের সবচেয়ে কার্যকর উপায়ে শিক্ষা প্রদান করা যায়।

নিচে কিছু পরীক্ষিত প্রশিক্ষণ পদ্ধতি তুলে ধরা হলো, যা মুসলিম চরিত্র গঠনে নিজ ঘরে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

উপদেশ, শাসন ও সতর্কীকরণ : পৃথিবীর বুকে যত নবি-রাসূল ও প্রজ্ঞাবান মানুষ আগমন করেছেন, তাঁদের সবাই নিজ সম্প্রদায়ের প্রশিক্ষণের জন্য এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। পবিত্র কুরআনে পুত্রকে উদ্দেশ্য করে লোকমান ﷺ-এর চমৎকার উপদেশ বর্ণিত রয়েছে। কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনের জন্য উপযুক্ত সময়ে যথাযথ ও সংগত উপায়ে সন্তানদের উপদেশ দিতে হবে। রাসূল ﷺ মানুষের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক বিষয়ে এমনভাবে উপদেশ দিতেন, যাতে তাদের অন্তরে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব পড়ে। উপদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে তিনি কখনো কঠোরতা অবলম্বন করতেন না।

উপমা দেওয়া এবং গল্প বলা : মানুষদের শিক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যে পবিত্র কুরআনে পূর্বের জাতিসমূহের ঘটনা অত্যন্ত সুন্দর উপায়ে বর্ণিত হয়েছে, যাতে মানুষ সতর্ক এবং শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। একটি 'উত্তম কথা একটি উত্তম গাছের ন্যায়', অপরপক্ষে 'খারাপ বা মন্দ কথা একটি ক্ষতিকর বৃক্ষের ন্যায়।' এই উপমাটি পবিত্র কুরআনে খুব সুন্দরভাবে বর্ণিত রয়েছে। ঈসা ﷺ ও মুহাম্মাদ ﷺ সাথিদের নিকট কিছু বর্ণনা করার ক্ষেত্রে উত্তম উপমা প্রদান করতেন। রাসূল ﷺ মানুষের অর্জিত জ্ঞান ব্যবহারে সক্ষমতাকে বৃষ্টির পর মাটির প্রতিক্রিয়ার সাথে তুলনা করেছেন। মানুষের অন্তরে উপমা ও গল্পের বিরাট প্রভাব রয়েছে। এগুলো মানুষকে জীবনের প্রকৃত অর্থ বুঝতে সাহায্য করে।

www.nagorikpathagar.org

পিতা-মাতার উচিত সন্তানদের সামনে বাস্তব ঘটনার বর্ণনা ও উপমা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রধান অনুঘটক হিসেবে কাজ করা। প্রত্যেক সংস্কৃতিতেই ঘুমোনোর সময় শিশুদের গল্প বলার কার্যকর প্রভাব রয়েছে।

অনুকরণীয় আদর্শ : রাসূল ﷺ মানবজাতির নিকট অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন (সূরা আহজাব : ২১)। তিনি অনেক কাজে সাহাবিদের সাথে সরাসরি অংশগ্রহণ করতেন। যেমন : মসজিদে নববি নির্মাণ এবং খন্দকের যুদ্ধে পরিখা খননসহ আরও অনেক কাজে তিনি সাহাবায়ে কেরামদের সাথে সরাসরি কাজে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি সর্বোত্তম পিতা, সঙ্গী ও সহযোদ্ধার মূর্ত প্রতীক ছিলেন। শিশুদের কাজকর্ম ও আচার-আচরণে রোলমডেলের বিশাল ভূমিকা রয়েছে। পিতা-মাতাকে সন্তানদের জন্য যোগ্য রোলমডেল হিসেবে ভূমিকা পালন করতে হবে।

পুরস্কার ও শাসন : আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী ও সৎ কর্মশীল ব্যক্তিদের পুরস্কারস্বরূপ জান্নাত সৃষ্টি করেছেন। অন্যদিকে জাহান্নাম সৃষ্টি করছেন, তাঁর প্রতি অবিশ্বাস পোষণকারী এবং অসৎ কর্মশীলদের শাস্তির জন্য। রাসূল ﷺ সাহাবিদের উত্তম কাজের জন্য প্রশংসা এবং তাঁদের অগ্রহণযোগ্য আচরণের জন্য মাঝেমধ্যে শাসন করতেন। এই ক্ষেত্রে তিনজন সাহাবির তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে উদাসীনতা প্রদর্শনের শাস্তি উল্লেখযোগ্য। শিশুদের জীবনের বাস্তবতা বোঝানোর ক্ষেত্রে পুরস্কার ও শাসন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সন্তানদের ভালোবাসার মাধ্যমে একমাত্র যৌক্তিক কারণেই শাস্তি প্রদান করতে হবে। পাশাপাশি তাদের এটাও জানিয়ে রাখতে হবে, অগ্রহণযোগ্য আচরণের জন্যই তাদের শাসন করা হচ্ছে। তাদের প্রতি পিতা-মাতার নিঃশর্ত ভালোবাসার কথাও তাদের অন্তরে উপলব্ধি করাতে হবে।

প্রতিদিনের রুটিনে নিম্নোক্ত কাজগুলোও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে—

- প্রাত্যহিক কাজে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল ﷺ প্রদর্শিত বিধানের অনুসরণ করুন, যাতে সন্তানরাও এর সাথে পরিচিত হতে পারে। এর মধ্যে ইসলামের মৌলিক বিধিবিধান, আল্লাহর স্মরণ, বিভিন্ন সময়ে রাসূল ﷺ কর্তৃক নির্দেশিত দুআ ও ক্ষমা প্রার্থনা অন্তর্ভুক্ত।
- যথাসময়ে সালাত আদায় করুন। এই ক্ষেত্রে নামাজের নির্দিষ্ট সময়ে মোবাইলে আজানের টিউনকে অ্যালার্ম হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে,

www.nagorikpathagar.org

যা দিনে পাঁচবার সালাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। মসজিদ যদি বাসার কাছেই অবস্থিত হয়, সেক্ষেত্রে পিতা-মাতার কর্তব্য হচ্ছে—নিজ সন্তানকে প্রতিনিয়ত জামাতের সাথে সালাত আদায় করতে নিয়ে যাওয়া।

- প্রাসঙ্গিক কোনো বিষয় আলোচনার ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা ও দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করুন, যা মুসলমানদের জীবনবিধানের মূল উৎস। প্রত্যেক ঘরে কুরআনের একাধিক কপি ও প্রসিদ্ধ হাদিসগ্রন্থ থাকা উচিত। এই সকল গ্রন্থসমূহ দৈনন্দিন সমস্যা সমাধানে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।
- নিজ ঘরে প্রত্যেক দিন কুরআন তিলাওয়াতের নিয়ম জারি রাখুন, যাতে শিশুরা এই অভ্যাসটি অর্জন করতে পারে। সিডি কিংবা মোবাইলে কুরআন তিলাওয়াত রাখতে পারেন। অবসর সময় কিংবা গাড়িতে কাটানো সময়গুলো কুরআন শ্রবণের মাধ্যমে কাজে লাগানো যেতে পারে।
- আল্লাহর সৃষ্টির অপার রহস্য সম্পর্কে গভীর চিন্তা করতে সন্তানদের উৎসাহিত করুন। তাদের বোঝান, আমাদের পুরো অস্তিত্ব এবং চারিদিকের মনোরম সৃষ্টি আল্লাহর অস্তিত্বের স্বাক্ষর বহন করে। প্রকৃতিতে ঋতুর পরিবর্তন, প্রস্ফুটিত ফুলসহ আল্লাহর সকল সৃষ্টির পেছনে আল্লাহর মহিমা তুলে ধরুন।
- প্র্যাক্টিসিং মুসলিম পরিবারের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক তৈরি করুন, যাতে সন্তানরা তাদের উপযুক্ত বন্ধু সহজেই বাছাই করতে পারে।
- নিকটাত্মীয়দের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক বজায় রাখুন। এটি শিশুদের মাঝে সমাজবদ্ধ হওয়ার দক্ষতা এবং অন্যদের সাহায্য করার আগ্রহ তৈরি করে। মানবসেবায় এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি নবিদের সুন্নাহ, যা এক অনন্য সমাজ গঠনের অপরিহার্য উপাদান।
- নিয়মিত পারিবারিক বৈঠকের আয়োজন করুন। এটি পরিবারের বন্ধনকে আরও দৃঢ় এবং ইসলামি হুকুম-আহকাম সম্পর্কিত জ্ঞান আহরণের আগ্রহ বৃদ্ধি করে। রাসূল ﷺ ও সন্তানদের সঙ্গে পারিবারিক বিষয়ে আলোচনা করতেন। অভিভাবকরা পরিবারের বিভিন্ন বিষয়ে সন্তানদের থেকে পরামর্শ নিতে পারেন। এতে তারা পারিবারিক বিষয়ে আরও আগ্রহী হয়।
- সহোদরদের মাঝে কুইজ সন্ধ্যা, মুখস্থকরণ প্রতিযোগিতার মতো বিভিন্ন জ্ঞানভিত্তিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে। ইসলাম জ্ঞান ও তাকওয়াভিত্তিক প্রতিযোগিতার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করে। এই সমস্ত প্রতিযোগিতা তরুণদের নেতৃত্বগুণের বিকাশ ঘটায়।

www.nagorikpathagar.org

- সন্তানদের মুসলিম বিশ্বের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও সমসাময়িক বিশ্ব সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনে উৎসাহিত করুন। এটি তাদের মধ্যে মুসলিম উম্মাহর বুদ্ধিবৃত্তিক, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা সম্ভাবনা সম্পর্কে উপলব্ধি তৈরি করে। তারা এই সকল বিষয়ে কল্যাণ অর্জনে ভূমিকা রাখতে আগ্রহী হয়। নিজ ঘরে প্রতিনিয়ত সংবাদপত্র, টেলিভিশন ও সমসাময়িক জ্ঞান অর্জনের বিভিন্ন সামগ্রী রাখুন। এতে সন্তানরা বর্তমান বিশ্বের চলমান ঘটনাবলি সম্পর্কে অবগত থাকতে পারবে।
- সন্তানদের জন্য ইতিবাচক বিনোদনের ব্যবস্থা করুন, যাতে তারা অমূলক ও অশালীন বিনোদন থেকে বেঁচে থাকতে পারে। শিল্পকলা, বাগানে ফুলের চাষ, রান্নাবান্না, অধ্যয়ন, চিড়িয়াখানা পরিদর্শন, পার্কে নিয়ে যাওয়াসহ আরও অনেক সুস্থ বিনোদন রয়েছে—যা শিশুদের শালীন উপায়ে বিনোদিত করতে পারে।

সাপ্লিমেন্টারি ইসলামিক স্কুল

নিজ ঘরে সকল ধরনের আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রদান নিঃসন্দেহে পিতা-মাতার পক্ষে সম্ভব নয়। এর জন্য তারা ইভিনিং কিংবা ছুটির দিনে ইসলামিক স্কুল কিংবা মাদরাসায় নিয়মিত পাঠাতে পারেন। সেখানে তারা কুরআন ও ইসলামের অন্যান্য বিষয়াবলি শিখতে পারবে। অনেক সময় নিয়মিত কাজ ফেলে সন্তানদের ইসলামি শিক্ষা দেওয়া পিতা-মাতার জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। একই সাথে তারা সন্তানদের এই সমস্ত বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসের অভাবেও ভোগেন। এ সকল পরিস্থিতিতে সন্তানদের ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে ইসলামিক স্কুল অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে সন্তানদের প্রেরণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করা যেতে পারে—

- শিশুরা প্রতিদিন সাত ঘণ্টা এবং সপ্তাহের পাঁচ দিন স্কুলে থাকে। এর পাশাপাশি তারা পরিশ্রান্ত শরীরে অনেকগুলো হোমওয়ার্ক নিয়ে ঘরে ফেরে। ছুটির দিনগুলোতে তাদের শারীরিক ও মানসিকভাবে বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ দিতে হবে। ইসলামিক ক্লাসগুলোর সময় ও পরিধির দিকে নজর দিতে হবে। অর্থাৎ শিডিউলের কারণে তারা যেন অনেক বেশি ক্লান্ত না হয়ে যায়, সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

- পিতা-মাতার কর্তব্য হচ্ছে প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করা। পাশাপাশি সন্তানদের শিক্ষার জন্য কী পরিমাণ সামগ্রী ও জায়গা রয়েছে, সেদিকেও খেয়াল রাখা জরুরি। শুধু একটি হোয়াইট বোর্ড এবং কলমসংবলিত উপচে পড়া শ্রেণিকক্ষ কখনো শিক্ষার সর্বোত্তম পরিবেশ হতে পারে না।

- সন্তানদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি হচ্ছে কি না, সে বিষয়ে পিতা-মাতাকে অবশ্যই নজর দিতে হবে। এক্ষেত্রে পিতা-মাতা তাদের শিক্ষক ও ম্যানেজমেন্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। অনেক ইসলামিক স্কুল রয়েছে, যেগুলোর বৃহদাংশ অপেশাদার শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত। নিয়্যাত ভালো থাকলেও আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের প্রফেশনালিজমের অভাব রয়েছে। আচরণগত সমস্যাগুলো কীভাবে সমাধান করতে হয়, তাদের সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা না-ও থাকতে পারে। কিংবা পাঠ পরিকল্পনা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে তারা উপযুক্ত সময় না-ও দিতে পারে।

মুসলিম সংস্কৃতি তৈরি

মুসলিম অভিভাবক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে এমন এক পরিবেশ তৈরি করা, যেখানে সন্তানরা আত্মবিশ্বাসের সাথে নিজেদের মুসলিম পরিচয় দিতে পারবে। নিজ পরিচয়ে আত্মবিশ্বাসী হওয়ার মাধ্যমেই তারা সমাজে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারবে এবং সমাজের সকল পর্যায়ের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারবে। নিজের পেশার মাধ্যমে সমাজে অর্থনৈতিক অবদান রাখার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে পারবে। নিজের সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয়ের মাধ্যমে সমাজের গরিব-দুস্থদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। আল্লাহর ইচ্ছায় ভারসাম্যপূর্ণ, প্রাপ্তবয়স্ক ও যোগ্য জীবনসঙ্গী এবং প্রাজ্ঞ অভিভাবক হয়ে বেড়ে উঠবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নেতৃত্ব দেবে।

নিরবচ্ছিন্ন কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমেই আমরা তরুণদের উপযোগী এমন এক সংস্কৃতি তৈরি করতে সক্ষম হব, যেখানে আমাদের সন্তানরা গর্ববোধ করতে পারবে। এটি এমন সংস্কৃতি, যেখানে তারা পরিবারের সবার থেকে স্নেহ-ভালোবাসা পাবে; বুঝতে পারবে সমাজের জন্য তাদের অনেক কিছু করার আছে। এই পরিবেশ তাদের এমন এক নেটওয়ার্ক তৈরিতে সাহায্য করবে, যেখানে তারা নিজের মনের কথা ও বেদনা প্রকাশ করতে পারবে। আমাদের কর্তব্য হলো—সন্তানদের ইসলাম ও এর বিধিবিধানকে ভালোবাসতে উৎসাহিত করা।

www.nagorikpathagar.org

মুসলিম সংস্কৃতি তৈরি করার ক্ষেত্রে নিজেকে সম্পূর্ণ আলাদা করার কিংবা অমুসলিমদের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করার প্রয়োজন নেই। এটি ইসলামি চেতনার সম্পূর্ণ বিপরীত। সমাজের সকলের সাথে উঠাবসা এবং অপরের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করা ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের চারদিকের বিশ্ব প্রতিনিয়তই সন্তানদের প্ররোচিত করে এবং সন্দেহের মধ্যে ফেলে দেয়। এখানে তাদের আকর্ষিত করার মতো অনেক অনৈতিক বিষয় রয়েছে। বৃহৎ সমাজের সাথে মেলামেশার আগেই এই সমস্ত বিষয় থেকে সন্তানদের রক্ষা করতে হবে। ইসলামি পরিচয় এবং এর নিয়মকানুন অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে—যাতে তারা উদ্দেশ্যহীনভাবে ঝরা পাতার ন্যায় নিজেদের জীবন পরিচালনা না করে; বরং বাতির ন্যায় জ্বলে ওঠে।

তরুণদের সংগঠন ও মসজিদের ভূমিকা : শিশুরা যে বয়স থেকে মসজিদের আদব রক্ষা করতে পারে, সেই সময় থেকে তাদের মসজিদ নিয়ে যাওয়া উচিত। এতে তাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের মানুষের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ তৈরি হয়।

ইসলামের ইতিহাসে মসজিদ সব সময় সামাজিক ও শিক্ষাবিষয়ক কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ভূমিকা রেখে এসেছে। দুর্ভাগ্যবশত বর্তমানে অনেক মসজিদই নিশ্চল; এমনকী সালাতের সময় ছাড়া অন্য সময় বন্ধ থাকে। মসজিদ যদি শুধু সালাতের জন্যই ব্যবহার করা হয়, তাহলে 'উম্মাহর পুনর্জাগরণ' স্বপ্নই থেকে যাবে। রাসূল ﷺ-এর সময়কার মসজিদগুলো সমাজের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। বর্তমান সময়ের মসজিদগুলোও সেভাবেই পরিচালনা করতে হবে।

জামাতের সাথে সালাত আদায় ও কুরআন শিক্ষার পাশাপাশি মসজিদগুলোতে আরও কিছু সামাজিক কাজের আয়োজন করা উচিত। যেমন : আলোচনা, শিক্ষামূলক ক্লাস, মসজিদ প্রাঙ্গনে শিশুদের খেলাধুলার ব্যবস্থা রাখা ইত্যাদি। মসজিদ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উচিত প্রথাগত অনীহা থেকে সরে এসে সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমে ভূমিকা রাখা। মসজিদের ইমাম সাহেবদের মানুষের সাথে যোগাযোগের দক্ষতা এবং নিজ সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত মৌলিক ধারণা রাখতে হবে, যাতে তারা শিশু ও বৃদ্ধ সবার সাথে মিশতে পারে। মসজিদের মানবৃদ্ধি, পেশাগতভাবে এর পরিচালনা এবং মসজিদভিত্তিক কার্যক্রমে যুবকদের সুযোগ প্রদান মসজিদের কার্যক্রমের অগ্রভাগে থাকতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

মুসলিম শিশুদের সম্ভাবনা বিকাশের অন্যতম উপায় হলো—ছোটোকাল থেকেই তাদের বিভিন্ন ইসলামিক আসরে নিয়ে যাওয়া, যেখানে তারা সকল ধরনের সমাজকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে। রাসূল ﷺ তরুণ বয়সে সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য 'হিলফুল ফুজুল' নামক একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অভিভাবকদের কর্তব্য হচ্ছে—এসবের সাথে নিজে সম্পৃক্ত হওয়া এবং সন্তানদেরও উৎসাহিত করা। বর্তমানে অনেক সামাজিক সংগঠন রয়েছে, যারা বয়ঃসন্ধিকালীন সময়ে শিশুদের দলে অন্তর্ভুক্ত করে। কিন্তু শিশুদের অনেক ছোটোকাল থেকেই সমাজ গঠনের কাজে অংশগ্রহণ করানো উচিত। ছোটোকাল থেকেই সমাজকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করার ফলে শিশুরা চ্যালেঞ্জিং দায়িত্ব গ্রহণে সাহসী হয়। এটা তাদের পরবর্তী জীবনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। মুসলিম তরুণ সংগঠনগুলো নিম্নোক্ত সামাজিক সেবামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে—

- সামাজিক অনুষ্ঠান পালন
- কুরআন, ইসলামি জ্ঞান, আরবি ভাষা ও আধ্যাত্মিক উন্নতির ওপর বিভিন্ন আসরের আয়োজন
- খেলাধুলাসহ বিভিন্ন বিনোদনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ
- সামাজবিরোধী কাজের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ
- হোমওয়ার্ক তৈরি এবং ক্যারিয়ার বাছাইয়ে যুবকদের সাহায্য
- প্রশিক্ষণ ও লিডারশিপ প্রোগ্রামের আয়োজন করা।

এই সমস্ত সংগঠন চারপাশের সকলের সাথে বন্ধুত্ব তৈরি করতে তরুণদের সাহায্য করে, যা তাদের সামাজিক জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ছেলেমেয়েরা খুব সহজেই বন্ধুত্ব তৈরি করতে এবং ভাঙতে পারে। বন্ধু গ্রহণের মাধ্যমে তারা চারদিকের বিশ্ব সম্পর্কে জানতে পারে। পিতা-মাতার কর্তব্য হলো—উপযুক্ত বন্ধু বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সন্তানদের সহযোগিতা করা। কারণ, বাচ্চাদের আচার-আচরণে বন্ধু-বান্ধবের সাহচর্যের ভূমিকা অনেক বেশি।

পিতা-মাতার উচিত সন্তানদের প্রয়োজনীয় সমর্থন দেওয়া, যাতে তারা নিজেদের সমাজ ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশ মনে করে। তাদের কাছ থেকে কোনো কিছু আদায় করার জন্য এটিই উত্তম পদ্ধতি। এক্ষেত্রে সন্তানদের ওপর অতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ থেকে অভিভাবকদের বিরত থাকে হবে।

www.nagorikpathagar.org

উৎসব : প্রত্যেক সমাজেরই নিজস্ব উৎসব রয়েছে। আমাদের মুসলিমদের দুটি উৎসব বা ঈদ রয়েছে। একটি দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার পর, অন্যটি আরাফাতের পরের দিন ইবরাহিম ﷺ-এর ত্যাগকে স্বরণ করার উদ্দেশ্যে উদ্‌যাপন করা হয়। সমাজের সবাই একত্রিত হয়ে আল্লাহর স্মরণ ও ইবাদত করাই এই দুটো সামাজিক উৎসবের মূল উদ্দেশ্য। ইসলামি বিনোদনের স্বতন্ত্র রকমের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বৈচিত্র্য রয়েছে। মুসলিম পিতা-মাতার দায়িত্ব হলো, সন্তানদের কাছে এই সকল উৎসবকে উপভোগ্য করে তোলা। একই সঙ্গে তাদের মাঝে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের অনুভূতি সৃষ্টি করা। এই ক্ষেত্রে পিতা-মাতা নিম্নোক্ত কাজগুলো করতে পারেন—

- নিজের কর্ম ও গল্পের মাধ্যমে এই দুটি উৎসবের মূল কারণ ব্যাখ্যা করুন।
- ঘরকে সাজিয়ে রাখুন।
- উৎসবের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পরিবার, বন্ধু-বান্ধব ও সমাজের দরিদ্রদের উপহার প্রদান করুন।
- ওই দিনকে স্কুল ও চাকরি-বাকরি থেকে মুক্ত রাখুন।
- নতুন পোশাক তৈরি কিংবা ক্রয় করুন।
- ওই দিনের কার্যতালিকায় মসজিদে গমন, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের সাথে সাক্ষাৎ, শিশুদের জন্য আনন্দদায়ক খেলাধুলাসহ বিভিন্ন মজার কার্যক্রমের ব্যবস্থা রাখুন।

ছুটির দিন : স্কুলের ছুটির দিন আলসেমির জন্য নয়; বরং এটি সন্তান, পিতা-মাতা উভয়পক্ষের জন্যই একটি সুবর্ণ সুযোগ। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পিতা-মাতা যেমন সন্তানদের সাথে কার্যকর সময় কাটাতে পারেন, তেমনি সন্তানও সৃজনশীল কিছু শিখতে পারে। কারণ, এই দিন তারা স্কুল ও হোমওয়ার্কের চাপে ক্লান্ত থাকে না। পিতা-মাতার উচিত পরিকল্পিত উপায়ে এই দিনটি অতিবাহিত করা এবং সৃজনশীল কাজের মাধ্যমে সন্তানদের খুশি ও ব্যস্ত রাখা।

যদি সামর্থ্যবান হন, তাহলে ছুটির দিনে সন্তানদের নিয়ে বিভিন্ন বিখ্যাত জায়গা ঘুরে আসতে পারেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগের জন্য পরিচিত দর্শনীয় স্থান ভ্রমণ করতে পারেন। কারণ, এই সমস্ত স্থান পরিদর্শন করলে আল্লাহর সৃষ্টির মাহাত্ম্য সম্পর্কে ধারণা পাওয়া এবং ব্যস্ততা ও কোলাহলপূর্ণ

www.nagorikpathagar.org

শহুরে জীবন থেকে কিছু সময়ের জন্য নিভৃত হওয়া যায়। এর পাশাপাশি বিভিন্ন ইসলামিক কালচারাল পোগ্রাম এবং বিনোদনমূলক কার্যক্রমেও অংশ নিতে পারেন। কারণ, এর মাধ্যমে আধ্যাত্মিক বৈচিত্র্যতা ও শালীন বিনোদন উপভোগ করা যায়।

এ ছাড়াও রাসূল ﷺ-এর পদাঙ্ক অনুসরণের জন্য সন্তানদের নিয়ে উমরাহয় যেতে পারেন। এতে তারা একটি স্মরণীয় ছুটি কাটানোর পাশাপাশি নিজের বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত দেশে ভ্রমণ করার সুযোগ পাবে।

পিতা-মাতা যদি প্রতিনিয়ত সন্তানদের ইতিবাচক ও কল্যাণমূলক কাজে অভ্যস্ত করাতে পারেন, তাহলে এর মাধ্যমে শিশুরা ঘরের বাইরে না গিয়েও অনেক আনন্দ উপভোগ এবং উপযুক্ত শিক্ষাও অর্জন করতে পারবে। ছুটির দিনগুলো যদি ব্যক্তিগত উন্নতি, মানুষের সাথে যোগাযোগমূলক ও সুস্থ বিনোদনমুখর না হয়, সময়গুলো যদি কেবল টেলিভিশন ও কম্পিউটারের সামনেই কাটে, তাহলে তা মুসলিম অভিভাবকদের জন্য খুবই দুর্ভাগ্যজনক।

উপসংহার

এ অধ্যায়ে আমি সন্তান প্রতিপালনের সেই সব অবশ্যম্ভাবী দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি, যেগুলো মানবজাতির উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত। মুসলিমদের জন্য প্যারেন্টিং শুধু দুনিয়ার জন্যই কল্যাণকর নয়; আখিরাতের মুক্তির ক্ষেত্রেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কুরআন আমাদের বলে, সন্তানরা পিতা-মাতার জন্য 'পরীক্ষা' ও আমানতস্বরূপ। পিতা-মাতার মূল দায়িত্ব হলো সন্তানদের ভালোবাসা, যত্ন ও উপযুক্ত শিক্ষা-প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আল্লাহর উপযুক্ত প্রতিনিধি হিসেবে তৈরি করা।

এই পৃথিবীতে আল্লাহ আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাগান পরিচর্যার দায়িত্ব দিয়েছেন। আমাদের কর্তব্য হলো—যথাযথ পরিচর্যার মাধ্যমে সেই বাগানকে প্রস্তুত এবং সেখানে বাহারি সুগন্ধি ফুল প্রস্ফুটিত হওয়ার পরিবেশ তৈরি করা। কার্যকরভাবে সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব পালনের অর্থ হলো, সন্তানদের মাঝে বৈশ্বিক, আদর্শিক মূল্যবোধ ও দায়িত্বানুভূতি তৈরি। পরিবার এমন এক প্রতিষ্ঠান, যেখানে পিতা-মাতা একটি সুখী, আনন্দদায়ক ও শিক্ষামূলক পরিবেশ তৈরি করতে পারেন। একটি হৃদ্যতাপূর্ণ ও যত্নশীল পারিবারিক পরিবেশ সন্তানদের সাথে পিতা-মাতার মজবুত সম্পর্ক তৈরি করে। এর মাধ্যমে

www.nagorikpathagar.org

সন্তানরা সমাজের অন্যান্য মানুষদেরও ভালোবাসতে শেখে। এই ধরনের পরিবেশের প্রভাব মুসলিমদের আচার-আচরণের ওপর প্রতিফলিত হওয়া উচিত, যা ইসলামি সামাজিক জীবনের সারবস্তু।

অন্যদিকে যে সকল সন্তান বেখায়ালি ও রূঢ় স্বভাবের পিতা-মাতার কাছে বেড়ে উঠে কিংবা যারা অসুস্থ পরিবেশে গড়ে উঠে, তাদের মধ্যে সমাজকল্যাণমূলক কাজের প্রতি আগ্রহ তেমন জন্মায় না; বরং তারা হয় সমাজের বোঝা। অভাব শুধু সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হয় না; তা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও হতে পারে। আর্থ-সামাজিক বঞ্চনা সমাজে অশান্তির সৃষ্টি করে। অন্যদিকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বঞ্চনা তরুণদের মাঝে সন্দেহের সৃষ্টি করে এবং মনুষ্যত্বের পতন ঘটায়। এই পরিস্থিতিতে কোনো ব্যক্তি ও সমাজের উন্নতি সাধন হতে পারে না।

আমি এমন একধরনের পরিবার গঠনের প্রস্তাব পেশ করেছি, যেখানে প্যারেন্টিং হবে ঈমানের ক্ষেত্রে আপসহীন, পারস্পরিক সহযোগিতাপূর্ণ ও পরিশ্রমী। এর জন্য প্রয়োজন উত্তম কৌশল, ভবিষ্যতের পরিকল্পনা, নিয়মিত সতর্কতা, উদ্যোগ ও দৃঢ় সংকল্প। মায়ের গর্ভে আসার পর থেকেই সন্তান প্রতপালনের দায়িত্ব শুরু হয়। এটি একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়া। এই দায়িত্ব জীবনব্যাপী পালন করতে হয়। সন্তান প্রতিপালনের মধ্যে রয়েছে জন্মের পর থেকেই শিশুদের শারীরিক পুষ্টি নিশ্চিত করা, মানসিক সমর্থন দেওয়া, সামাজিকভাবে গড়ে তোলা এবং আধ্যাত্মিক বিকাশের প্রচেষ্টা চালানো। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব পিতা-মাতার জন্য একই সাথে চ্যালেঞ্জিং, দুঃসাহসিক, আনন্দদায়ক ও সুখকর। এর প্রতিদানও বিশাল। তা হলো—দুনিয়ায় সফল হওয়ার তৃপ্তি এবং আখিরাতে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন।

আলোচিত পরামর্শগুলোর সারমর্ম

সন্তানের ওপর কর্তৃত্ববান হওয়ার অধিকার পিতা-মাতার রয়েছে। তবে সচেতনতার সঙ্গে এবং কার্যকর উপায়ে এই অধিকারকে প্রয়োগ করতে হবে। নিচে সন্তানদের সার্বিকভাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই সমস্ত অধিকার প্রয়োগের কিছু পন্থা উল্লেখ করা হলো—

পিতা-মাতার কর্তব্য হচ্ছে—

- সন্তানদের শিক্ষা কার্যক্রম দ্রুত শুরু করুন। ইসলাম ও বিশ্ব সম্পর্কে ধারণা দিন। এক্ষেত্রে খুব বেশি দেরি করা যাবে না। সন্তানদের ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও বিভিন্ন যুগের মহান মুসলিম ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে জানাতে হবে,

www.nagorikpathagar.org

যাতে তারা এদের মধ্য থেকে অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব খুঁজে নিতে পারে। শিশুমনে কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত সত্য কাহিনিসমূহের বিরাট প্রভাব রয়েছে। তাদের এগুলো শোনান। এসব ভিত্তির ওপর তাদের চরিত্র একবার গঠিত হয়ে গেলে ইসলামি আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা কম।

- ইসলামের সঠিক চেতনা ধারণ করে, তার পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করার জন্য সন্তানদের উৎসাহিত করুন। রাসূল ﷺ-এর নির্দেশনা অনুযায়ী, সাত বছর থেকেই সন্তানদের সালাতের শিক্ষা দিন। দশ বছর থেকে সালাত ত্যাগ করলে শাসন করুন।
- কার্যকর উপায়ে গাইড করার উদ্দেশ্যে তাদের মনমানসিকতা বুঝুন। এই ক্ষেত্রে তাদের আচার-আচরণের প্রতি স্বাভাবিক পর্যবেক্ষণ করা এবং নিজের বিচার-বুদ্ধি খাটানো জরুরি।
- তাদের শালীন ও অর্থবহ বিনোদনের সুযোগ দিন। বাচ্চারা আনন্দ উপভোগ পছন্দ করে। পিতা-মাতার কর্তব্য হচ্ছে তাদের সুস্থ বিনোদনের উপায় দেখিয়ে দেওয়া; অন্যথায় তারা অনেক বিরক্তি অনুভব করবে কিংবা নিজদের মতো করে বিনোদনের উপায় খুঁজে নেবে। রাসূল ﷺ শিশুদের সাথে তাদের মতো করে আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।
- সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে নিজেদের আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করুন, যাতে সন্তানরা বাউন্ডারি সম্পর্কে অবগত হতে পারে। যে সকল পিতা-মাতা সন্তানদের শৃঙ্খলা দিতে জানেন না, তাদের সন্তানরা জীবনযাপন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পায় না।
- তাদের মানসিকতার দিকে খেয়াল রাখুন। কথাবার্তা ও আচার-আচরণের ক্ষেত্রে তাদের সাথে সংগত আচরণ করুন, যাতে তারা অস্বস্তি বোধ না করে। প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল নিয়মকানুন ও নির্দিষ্ট লক্ষ্যহীন কার্যকলাপ সন্তানদের সংশয়ের মধ্যে ফেলে দেয়। বুদ্ধিমান সন্তানরা পিতা-মাতার আচার-আচরণের সংগতি পর্বেক্ষণ করেন। সংগতিপূর্ণ আচরণ মানেই কাঠিন্য নয়। যদি কোনো নিয়মকানুন পরিবর্তন করা হয়, তাহলে সন্তানদের কাছে এর যথাযথ কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে।
- সন্তানদের সাথে নির্দেশমূলক আচরণ থেকে বিরত থাকুন। সন্তানদের দিয়ে কোনো কিছু করাতে চাইলে আমাদের উচিত তাদের মধ্যে কর্মোদ্দীপনা তৈরি করা। এই ক্ষেত্রে মাঝেমধ্যে তাদের সামনে যথাযথ কারণ উল্লেখ করতে হবে। পিতা-মাতার উচিত তাদের উৎসাহিত ও উদ্‌বুদ্ধ করা, যাতে তারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কাজ করে।

www.nagorikpathagar.org

- সন্তানদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখুন। জীবনযাপনের ক্ষেত্রে তারা সম্পূর্ণ নতুন বিধায় তাদের জন্য অভিজ্ঞদের পথনির্দেশ প্রয়োজন। তাদেরই কল্যাণার্থে উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা অপরিহার্য। তবে অতিরিক্ত কড়াকড়ি আরোপ তাদের সুস্থ উপায়ে গড়ে উঠার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।
- যতই কঠিনই হোক না কেন, নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করুন। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ সন্তানদের অনেক কষ্ট দেয়। তারা একে মিথ্যা হিসেবেও বিবেচনা করতে পারে, যা ইসলামে নিষিদ্ধ। এটি পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের আস্থার ঘাটতি তৈরি করে।
- শিশুদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করুন। অতিরিক্ত স্বাধীনতা তাদের পদচ্যুত করতে পারে, আবার অতিরিক্ত কড়াকড়িও তাদের বিদ্রোহী করে তুলতে পারে। ইসলাম মানেই পরিমিতিবোধ এবং মধ্যমপন্থা অবলম্বন। শিশুরা যেন চরমপন্থার মধ্য দিয়ে বেড়ে না উঠে, সেদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে।
- কাজকর্মে দৃঢ়তা অবলম্বন করুন। ক্ষতিকর না হলে কোনো জিনিস তাদের কাছে গোপন করবেন না। কারণ, সন্তানদের কাছে গোপন করার চেষ্টা বিপর্যয় আনতে পারে। এতে সন্তানরা ধীরে ধীরে তাদের পিতা-মাতার ওপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলে।
- সহজ ও স্পষ্ট ভঙ্গিতে সন্তানদের সাথে কথা বলুন, যাতে তারা আপনার উদ্দেশ্য বুঝতে পারে। সরল ও সাধারণ ভাষা সন্তানদের ইতিবাচক উপায়ে চলাফেরা করতে উৎসাহিত করে।
- সন্তানরা যখন কথা বলে, তখন মনোযোগ দিয়ে শুনুন। অযথা হস্তক্ষেপ করবেন না। তাদের কথায় হস্তক্ষেপ করলে তারাও বড়োদের কথায় হস্তক্ষেপ করার জন্য উৎসাহিত হতে পারে।
- গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিবারের সকলকে নিয়ে একসঙ্গে আলোচনা করুন। পারিবারিক আলোচনায় সবাইকে অংশগ্রহণের সুযোগ দিলে সন্তানরা পরিবারের বিষয়ে আগ্রহী হয় এবং নিজেদের পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য বলে বিশ্বাস করে।
- সন্তানের ভুলভ্রান্তি ক্ষমা করুন। সন্তানদের জানান, পিতা-মাতাসহ কেউ-ই একদম পারফেক্ট না। পিতা-মাতা যখন সন্তানদের ভুলভ্রান্তিগুলো ক্ষমা করেন, তখন অভিভাবকদের বিচার-বিবেচনা সম্পর্কে তাদের মনে আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়। তারা কখনোই পিতা-মাতাকে অবিবেচক ভাবতে পারে না।

www.nagorikpathagar.org

- সন্তানদের আবেগ-অনুভূতির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখুন। সন্তানদের জীবনেও ভালো ও খারাপ সময় আসে। সুতরাং তাদের সুযোগ দিন। বড়োদের জীবনে যেমন ভালো ও খারাপ সময় থাকে, তেমনি সন্তানদের জীবনের উত্থান-পতনের বিষয়টিকেও বিবেচনা করতে হবে।
- বিভিন্ন পারিবারিক কার্যক্রমে সন্তানদের অংশগ্রহণের সুযোগ দিন। বেগ পেতে হবে না—এমন সহজ কাজগুলো তাদের করতে দিন। এর মাধ্যমে তারা পরিবারকে নিজের করে নিতে শিখবে। এটি তাদের আত্মসম্মান ও আত্মবিশ্বাসও বৃদ্ধি করবে।
- সকল সন্তানের সাথে সমান আচরণ করুন। (আহমাদ, আবু দাউদ ও নাসায়ি)। এক সন্তানের প্রতি অধিক আদর-যত্ন, অন্য সন্তানের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন নিঃসন্দেহে নিষ্ঠুর অভ্যাস। এই ধরনের আচরণ সহোদরদের মাঝে হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘৃণা সৃষ্টি করে।
- বন্ধু-বান্ধব বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সন্তানদের ইতিবাচকভাবে সহযোগিতা করুন। এই ক্ষেত্রে তাদের আচার-আচরণ, উত্তম ইসলামিক ও মানবিক চরিত্রের দিকে লক্ষ রাখুন।
- পরিবারের সদস্য কিংবা বৃহৎ সমাজ থেকে অনুকরণীয় আদর্শিক ব্যক্তিত্ব বাছাইয়ের ক্ষেত্রে তাদের সহযোগিতা করুন।
- সংবেদনশীল বিষয়ের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করুন। সন্তানরা যখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শেষের দিকে চলে আসে, তখন পিতা-মাতার কর্তব্য হচ্ছে—সংবেদনশীল বিষয়ে পুত্র ও কন্যার দিকে আলাদাভাবে নজর দেওয়া। বিশেষ করে যৌন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে পুত্র ও কন্যার প্রতি পিতা-মাতার আলাদা আলাদা দায়িত্ব রয়েছে।
- সন্তানদের শিক্ষা দেওয়া ও শাসন করার উপায় সম্পর্কে দুজন একসঙ্গে আলোচনা করুন এবং সন্তানদের সঙ্গে একই সুরে কথা বলুন। শিশুদের অন্তরে যেন এই ধরনের অনুভূতি তৈরি না হয়, পিতা-মাতা একজন অন্যজনের চেয়ে কঠোর কিংবা নরম দিলের অধিকারী। সন্তানরা এর সুযোগও নিতে পারে। কোনো বিষয়ে দুজনের মাঝে মতানৈক্য তৈরি হলে তা সন্তানদের সামনে আলোচনা না করে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করুন।
- ভালো কাজের জন্য সন্তানদের পুরস্কৃত করুন। এটি তাদের মধ্যে আত্মপ্রশান্তি জোগায় এবং প্রতিনিয়ত সৎ কাজের প্রতি উৎসাহিত করে। এটি তাদের মধ্যে এই বিশ্বাস তৈরি করে যে, পরিবারে তাদের মূল্যায়ন করা হচ্ছে।

www.nagorikpathagar.org

- সন্তান কোনো অপ্রত্যাশিত কাজ করে ফেললে যতদূর সম্ভব গায়ে হাত না তুলেই বুদ্ধিবৃত্তিক উপায়ে তাদের শাসন করুন। এক্ষেত্রে ন্যায়নিষ্ঠতা বজায় রাখুন। এই প্রক্রিয়ায় পিতা-মাতা উভয়কেই জড়িত থাকতে হবে। যে সমস্ত পিতা-মাতা শৃঙ্খলা বিধানের ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারেন, তারা জানেন—কখন, কীভাবে এই দক্ষতা প্রয়োগ করতে হয়। সন্তানরা যদি খুবই খারাপ অপরাধ করে ফেলে, তাহলে তাদের শাসন করার প্রক্রিয়া হলো—

  ক. প্রথমে বোঝান, তার কর্মে আপনি নাখোশ

  খ. তাকে সতর্ক করুন

  গ. সুযোগ-সুবিধা বন্ধ করে দিন।

- সন্তানদের ক্ষমা চাইতে শেখান এবং তারা ক্ষমা চাইলে তা গ্রহণ করুন। এটি তাদের বিবেক বৃদ্ধি করে। সন্তান ক্ষমা চাইলে পিতা-মাতার উচিত বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে ক্ষমা করে দেওয়া। সন্তানদের আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাওয়ার ব্যাপারেও শিক্ষা দিতে হবে। অন্যদিকে, পিতা-মাতারও উচিত কোনো ভুল করলে সন্তানদের কাছে ক্ষমা চাওয়া। এক্ষেত্রে অযথা অহমিকা ধরে রাখা উচিত না।

- সন্তানের শিক্ষকদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখুন। এর ফলে সহজেই জানতে পারবেন, প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিকভাবে আপনার সন্তানের কী ধরনের অগ্রগতি হচ্ছে। যে বাচ্চাদের অভিভাবক শিক্ষকদের সাথে নিয়মিত কথা বলেন, স্কুলে তাদের প্রতি বেশি যত্ন নেওয়া হয়।

সর্বোপরি আপনার সন্তানের সঙ্গ উপভোগ করুন। কারণ, সন্তানের মতো করে কেউ আপনাকে ভালোবাসবে না কিংবা যত্নও নিতে পারবে না। পিতা-মাতা হওয়া সত্যিই বিশাল এক নিয়ামত ও সুযোগ। সুতরাং অভিভাবকত্বের এই মূল্যবান সময়টা উপভোগ করুন।

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় পর্ব

কৈশোরের পরিচর্যা

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

কিশোর বয়সের চ্যালেঞ্জ

'আল্লাহ তাদের কর্তব্যপরায়ণ হিসেবে সম্বোধন করেন এই কারণে যে, তারা তাদের পিতা-মাতা ও সন্তানদের প্রতি দায়িত্বশীল। পিতা-মাতার প্রতি ঋণী থাকার কারণে তাদের প্রতি যেভাবে তোমার দায়িত্ব রয়েছে, একইভাবে সন্তানদের প্রতিও তোমার দায়িত্ব রয়েছে।'

—আল আদাবুল মুফরাদ, বুখারি

দিবাস্বপ্ন নাকি দুঃসাহসিকতা

কিশোররা তাদের বেপরোয়া, আবেগপ্রবণ ও খামখেয়ালিপূর্ণ আচরণের কারণে সব সময় বড়োদের সমালোচনায় বিদ্ধ হয়। এর ইতিবাচক দিক হলো—এর মাধ্যমে তাদের সৃষ্টিশীলতা উদ্যোগ, জীবনশক্তি ও উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়। এটি এমন একটি সময়, যখন মানুষ তার শক্তি ও সম্ভাবনা আবিষ্কার করে এবং দুঃসাহসিক কিছু করার ইচ্ছা পোষণ করে।

এই সমস্ত শক্তি যদি আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ এবং ইতিবাচক সামাজিক আচরণ দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহলে এই গতিশীলতা সমাজকে উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছে দেয়; কিন্তু পথভ্রষ্ট কৈশোর একটি ধ্বংসাত্মক শক্তি, যা সমাজকে টেনে নিচে নামিয়ে আনে এবং সমাজে বিরাট বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।

ইসলামকে পুরো বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে প্রতিটি যুগে তরুণরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। তারা নিজের মানবিকতা, ভাবাবেগ, প্রাণশক্তি ও ত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের মাধ্যমে ইসলামকে ছড়িয়ে দিতে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেছে। এদের মধ্যে অন্যতম হলো মুহাম্মাদ বিন কাসিম। তিনি উমাইয়ার শাসনামলে কিশোর বয়সেই দুঃসাহসিকতা ও আধ্যাত্মিক শক্তির জন্য খ্যাতিলাভ করেছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

মুসলিম উম্মাহ যখন অতিমাত্রায় আত্মতুষ্টিতে লিপ্ত হলো এবং মূল উদ্দেশ্য থেকে সরে এলো, ঠিক তখনই শুরু হলো মুসলিম যুবশক্তির অপচয় ও অপব্যবহার। ফলে উম্মাহর পতনের সময় ঘনিয়ে এলো।

যুবকরা সেই নির্দেশনা অনুযায়ী নিজের শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় করে, যা তারা পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের থেকে শেখে। তাদের আচার-আচরণ মূলত ছোট্ট বয়সে পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের থেকে প্রাপ্ত শিক্ষার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। অভিভাবকদের উচিত কিশোর সন্তানদের ব্যাপারে গভীর জ্ঞান রাখা, যাতে বৃহত্তর সমাজের কল্যাণার্থে তাদের একজন ভালো মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলা যায়। এর জন্য এমন পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে, যা অতি উদারও নয়, আবার অতি রূঢ়ও নয়।

বিরাট পরিবর্তন

পিতা-মাতা শিশুদের যে সমস্ত বিষয়াবলি শিক্ষা দেন, সেগুলোতেই তারা অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু কিশোররা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। শিশু যখন শৈশব থেকে কৈশোরের দিকে পদার্পণ করতে শুরু করে, তখন শারীরিকভাবে বিরাট পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়; এমনকী তাদের আবেগ-অনুভূতিরও বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়। এই ধরনের বেড়ে উঠা তাদের জীবনের এক বড়ো অভিজ্ঞতা, যা অনেকের কাছে উৎসাহব্যঞ্জক আবার অনেকের জন্য যন্ত্রণাদায়ক।

জীবনে এই ধরনের আকস্মিক পরিবর্তন কোনো সহজ বিষয় নয়; কিশোর হিসেবে বেড়ে উঠার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে নতুন ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে। এই কারণে আনন্দায়ক বা চমৎকার ব্যাপারটাও তাদের কাছে হঠাৎ করে হতাশা কিংবা উদ্বেগে রূপান্তরিত হতে পারে। জীবনের এই পর্যায়ে পিতা-মাতাকে সন্তানদের জন্য নিজেদের আচার-আচরণের পরিবর্তন আনতে হয়। সন্তানকে একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা হিসেবে বিবেচনা করে তাদের পরিপূর্ণ অধিকার দিতে হয়। তাদের স্বতন্ত্র আচরণকে শুধু সহ্য করলেই চলে না; বরং এটিকে পূর্ণভাবে গ্রহণও করতে হয়। এই সময়েই মূলত অভিভাবকদের সন্তান লালন-পালনের সক্ষমতা যাচাই হয়।

অনেক অভিভাবক সন্তানদের এই নতুন আচরণে অনেক কষ্ট পান। অনেকে আবার শিথিলতা প্রদর্শন এবং কিশোর সন্তানদের বল্গাহীনভাবে ছেড়ে দেন। অন্যদিকে, অনমনীয় ও কর্তৃত্বশীল অভিভাবকগণ সন্তানদের ওপর নানা সীমারেখা আরোপ করেন। এগুলোর কোনোটিই শোভনীয় নয়। বিবেকবান পিতা-মাতা

www.nagorikpathagar.org

ধৈর্য ও বিচক্ষণতার সাথে ভারসাম্যপূর্ণ উপায়ে সন্তানদের সাথে আচরণ করেন এবং তাদের আকস্মিক পরিবর্তনের সঙ্গে বিবেচনাপূর্বক নিজেদের মানিয়ে নেয়।

কৈশোর কখন শুরু হয়—তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা খুবই কষ্টসাধ্য। এটি দশ, ষোলো কিংবা আঠারো বছর বয়সে শুরু হতে পারে, তবে পুরো কৈশোরজুড়েই এর ব্যাপ্তি। জীবনের এই পর্যায়ে কী ঘটে? কৈশোর জীবন নিয়ে কোনটি মিথ আর কোনটি বাস্তবতা?

কৈশোর হলো শৈশবকালের পরিসমাপ্তির শুরু, যা তরুণদের দায়িত্ব নেওয়ার পর্যায়ে পৌঁছে দেয়। এই সময়টা যেহেতু তরুণদের মাঝে একধরনের মানসিক বিপর্যয়ের সম্ভাবনা জাগিয়ে তোলে, তাই অভিভাবকদের উচিত সন্তানদের কার্যক্রমকে খুব নিকট থেকে পর্যবেক্ষণ করা। এই সময় সন্তানরা শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়।

শারীরিক পরিবর্তন (Physical Changes) : শারীরিক পরিবর্তন বা বয়ঃসন্ধিকাল জীবনের সে সময়কে বলা হয়, যে সময়ে সন্তানদের শরীর ভিন্নমাত্রায় ভিন্ন উপায়ে কাজ করতে শুরু করে এবং যা তাদের শরীরকে সন্তান জন্মদানে সক্ষম করে তোলে। মেয়েদের ক্ষেত্রে স্ত্রী হরমোনের বৃদ্ধি তাদের শরীরকে একজন পরিপূর্ণ নারীর গঠনে রূপান্তরিত করে এবং তাদের মধ্যে হায়েজের (ঋতুস্রাব) সূত্রপাত ঘটে। শরীরে অধিক পরিমাণে টেস্টোস্টেরন (Testosterone) থাকার কারণে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের উচ্চতা ও ওজন অধিক পরিমাণে বেড়ে যায়। তাদের কণ্ঠস্বর পরিবর্তন হয় এবং শরীরে বিভিন্ন স্থানে লোম গজায়। তাদের মাঝে বিভিন্ন ধরনের পুরুষালি বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটে।

এই সময়ে যেহেতু সন্তাদের মাঝে শারীরিক শক্তি ও কর্মচঞ্চলতা বৃদ্ধি পায়, এজন্য তাদের দরকার শারীরিক বিকাশের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য, বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য মানসিক পুষ্টি।

শুধু সন্তানদের শারীরিক পরিবর্তনের দিকে লক্ষ রাখলেই হবে না; বরং এই পরিবর্তনগুলোর সাথে তারা যেন সহজভবে মানিয়ে নিতে পারে, সেজন্যও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। পিতা-মাতার উচিত সন্তানদের সঙ্গে বয়ঃসন্ধিকালের গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ নিয়ে যথাসম্ভব খোলামেলাভাবে আলোচনা করা। এর মধ্যে ইসলামি ফিকহ অনুযায়ী ঋতুস্রাব ও স্বপ্নদোষের পর পবিত্রতা অর্জন,

www.nagorikpathagar.org

শরীরে অতিরিক্ত চুল পরিষ্কারসহ বিভিন্ন ইসলামিক আচার-ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এই সকল ক্ষেত্রে সংবেদনশীলতা অপরিহার্য। তবে কোনো ধরনের ইতস্ততবোধ অভিভাবকদের যেন সন্তানদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি নিয়ে আলোচনা থেকে বিরত না রাখে।

স্বয়ং কুরআনেই এই সকল স্পর্শকাতর বিষয়ে শালীনভাবে আলোচনা করা হয়েছে। যৌন ও যৌনতাবিষয়ক আলোচনা যেন কোনো ধরনের ট্যাবু হিসেবে গণ্য করা না হয়; বরং ইসলামিক উপায়ে যথাসম্ভব শালীনভাবে এই সকল বিষয়ে আলোচনা করতে হবে। যদি এসব ব্যাপারে কিশোরদের সঙ্গে আলোচনা করা না হয়, তাহলে তারা এই বিষয়ে অন্য কোনো নিকৃষ্ট উৎস থেকে তা শিখে নেবে, যা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের জন্য ক্ষতিকর। তবে এই সকল বিষয়ে সাবলীল আলোচনার ক্ষেত্রে সন্তান ও অভিভাবকদের মাঝে ভারসাম্যপূর্ণ ও গভীর সম্পর্ক অপরিহার্য।

বয়ঃসন্ধিকাল এমন একটি সময়, যখন থেকে শরিয়াহর বিধানাবলি পালন করাও অপরিহার্য হয়। অন্যকথায়, ইসলামিক নিয়মানুযায়ী ছেলেমেয়েরা এই সময়ে নিজেদের কর্মের জন্য দায়িত্বশীল পুরুষ ও নারী হিসেবে বিবেচিত হয়; যদিও তারা এখনও কিশোর। এই ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মাঝে মর্যাদাপূর্ণ সম্পর্কের মাধ্যমে একটি উন্নত ও নৈতিক সমাজ গঠন অপরিহার্য, যা শিষ্টাচারিতার সীমা অতিক্রান্ত করে না।

বিপরীত লিঙ্গের মানুষদের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে ইসলামের বিস্তারিত ও যৌক্তিক বিধান রয়েছে। পবিত্র কুরআনের সূরা নিসার ২৩ নং আয়াতে মুহাররামাদের কথা উল্লেখ রয়েছে, যাদের বিবাহ করা নিষিদ্ধ। যখন কোনো মুসলিম যুবক-যুবতি জনসম্মুখে একত্রিত হয়, তখন অবশ্যই আল্লাহকে হাজির-নাজির জেনে নিজেদের পোশাক ও আচরণের দিকে লক্ষ রাখতে হবে।

অনুভূতিগত পরিবর্তন (Emotional Changes) : শারীরিক পরিবর্তন কিশোরদের মাঝে প্রাকৃতিকভাবেই লজ্জাশীলতা ও বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি করে। শরীরে মধ্যে হরমোনজনিত বিদ্বতার ফলে তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মানসিক পরিবর্তন দেখা দেয়। যেহেতু শারীরিক পরিবর্তনে কিশোরদের কোনো ভূমিকা নেই, তাই এই ধরনের আকস্মিক পরিবর্তন তাদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করতে পারে। এই সময় চারপাশের লোকজন তাদের ভিন্ন চোখে মূল্যায়ন করে বিধায় তাদের মধ্যে অনিশ্চয়তা ও অযৌক্তিক ভাব সৃষ্টি হতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

তারা বুঝতে পারে না—তারা এখনও ছোটো নাকি বড়ো হয়ে গেছে? অথবা তারা জীবনের কোন পর্যায়ের উপনীত? এ বিষয়টি বুঝতে বুঝতেই তাদের অনেক দিন লাগে। সচেতন অভিভাবক ও বড়োরা বাস্তব পৃথিবীর সাথে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের ওপর অধিক চাপ প্রয়োগ করে না; বরং তারা যাতে নিজের মতো করে নতুন পৃথিবীর সাথে মানিয়ে নিতে পারে, সেজন্য যথেষ্ট সময় ও সুযোগ করে দেয়।

সামাজিক পরিবর্তন (Social Changes) : কিশোররা বুঝতে পারে, তারা এখন পর্যন্ত অভিভাবকদের ওপর নির্ভরশীল। তাই তারা নিজের পায়ে দাঁড়াতে বা স্বনির্ভর হতে একটা তাড়না অনুভব করে। আর এটা করতে গিয়ে তারা এমন পন্থা অবলম্বন করে, যা পারিবারিক নিয়ম-শৃঙ্খলার সাথে সাংঘর্ষিক। যেমন : অনেক সময় পারিবারিক কার্যক্রমকে তারা বিরক্তিকর মনে করে, ছোটো ভাই-বোন ও বড়োদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করে ইত্যাদি। এ ছাড়াও তারা প্রাপ্তবয়স্কদের বই-ম্যাগাজিন, গান শোনা ও টেলিভিশন প্রোগ্রামের প্রতি অতিমাত্রায় আগ্রহী হয়ে উঠতে পারে, যা পিতা-মাতার নিকট অপছন্দনীয়। মাঝেমধ্যে দেরি করে ঘরে ফিরতে পারে, অভিভাবক ও পরিবারিক সদস্যদের সাথে মেলামেশায় অনাগ্রহ প্রকাশ করতে পারে, দামি পোশাক-পরিচ্ছদসহ বিভিন্ন জিনিসপত্র কেনার জন্য অভিভাবকদের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে পারে ইত্যাদি।

নিশ্চিতভাবে কিছু অভিভাবকের নিকট এই সকল আচরণ অগ্রহণযোগ্য মনে হতে পারে, কিন্তু কিশোরদের সত্যি সত্যিই ব্যাপক হিমশিম খেতে হয় বাইরের ও ঘরের পরিবেশের সাথে সমন্বয় করতে। কারণ, তারা বাইরের জগতে বন্ধুমহলের চালচলনে এবং মিডিয়ায় প্রদর্শিত বিষয়াবলির মধ্যে একরকম কালচার লক্ষ করে, আর ঘরে তাদের থেকে অন্য ধরনের কালচার প্রত্যাশা করা হয়। এক্ষেত্রে তাদেরকে আস্তে আস্তে পর্যায়ক্রমে বোঝাতে হবে এবং জীবনের আসল উদ্দেশ্য তাদের সামনে তুলে ধরতে হবে।

সন্তান ও অভিভাবকদের মাঝে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক নির্ভর করে অভিভাবকদের ব্যক্তিত্ব এবং কিশোর সন্তানদের পেছনে তারা কতটুকু কার্যকর সময় ব্যয় করে তার ওপর। এই ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থাই সর্বোত্তম পন্থা; অতি কঠোরতা নয়, আবার অতি শিথিলতাও নয়। অর্থাৎ অভিভাবক সন্তানদের সহপাঠী নয়, আবার বসও নয়। অভিভাবকদের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত বন্ধুসুলভ আচরণের মাধ্যমে সন্তানদের আস্থাভাজন হওয়া। সবকিছু সামলে তাদের সামনে এগিয়ে নেওয়ার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানো; যদিও তা অত্যন্ত কঠিন।

www.nagorikpathagar.org

পিতা-মাতার উচিত সন্তানদের আচার-আচরণে সীমা-পরিসীমা নির্ধারণ করা। ইসলাম তাদের কাছে কী চায় এবং কেন চায়, সে ব্যাপারে সম্যক অবগত করা। সন্তানদের সঠিক পথ প্রদর্শন করা এবং তাদের সীমারেখা কেন দরকার, এর কারণ প্রজ্ঞার সাথে বর্ণনা করা। সন্তানরা কখনো যেন অনুভব করতে না পারে, পিতা-মাতার দ্বারা তারা উপেক্ষিত হচ্ছে অথবা অন্যায়মূলক আচরণ করলেও তাদের ছাড় দেওয়া হচ্ছে। যখন তারা পরিবার, সমাজ ও এগুলোর মধ্যে নিজের ভূমিকার ব্যাপারটি বুঝতে পারবে, তখনই কেবল নিজেদের একজন দায়িত্ববান নাগরিক হিসেবে ভাবতে শিখবে। একই সঙ্গে নিজ সম্প্রদায় ও সমাজে নিজের অবস্থান নির্ধারণ করতেও গুরুত্ব দেবে।

অন্যান্য বিষয়

কিশোর বয়সের বিভিন্ন পরিবর্তন নতুন চ্যালেঞ্জের অবতারণা করে। এ সময় বিভিন্ন ধরনের ভয় ও সংশয় পারিবারিক সম্পর্কে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে। আত্মসচেতন ও সংবেদনশীল পিতা-মাতা এগুলোর সাথে খুব দ্রুতই মানিয়ে নেয়। তাঁরা এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করে কিশোরদের উদ্দীপনা সঠিক কাজে লাগানোর জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। এর জন্য সন্তানদের গতিবিধির ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখে এবং সঠিক সময়ে সঠিক পদ্ধতিতে পরামর্শ প্রদান করে।

যৌনতা : বয়ঃসন্ধিকালের প্রভাবে কিশোর-কিশোরীরা বিপরীত লিঙ্গের প্রতি ব্যাপকভাবে আগ্রহী হয়। এটি এমন এক সময়, যখন কিশোররা বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি চরমভাবে আসক্ত হয় এবং বিপুল আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠে। নিজের আবেগ ও প্রবৃত্তির কারণে অনেক কিছু তাদের কাছে লোভনীয় মনে হয়; বিশেষ করে যখন চারপাশের সমাজ ছেলে অথবা মেয়ে বন্ধু থাকাকে কিংবা অবৈধ যৌন সম্পর্ককে স্বাভাবিক মনে করে।

এই সমাজে বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা এবং এর ফলস্বরূপ অবৈধ সন্তান জন্ম দেওয়াকে খুবই স্বাভাবিক পর্যায়ের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলছে। সেইসঙ্গে বিপরীত লিঙ্গ থেকে পৃথকভাবে চলাফেরাকে বিবেচনা করা হচ্ছে পশ্চাদ্‌গামিতা ও নিপীড়নমূলক আচরণ হিসেবে।

নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার ওপর নির্মিত সমাজব্যবস্থায় তরুণদের শক্তি-সামর্থ্যকে সৃষ্টিশীল ও অর্থপূর্ণ উপায়ে ব্যবহার করা হয়। নারী-পুরুষের মেলামেশার ব্যাপারে

www.nagorikpathagar.org

ইসলামের রয়েছে সুনির্দিষ্ট শিষ্টাচার। মুসলিম পুরুষ ও নারীদের বলা হয়েছে আচার-আচরণে বিনয়ী হতে, দৃষ্টিকে অবনত রাখতে এবং বিপরীত লিঙ্গকে আকর্ষণ করে না এমন পোশাক পরিধান করতে। (সূরা নূর : ৩০-৩১)

ইসলাম নারী-পুরুষদের সম্ভাবনাকে যথেষ্টভাবে কাজে লাগাতে এবং পরিবার গঠনে যত দ্রুত সম্ভব বিয়ে করতে উপদেশ দেয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো— ইসলাম নিজেদের যৌনশক্তিকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের কাজে ব্যবহার করার নির্দেশ দেয়। চারিত্রিক নিষ্কলুষতা অর্জনে এগুলো গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে গভীর বিশ্বাস, নিয়মানুবর্তিতা, সম্মানজনক মেলামেশা ও মজবুত পারিবারিক সম্পর্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পর্দা ও শালীনতা : যে সমাজে নারীদের যৌন আবেদনময়ীরূপে প্রদর্শন করা হয়, সেখানে পর্দাকে নিশ্চিতভাবে একটি পশ্চাৎপদ বিষয় মনে করা হয়। ফলে অনেক মানুষ শালীন পোশাককে অত্যাচার-নিপীড়নের প্রতীক হিসেবে মনে করে। তাদের কাছে পর্দা বা হিজাব হচ্ছে একধরনের প্রতিবন্ধকতা, যা নারীদের আবদ্ধ করে রাখে এবং তাদের পুরুষশাসিত পৃথিবীতে দাসী হিসেবে বিবেচনা করে।

ইসলামে হিজাব কেন গুরুত্বপূর্ণ? এই প্রশ্নের উত্তর খুবই সহজ। হিজাবের নির্দেশনা সর্বশক্তিমান আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে; যিনি সবচেয়ে ভালো জানেন মানবিক মর্যাদা কোথায় নিহিত রয়েছে। তাঁর সকল নির্দেশনার পেছনেই অত্যন্ত যৌক্তিক কারণ রয়েছে, যা সমগ্র মানবজাতির জন্য কল্যাণজনক। নারীরা সৃষ্টিগতভাবেই শারীরিক সৌন্দর্যপ্রেমী, কোমল ও ভদ্র প্রকৃতির হয়। অন্যদিকে পুরুষরা হয় প্রচণ্ড যৌনলিপ্সু। এভাবেই তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। হিজাব নারীদেরকে পুরুষের অশ্লীল চিন্তা ও কুদৃষ্টি থেকে রক্ষা করে। একই সঙ্গে পুরুষদেরও সাহায্য করে নারীদের সৌন্দর্যে মোহগ্রস্ত হওয়া থেকে বিরত থাকতে। হিজাব প্রত্যেক নারীকে মানুষ হিসেবে মর্যাদা দেয় তার মেধা ও চরিত্রের ওপর ভিত্তি করে; শারীরিক সৌন্দর্যের ওপর ভিত্তি করে নয়।

হিজাব নারীকে সম্মানের এমন উচ্চ শিখরে পৌঁছে দেয়, যেখানে সে বুঝতে পারে—মানুষ হিসেবে পৃথিবীতে সে আল্লাহর একজন প্রতিনিধি, কন্যা হিসেবে পিতার জন্য সে রহমত, স্ত্রী হিসেবে সে স্বামীর দ্বীনের অর্ধেক এবং মাতা হিসেবে সন্তানদের নিকট সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী; যার পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত।

www.nagorikpathagar.org

ইসলামে একটি কল্যাণজনক সমাজ গঠনে নারী-পুরুষের ভূমিকা একে অন্যের পরিপূরক। তবে প্রত্যেকেই নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী আল্লাহর নিকট দায়বদ্ধ। দুঃখজনকভাবে অনেক মুসলিম সমাজে নারীদের মর্যাদাকে এমনভাবে অবনমিত হয়েছে, যার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই! এটার কারণ হলো—জীবনের সব ক্ষেত্রে অজ্ঞতা ও অবক্ষয়। এটা ইসলামের নির্দেশনার বাইরে সংস্কৃতিকে প্রাধান্য দেওয়ার ফল।

পোশাক অবশ্যই হিজাবের এক অপরিহার্য উপাদান, কিন্তু এটি ফরজ করার পেছনের কারণ ও হিকমাহ আরও গুরুত্বপূর্ণ। কারও শরীর ও চুল এক টুকরা কাপড় দিয়ে ঢাকা আর হিজাব পরিধান করা এক জিনিস নয়। বাহ্যিক পবিত্রতা ও শালীনতার প্রতীক হিজাব যখন অভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে পালন করা হয়, তখনই কেবল হিজাব একজন নারীকে সামাজিক ও আধ্যাত্মিকভাবে মর্যাদার উন্নত শিখরে পৌঁছে দেয়। নিচে কয়েকজনের মতামত তুলে ধরা হলো, যারা হিজাবের প্রকৃত স্বাদ আস্বাদন করেছেন।

> ‘এই পৃথিবীতে নারীদের জন্য অত্যন্ত চমৎকার পোশাক হলো হিজাব। এই কুদৃষ্টিপূর্ণ বিশ্বে হিজাব একজন নারীকে নিরাপত্তা প্রদান করে।’ (একজন তরুণ ধর্মান্তরিত মুসলিম)
>
> ‘অনেক অমুসলিম নারী ভাবতে পারে, হিজাব নারীদের আবদ্ধ করার জন্য অন্যায়মূলক চাপিয়ে দেওয়া একধরনের পোশাক—যা তাদের পুরুষদের নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে। কিন্তু যারা হিজাব পালন করে, তারা এর মধ্যে স্বাধীনতা ছাড়া আর কিছুই পায়নি।’ (একজন ধর্মান্তরিত মুসলিমা)
>
> ‘এটি অধীনতার সম্পূর্ণ বিপরীত। আমরা এটি পালন করি। কারণ, এতেই আমাদের স্বাচ্ছন্দ্য বোধ হয়। আমরা নিজেদের যৌন বস্তু হিসেবে উপস্থাপন করার প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করি। সুন্দর চেহারার পরিবর্তে ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের ভিত্তিতে আমাদের মূল্যায়ন করুন। আমরা পুরুষদের সামনে নিজেদের আকর্ষণীয়রূপে উপস্থাপনের চেষ্টা করি না। পুরুষ আমাদের পদযুগল পছন্দ করুক কিংবা অফিসে আমাদের সুন্দর দেখাক—এই আশায় আমরা চাকরির নামে নিজেদের বিক্রি করি না।’ (মুসলিমা স্কলার)

www.nagorikpathagar.org

নিচে একটি কবিতার উল্লেখযোগ্য অংশ তুলে ধরা হলো, যেটি হিজাবের পেছনের প্রজ্ঞা তুলে ধরে—

(হতাশার বস্ত্র)
ইমা : (একজন উত্তরাধুনিক নারী)
'তুমি একজন বুদ্ধিমান মহিলা হে আয়িশা,
তুমি কেন তোমার চুলের ওপর এগুলো পরো?
নিজেকে পুরুষ জাতির অধীন করে,
এক হাজার বস্ত্র বানিয়ে
এটি খুলে ফেলো আমার বোন
তোমার আবরণকে উন্মুক্ত করো।
চারদিকের বিষয়গুলোকে অন্ধভাবে অনুসরণ করো না;
পৃথিবীকে তোমার স্বাধীনতার কথা জানিয়ে দাও।'
আয়িশা : (বিবেকবান এক মুসলিম মেয়ে)
'হে আমার প্রিয় বোন ইমা!
তুমি কেন এভাবে বিশ্রী পোশাক পরো?
তোমার কোমর পেঁচিয়ে খাটো জামা পরে থাকো
এটি কি আসলেই তুমি?
আমরা এখন বসেছি,
আমি দেখছি যে, তুমি এটি তোমার উরুতে বেঁধে রেখেছ
তুমি কি লজ্জাবোধ করো না?
পুরুষদের লোলুপ দৃষ্টিকে তুমি কি ভয় করো না?
এরা পুরুষজাতি, হে আমার প্রিয়!
যারা ফ্যাশনকে নিয়ন্ত্রণ করে।
পুরুষদের যৌনতাকে উত্তপ্ত করে
নিজেকে মুক্ত করো, হে আমার বোন ইমা!
অশ্লীলতার বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে এসো,
আজ থেকে হিজাব পালন করো; সখী আমার,
ইসলামের পোশাক পরো।
হে প্রিয়! আমি তোমার কথাগুলোই বলছি!
তোমার আবরণকে উন্মুক্ত করো,
অন্ধভাবে দুনিয়াকে অনুসরণ করো না;
বিশ্বকে তোমার স্বাধীনতার কথা জানিয়ে দাও।'

www.nagorikpathagar.org

নিঃসন্দেহে একজন মুসলিম তরুণীর জন্য হিজাব পালন করা চ্যালেঞ্জের বিষয়, যেখানে তাদের তথাকথিত সুশীল ধারার সংস্কৃতিকে অনুসরণ করতে হয়। চাপ দেওয়া হয় নিজেদের চেহারার সৌন্দর্যকে প্রকাশ করতে, যাতে মানুষের প্রবৃত্তিকে কাজে লাগিয়ে ক্রেতা আকর্ষণ করা যায়। বিশেষ করে পুরুষের সামনে তাদের উপস্থাপন করা হয় চরম বেসামাল সাজসজ্জায়, আঁটোসাঁটো পোশাক পরিয়ে। এই সব কালচারে তারা মিশে যায় পরিবারের বিরুদ্ধে গিয়ে। স্বাভাবিকভাবেই স্রোতের অনুকূলে চলা খুবই সহজ, কিন্তু স্রোতের প্রতিকূলে সাঁতার কাটতে ব্যাপক হিম্মতের প্রয়োজন।

পিতা-মাতার, বিশেষত মায়েদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো নিজেদের উপমা হিসেবে উপস্থাপনের মাধ্যমে কন্যাদের হিজাবের গুরুত্ব শিক্ষা দেওয়া; এটা তাদের চারিত্রিক পবিত্রতা, আত্মমর্যাদা রক্ষা, ক্ষমতায়ন ও মুসলিম সত্তার পরিচায়ক।

যারা হিজাব পছন্দ করে না, তাদের দ্বারা হিজাব পালনকারীরা নেতিবাচক আক্রমণের মুখোমুখি হতে পারে। এক্ষেত্রে পিতা-মাতা ও উত্তম বন্ধু-বান্ধবের সমর্থন ও সাহচর্য খুবই প্রয়োজন। আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হিজাব পালনকারী নারী এবং সামাজিক চাপে হিজাব ত্যাগকারী নারীর মধ্যে পরিষ্কার পার্থক্য তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে।

দাড়ি : দাড়ি রাখা হলো নবি-রাসূলগণের সুন্নাহ, যা পালন করা প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম পুরুষদের ওপর ওয়াজিব; কারও মতে মুস্তাহাব। রাসূল ﷺ বলেন—

> 'তোমরা গোঁফ ছোটো করো এবং দাড়ি ছেড়ে দাও।' সহিহ মুসলিম

দাড়ি পুরুষত্বের প্রতীক। প্রাচীন সভ্যতায় এটিকে সমাজের কর্তৃত্বশালীদের প্রতীক হিসেবে ধরা হতো। সমাজের নেতৃত্বস্থানীয় ও ক্ষমতাধর ব্যক্তিবর্গ দাড়ি রাখত। আধুনিক যুগে ক্লিন শেভ বা ফ্যাশনের জন্য মুখে অল্প পরিমাণ দাড়ি রাখাকে আকর্ষণীয় স্টাইল হিসেবে ধরা হয়। কিন্তু মূল বিষয় হলো—মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মুহাম্মাদ ﷺ দাড়ি রেখেছেন এবং তাঁর উম্মতদেরও দাড়ি রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং অভিভাবকদের, বিশেষত পিতার অন্যতম দায়িত্ব হলো—দাড়ি রাখার ক্ষেত্রে নিজেদের উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করা। সন্তানদের বোঝাতে হবে, রাসূল ﷺ-এর এই সুন্নাহর প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা অবশ্য কর্তব্য।

www.nagorikpathagar.org

বন্ধুত্ব ও সাহচর্য : কিশোর জীবনে উন্নত চরিত্র গঠনের অন্যতম উপাদান হলো উত্তম সাহচর্য। উত্তম বন্ধু বাছাই করার ক্ষেত্রে ইসলাম বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। (সূরা আল ফুরকান : ২৭-৩০)

প্রকৃত বন্ধু খুঁজে বের করা সহজ নয়। পিতা-মাতার কর্তব্য হলো কিশোর সন্তানদের সাহচর্যের ব্যাপারে নজর রাখা এবং প্রয়োজনে যথোপযুক্ত সঙ্গী খুঁজতে সহায়তা করা। সন্তানদের একই ধর্ম, গোত্র কিংবা ভাষাভাষী মানুষের সাথেই বন্ধুত্ব করতে হবে—ব্যাপারটা এমন নয়। ইসলামে গোত্র-ভাষার কোনো সীমারেখা নেই, তবে গুরুত্বপূর্ণ হলো—উন্নত ও নৈতিক চরিত্রবান বন্ধু খুঁজে বের করা।

এক্ষেত্রে কিছু মুসলিম পণ্ডিতের অভিমত হলো—অমুসলিমদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। এর সপক্ষে দলিল হিসেবে তারা কুরআনের এই আয়াত উদ্ধৃত করেন—

> 'হে মুমিনগণ! তোমরা অবিশ্বাসীদের আওলিয়া বা বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না।' সূরা আলে ইমরান : ২৮

মূলত প্রত্যেক মানুষেরই বিভিন্ন ধরনের বন্ধু থাকে। যেমন—ঘনিষ্ঠ বন্ধু, উত্তম বন্ধু, সাধারণ বন্ধু, পরিচিত বন্ধু ইত্যাদি। সহকর্মীরাও এর অন্তর্ভুক্ত। ঘনিষ্ঠ বন্ধু তারা, যাদের সঙ্গে একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়াবলি আলোচনা করা যায়। এই ঘনিষ্ঠ বন্ধু একই প্রকৃতি, সংস্কৃতি ও ধর্মের হওয়া উচিত। এটাই ইসলামের নির্দেশনা।

প্রত্যেকের জীবনেই বন্ধুর প্রয়োজন। কিন্তু তরুণরা যেহেতু চারপাশের সংস্কৃতি ও সামাজিক পারিপার্শ্বিকতার দ্বারা প্রভাবিত হয়, তাই অসৎ বন্ধু তাদের জীবনকে ধ্বংসের কিনারায় নিয়ে যায়। পিতা-মাতার কর্তব্য হলো—বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে পরামর্শ করে ছোটো বয়সেই সন্তানদের এসব সমস্যা সমাধান এগিয়ে আসা। যদি মনে হয় সন্তানরা বখাটে ছেলেদের সাথে মিশে মন্দ কর্মে জড়িয়ে পড়ছে, তাহলে সন্তানদের অসৎ সঙ্গ থেকে দূরে রাখতে পিতা-মাতাকে অবশ্যই কঠোর হতে হবে।

সকলের সাথে সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখার পাশাপাশি মুসলিম নারী-পুরুষ ও ছেলেমেয়েদের উচিত যথাসম্ভব বিপরীত লিঙ্গের সাথে ঘনিষ্ঠ মেলামেশা এবং অন্তরঙ্গ আলাপচারিতা থেকে দূরে থাকা। পাবলিক প্লেসে একত্রিত হলে তাদের উচিত ইসলাম নির্দেশিত শিষ্টাচার অবলম্বন করা। গাইরে মাহরাম নারী-পুরুষের খোশগল্পকেও ইসলামে কঠোর নিষেধ করা হয়েছে। এর সম্ভাব্য কারণ হলো—

www.nagorikpathagar.org

অনাকাঙ্ক্ষিত সম্পর্কের পথ বন্ধ করা। নারী-পুরুষের একান্ত সময় কাটানো একসময় বিবাহবহির্ভূত যৌন সম্পর্কের দিকে ধাবিত করে। তবে সামাজিক বাস্তবতা ও একাডেমিক কারণে শালীনতা বজায় রেখে ছেলেমেয়েরা জনসম্মুখে সাক্ষাৎ করতে পারে।

বিদ্যালয় ও ক্যারিয়ার : ছেলেমেয়েরা যখন বয়ঃসন্ধিকালে পৌঁছায়, তখন তাদের অধিকাংশই মাধ্যমিক পর্যায়ে অধ্যয়ন করে। এটি তাদের ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ারের শুরু। এই সময়ে সন্তানদের জন্য উপযুক্ত বিদ্যালয় বাছাইয়ের ক্ষেত্রে অভিভাবকরা দোটানায় পড়ে যান এবং এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে তাদের অনেক সময় ব্যয় করতে হয়।

পিতা-মাতার কর্তব্য হলো—নিজেদের সামর্থ্যানুযায়ী সন্তানদের জন্য যথাসম্ভব উন্নত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বাছাই করা। আশেপাশের এলাকায় তুলনামূলক কম দূরত্বে অবস্থিত সামর্থ্যের মধ্যে ভালো মানের সমৃদ্ধ ইসলামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনেক অভিভাবকদের প্রথম পছন্দ। যে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান, শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা রক্ষায় এবং বর্ণবাদ ও ইসলামভীতি দূরীকরণে যথেষ্ট পরিমাণ বিশ্বাসযোগ্যতা নেই, অভিভাবকদের উচিত সেগুলো এড়িয়ে চলা।

বাছাইকৃত বিদ্যালয় অবশ্যই এমন একটি স্থানে ও পরিবেশে অবস্থিত হতে হবে, যা সন্তানদের একটি সফল এবং উপযুক্ত ক্যারিয়ার অর্জনে উৎসাহিত করে। কারণবশত কোনো অভিভাবক যদি সন্তানদের পড়াশোনায় সাহায্য করতে অপারগ হয়, এই ক্ষেত্রে একটি আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অত্যধিক।

একজন তরুণ ক্যারিয়ারের শুরুতে যে সিদ্ধান্ত নেয়, তা তার পরবর্তী জীবনে প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। এই সকল সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে মুসলিম তরুণদের শুধু বৈষয়িক সফলতা ও সম্মানের দিকে লক্ষ রাখলেই হবে না; বরং তাদের উচিত এমন ক্যারিয়ার বাছাই করা, যা তাদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে হালাল উপার্জনে সহায়তা করবে। সমাজকে কিছু দেওয়া, সমাজের উপকারের জন্য কিছু করা এবং এক সফল পরকালীন জীবন প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করার দিকে সবার আগে নজর দেওয়া উচিত। মুসলমিদের ক্ষেত্রে দীর্ঘকালীন ক্যারিয়ার কিংবা সংক্ষিপ্তকালীন অস্থায়ী চাকরি হিসেবে অ্যালকোহল, মাদক, পর্নোগ্রাফি কিংবা সুদের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া নিষিদ্ধ। এগুলো সরাসরি হারাম কার্য সম্পাদন করতে উৎসাহিত করে। অসৎ উপায়ে, ঘুস গ্রহণ, জুয়া খেলে, প্রতারণা করে কিংবা জমাকৃত অর্থের সুদ গ্রহণের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করাও হারাম।

www.nagorikpathagar.org

রাসূল ﷺ তাঁর উম্মতের জন্য দরিদ্রতার ভয় করেননি; বরং পার্থিব সম্পদের ব্যাপারে ভয় করেছেন। এই জন্য উম্মাহর যুবকরা যেন বৈষয়িক লালসায় লালায়িত ও মোহগ্রস্ত না হয়, সেদিকে নজর রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুসলিম যুবকদের উচিত সমাজ কর্তৃক প্রদত্ত কোনো আর্থিক সাহায্য কিংবা অনুদানের ওপর নির্ভরশীল না হওয়া। তাদের উচিত এগুলো থেকে যথাসম্ভব বিরত থাকা, যতক্ষণ না তারা অতি প্রয়োজনের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। সৎ উপায়ে উপার্জন, বিনিয়োগ ও ব্যয় একজন প্রকৃত মুসলিম হিসেবে জীবন পরিচালনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আর্থিক বিষয় : অতিমাত্রায় স্বাধীনতার কারণে ছেলেমেয়েদের অল্প বয়সেই অর্থ উপার্জনের বিষয়টি সামনে চলে আসে। কিশোররা কি অর্থ উপার্জন করবে? করলে কোন বয়সে? তারা কি নিজেদের ব্যয় বহন করবে? এই সকল প্রশ্নের উত্তর কেবল পরিবার তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা মাথায় রেখেই দিতে পারবে। একটি হতদরিদ্র পরিবারের জীবনধারণের ন্যূনতম ব্যয় নির্বাহের জন্য কিশোর সন্তানদের অর্থ উপার্জনের দিকে ঠেলে দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না; যদিও পরিবারকে সুন্দরভাবে চলার জন্য সহায়তা করা সবার কর্তব্য। তবে পরিস্থিতি যাহোক, বৈষয়িক কিংবা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কিশোরদের শিক্ষা অর্জনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। অনেক অথর্ব ও মূর্খ অভিভাবক রয়েছে, যারা অতি তাড়াতাড়ি অর্থ উপার্জনের লক্ষ্যে সন্তানদের ক্যারিয়ার নষ্ট করে। এর মাধ্যমে তারা মূলত নিজেদের জীবনও নষ্ট, সমাজের ভবিষ্যৎও ধ্বংস করে।

তরুণদের উচিত অর্থের গুরুত্ব বোঝা এবং তা যথাযথভাবে খরচ করতে শেখা। তরুণদের দায়িত্ববান করে গড়ে তুলতে এবং আর্থিক অবস্থার গুরুত্ব বোঝাতে সাপ্তাহিক ছুটি বা গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে পার্ট-টাইম কাজ করা ভালো ফলাফল বয়ে আনতে পারে। এটা তাদের মধ্যে দায়িত্ববোধ ও আর্থিক অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করে। তবে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে, এটি যেন কোনোভাবেই তাদের শিক্ষা অর্জনে ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে এবং স্বপ্ন বাস্তবায়নে বাধা না হয়ে দাঁড়ায়।

ব্যক্তিগত দুর্বলতার ব্যাপারে সচেতনতা

সন্তানরা যখন কিশোর বয়সে পদার্পণ করে, তখন তারা অভিভাবকদের সাথে সময় কাটানোর পরিবর্তে টেলিভিশন, কম্পিউটার, মোবাইল অথবা বন্ধু-বান্ধবের সাথে সময় কাটাতে অধিক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। এই সকল ক্ষেত্রে পিতা-মাতা

www.nagorikpathagar.org

কিংবা অন্য কোনো দায়িত্বশীল অভিভাবকের পক্ষ থেকে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ না করা হলে কিশোররা অপসংস্কৃতির ছোবলে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। আধুনিক সমাজ স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে—এমন অনেক আচরণ ইসলামি জীবনধারার সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। যে সকল অভিভাবক সন্তানদের কিশোর বয়সে পরিচর্যা করতে অলসতা প্রদর্শন করে কিংবা তাদের যথাযথভাবে পথ প্রদর্শনে ব্যর্থ হয়, তারা কিশোর সন্তানদের নিম্নোক্ত এক বা একাধিক সমস্যায় নিপতিত হতে দেখবে।

অহংকারিতা : কিশোর বয়সে শিশুরা সাধারণত দুটি বিপরতীমুখী চরিত্রের অধিকারী হয়; একটি তাদের বহির্মুখী চরিত্র, অপরটি অন্তর্মুখী। অর্থাৎ এই বয়সের শারীরিক ও অন্যান্য পরিবর্তনের কারণে তাদের মধ্যে একধরনের ইতস্ততভাব বিরাজ করে। এই ইতস্ততভাব তাদের মধ্যে আত্মকেন্দ্রিক আচরণের মানসিকতা সৃষ্টি করতে পারে। টেলিভিশন, কম্পিউটার কিংবা অন্যান্য প্রযুক্তিগত বিষয়াবলির দ্বারা অতিমাত্রায় প্রভাবিত হওয়ার ফলে তারা পরিবারের সাথে সময় কাটানো এবং সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকতে পারে। যে সকল তরুণের কোনো সহোদর কিংবা কাছের বন্ধু নেই, তারা নিঃসঙ্গতায় ভোগে। অভিভাবকদের অদক্ষতা কিংবা উদাসীনতা এই সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। সন্তানরা যদি পরিবার ও সমাজের সাথে সম্পর্ক রক্ষায় ব্যর্থ হয়, তাহলে তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মানসিক সমস্যা দানা বাঁধে এবং তারা নানান খারাপ অভ্যাস ও সামাজিক রোগের শিকার হয়।

অভদ্রতা ও অসদাচরণ : অভদ্র কথা ও খারাপ ভাষা পরিবারের সদস্যদের মধ্যকার সম্পর্ক দুর্বল করে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত বাড়িয়ে দেয়। এজন্য সন্তানদের মধ্যে অবশ্যই জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। অপ্রয়োজনীয় কিংবা মন্দ কথা বলার চেয়ে চুপ থাকাই উত্তম। কারণ, এটা পরবর্তী সময়ে অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু বয়ে আনতে পারে। হৃদ্যতা, সহমর্মিতা, উত্তম বচনভঙ্গি ও হাস্যোজ্জ্বলপূর্ণ পরিবেশেই একজন মানুষের স্বাভাবিক বিকাশ ঘটতে পারে। অপরদিকে রাগ, অসদাচরণ, ক্রোধ ও হতাশাপূর্ণ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কিশোর অপ্রীতিকর ও ক্ষতিকর মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে। যে সকল পিতা-মাতা নিজেদের মধ্যে কথা বলার ক্ষেত্রে ভদ্রতা বজায় রাখেন এবং জটিল মুহূর্তেও সন্তানদের সাথে কুরুচিপূর্ণ ব্যবহার পরিহার করেন, তারা সন্তানদের মধ্যেও এই আচরণের প্রভাব দেখতে পান। সন্তানদের মাঝে যদি বদমেজাজ ও অসদাচরণের বৃদ্ধি ঘটে, তাহলে দ্রুততা ও সতর্কতার সাথে এগুলোকে শক্ত হাতে দমন করতে হবে। সন্তানদের আচার-আচরণ শিক্ষা দেওয়া এবং আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে কোনোভাবেই রাগান্বিত হওয়া যাবে না।

www.nagorikpathagar.org

অরুচিকর স্টাইল ও ফ্যাশন : বর্তমান সময়ে অরুচিকর ফ্যাশন ও স্টাইলের অন্ধ অনুসরণ খুবই সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ধরনের উন্মাদনার পেছনের কারণ কী?

আত্মমর্যাদাবোধ ও স্বমূল্যবোধ প্রত্যেক মানুষের সমৃদ্ধির অন্যতম মাধ্যম, যা জীবনকে উপভোগ্য করে তোলে। অনেকে জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক, শরীরে বিভিন্ন জায়গায় ফুটো করে, ট্যাটু ব্যবহার করে কিংবা অদ্ভুত চুলের স্টাইলের মাধ্যমে অন্যের সামনে নিজেকে জাহির করতে চায়। এই সমস্ত চলাফেরার মাধ্যমে তারা চায় বিপরীত লিঙ্গকেও আকৃষ্ট করতে। অনেকে এগুলোর মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ, আত্মপরিচয় অর্জন কিংবা সমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চায়।

বিশ্বাসীদের আত্মসম্মানবোধ, পরিচয়বোধ ও জীবনের অর্থ নির্ধারিত হয় তাদের বিশ্বাস, আল্লাহর সম্পর্কে জ্ঞান এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের প্রচেষ্টার ওপর ভিত্তি করে। ইসলামে পোশাক, নৈতিকতা ও আচার-আচরণের নির্দিষ্ট বিধান রয়েছে—যা মুসলিমদের জীবনকে করে সৌন্দর্যমণ্ডিত। এ সকল বিধান পালনের মাধ্যমে একজন মুসলিম সন্তোষজনক উপায়ে মর্যাদা ও আভিজাত্যের সাথে নিজের জীবন পরিচালনা করতে পারে।

তরুণ-তরুণীরা সাধারণত বুঝতে পারে না, অরুচিকর ফ্যাশনের অনুকরণে পোশাক পরিধান এবং এর মাধ্যমে বিপরীত লিঙ্গকে আকৃষ্ট করার আত্মতুষ্টি খুবই ক্ষণস্থায়ী। এর ফলে শালীনতা ও আত্মমর্যাদার বিপর্যয় ঘটে। আর এতে অতিমাত্রায় অর্থ উপার্জনকারী ফ্যাশন ইন্ড্রাস্ট্রিগুলোর কোনো যায়-আসে না। মুসলিম অভিভাবকগণকে এই ব্যাপারে অবশ্যই সচেতন হতে হবে।

মিথ্যাবাদিতা ও প্রতারণা : সত্য কথা বিপদ ডেকে আনতে পারে, এই ভয়ে অনেক মানুষ মিথ্যা বলে। একটি কিশোরের চোখে পৃথিবীটা ভিন্ন ধরনের। তারা বিভিন্ন ব্যাপারে কল্পনা করতে, স্বপ্ন দেখতে কিংবা দৃষ্টিগোচর করতে পারে। এই ব্যাপারে অন্যদের বলতে সংকোচ বোধ করে। কিশোররা যেহেতু পরিবর্তনের সময়ের মধ্য দিয়ে যায়, সেহেতু তাদের মধ্যে কোনো কিছু গোপন করা, মিথ্যা কথা বলা কিংবা প্রতারণা করার মতো বিভিন্ন নেতিবাচক অভ্যাসের বিকাশ হতে পারে। এগুলোর অনেক কারণ রয়েছে, যা নিচে উল্লেখ করা হলো—

- মজা করা, খেলার ছলে কিংবা কাউকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য।
- নিজেদের ভালো মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করা।
- পিতা-মাতা থেকে কোনো কিছু আদায় করা কিংবা তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা।

www.nagorikpathagar.org

- সমস্যা এড়িয়ে চলা কিংবা কারও রাগ থেকে রক্ষা পাওয়া।
- নির্মোহ সত্যের মুখোমুখি হওয়া থেকে বিরত থাকা।
- নিজেদের ভেতর জেগে উঠা উদ্ভট কল্পনাকে জিইয়ে রাখা।
- প্রতারণার মাধ্যমে আত্মবিশ্বাস জিইয়ে রাখার চেষ্টা করা, যেহেতু তারা ব্যর্থতাকে বরণ করতে পারে না।
- নিজেদের মন্দ আচার-আচরণের পরিণতি ভোগ থেকে পার পাওয়া।
- অন্যের কাছে নিজেকে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে উপস্থাপন করা।
- ভালো পুরস্কার অর্জন করা ইত্যাদি।

সমস্যা মোকাবিলার ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে এবং অভিভাবকদের অবশ্যই খেয়াল রাখা জরুরি, এগুলো তাদের ব্যক্তিগত আচরণের প্রভাব কি না। এমন হলে সমস্যা আরও প্রকট হয়ে উঠবে। স্বচ্ছ ও স্বাস্থ্যকর পারিবারিক পরিবেশে মিথ্যা ও প্রতারণার কোনো সুযোগ থাকে না। মিথ্যাকে দ্রুততা ও সচেতনতার সাথে মোকাবিলা করতে হবে এবং সন্তানদের শিক্ষা দিতে হবে—এটি এক মারাত্মক মানবিক বিপর্যয়, যা ইসলামে চরমভাবে নিষিদ্ধ। মিথ্যা সকল পাপের মূল এবং মুনাফিকের সবচেয়ে বড়ো আলামত।

'মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি—

১. কথা বললে মিথ্যা বলে

২. শপথ করলে ভঙ্গ করে

৩. কোনো কিছুর আমানত দিলে আমানতের খেয়ানত করে।' সহিহ বুখারি

অবাধ্যতা ও বিদ্রোহী মনোভাব : প্রায় ক্ষেত্রেই কিশোররা নিজের ভেতরের হতাশা ও ক্রোধকে স্পষ্ট করে বলতে পারে না। কথা বলার সময় তারা অন্য কারও কথায় কর্ণপাত করতে চায় না। ফলে তাদের রাগের মাধ্যমে অবাধ্যতা ও বিদ্রোহী আচরণের প্রকাশ পায়। এটি সহজেই বোধগম্য, যখন পিতা-মাতা সন্তানদের মাঝে বিভিন্ন ধরনের আচরণগত সমস্যা দেখতে পান, তখন স্বাভাবিকভাবেই অনেক চিন্তিত হয়ে পড়েন। তবে এই সকল ক্ষেত্রে আমাদের চিন্তাশীলতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এই ধরনের আচরণের নিয়ামক ও কারণ কী? বাসার পরিবেশ কিংবা পিতা-মাতার আচরণ কি এই সমস্যা সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখছে? এই ধরনের আচরণ বন্ধে অভিভাবকদের কী করা উচিত? এ সকল প্রশ্নের উত্তর জানা একজন অভিভাবকের কর্তব্য।

www.nagorikpathagar.org

আমাদের অবশ্যই মন্দ আচরণের ক্ষেত্রে সাবধান থাকতে হবে এবং স্মরণ রাখতে হবে, আল্লাহ পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তির আচরণ সহ্য করছেন এবং তাদের প্রতি প্রতিনিয়ত দয়া বর্ষণ করেছেন। যে ধরনের অন্যায়-ই করুক না কেন, সন্তানদের সাথে এমন রূঢ় আচরণ করা যাবে না, যা সন্তান ও অভিভাবকের মধ্যকার সম্পর্ক বিনষ্ট করে কিংবা তাদের মাঝে বিদ্রোহী মনোভাব জাগ্রত করে। অভিভাবকদের মাঝে সহিষ্ণুতা, রাগ প্রশমন ও নিয়ন্ত্রণের যোগ্যতা অবশ্যই থাকতে হবে। সন্তানদের সাথে সব সময় খোলামেলা আলোচনা ও যোগাযোগ রক্ষা করা জরুরি।

মানসিক স্বাস্থ্য ও আত্মহনন : নিজের ক্ষতিসাধন সমাজের অন্যতম প্রধান সমস্যা। Mental Health Foundation (MHF)-এর গবেষণা অনুযায়ী—১১ থেকে ২৫ বছর বয়সি তরুণদের প্রতি ১৫ জনের একজন আত্মহনন বা নিজের ক্ষতিসাধন করে। এটি একটি সংকটজনক ব্যাপার। এর ওপর যদিও অনেক গবেষণা হয়েছে, কিন্তু সমাজের অনেকেই এ ব্যাপারে কিছুই জানে না। বেঁচে থাকার আকুতি এবং অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা মানুষের স্বভাবজাত প্রকৃতি। তাই যখন কেউ এই স্বভাজাত প্রকৃতির বিরুদ্ধে গিয়ে আত্মহনন বা আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়, তখন অবশ্যই প্রতীয়মান হয়—আত্মহননের জন্য মানসিক ও আর্থ-সামাজিক অনেক কারণ রয়েছে। এই কারণগুলোর জন্য মানুষ নিজের জীবনকে অর্থহীন মনে করে এবং নিজের ক্ষতিসাধন করে।

শৈশবের কোনো দুঃসহ স্মৃতি যেমন : শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, যৌন নিপীড়ন ইত্যাদির পাশাপাশি নিম্নোক্ত কারণে একজন মানুষ আত্মহুতির পথ বেছে নিতে পারে—

- অবহেলার শিকার হওয়া
- ভালোবাসার মানুষের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া
- হুমকি বা নির্যাতনের শিকার হওয়া
- পরিবার ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া।

নিজের ক্ষতিসাধন করা বা নিজেকে আহত করার অনেক উপায় রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রচলিত উপায় হলো—শরীরে কোনো অঙ্গ কাটা অথবা পোড়ানো। অন্যান্য উপায়ের মধ্যে আছে অতিরিক্ত ওষুধ গ্রহণ, চুল উপড়ে ফেলা, চামড়ার ক্ষতিসাধন এবং শক্ত কিছুর সাথে নিজ মাথাকে আঘাত করা ইত্যাদি। অনেক তরুণ আবার একেক সময় একেক পদ্ধতি অবলম্বন করে।

www.nagorikpathagar.org

কিশোররা জীবনের কঠিন মুহূর্তে যদি যথাযথ সমর্থন কিংবা সৌহার্দ্যপূর্ণ মানসিক সহযোগিতা না পায়, তাহলে তারা আত্মসম্মানবোধ হারিয়ে ফেলে, যা তাদের মধ্যে রাগ ও হতাশার সৃষ্টি করে। এর ফলে তারা নিজের ক্ষতিসাধন করে এবং নিজেকে দোষ দিতে থাকে। যেকোনো কারণেই হোক, নিজের ক্ষতিসাধন ইসলামি ভাবধারার বিপরীত। আল্লাহ্ বিপদের মাধ্যমে মানুষের পরীক্ষা নেন এবং বিপদে ধৈর্যধারণকারীদের জন্য বিশাল পুরস্কার ধার্য করেন। (সূরা বাকারা : ১৫৫-১৫৬)

ধৈর্যশীলতা আসে আল্লাহর প্রতি অগাধ আস্থা ও বিশ্বাস থেকে, যা ইসলামের যথাযথ জ্ঞান ও উপলব্ধির মাধ্যমে তৈরি হয়। এর ফলে ব্যক্তি আল্লাহর যেকোনো সিদ্ধান্তকেই নিজের জন্য কল্যাণজনক মনে করে। যদি মুসলিম পিতা-মাতা সন্তানদের আদর-যত্ন ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে লালন-পালন করে, তাহলে ইনশাআল্লাহ, নিজের ক্ষতি করার বিষয়টি কোনোভাবেই তাদের মাঝে আসবে না। সন্তানদের কঠিন মুহূর্ত ও হতাশাজনক অবস্থা মোকাবিলায় অভিভাবকদের জিম্মাদারি গ্রহণ করা জরুরি। এই সময়ে তাদের জন্য সর্বোচ্চ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।

খাদ্য গ্রহণে অস্বাভাবিকত্ব : খাদ্য গ্রহণে অস্বাভাবিকত্ব হলো—খাওয়ার সাথে অস্বাভাবিক সম্পর্ক। ওজন কমানোর লক্ষ্যে এটা করলে শরীর ও মন উভয়ের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এ Disorder দুভাবে হয়ে থাকে : একটি Anorexia Nervosa এবং অপরটি Bulimia। Anorexia Nervosa এমন একটি অবস্থা, যখন কোনো ব্যক্তি চিকন হওয়ার জন্য চেষ্টা করে। তারা দুশ্চিন্তায় থাকে—যেকোনো ধরনের খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করলে তারা মোটা হয়ে যাবে। ফলে তারা নিয়মিত খাবার গ্রহণ থেকে মাত্রাতিরিক্তভাবে বিরত থাকে। Anorexia-তে অভ্যস্ত হওয়ার তাদের অস্বাভাবিকভাবে চিকন দেখায়। Bulimia এমন এক অবস্থাকে বলা হয়, যখন কোনো ব্যক্তি প্রচুর খাদ্য গ্রহণ করতে চায়। কিন্তু বিশ্বাস করে, খাদ্য গ্রহণ শরীরের ওজন বাড়িয়ে দেয় এবং অতিরিক্ত ওজন বৃদ্ধি তাদের শারীরিক সৌন্দর্য নষ্ট করে। ফলে তারা অতিরিক্ত খাবার খেয়েও নিজেদের চিকন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর মেডিসিন গ্রহণ করে থাকে। এই সকল অভ্যাস তাদের আস্থার চরম অবনতি ঘটায়। Anorexia সাধারণত মধ্যবয়সি কিশোর-কিশোরীদের মাঝে দেখা যায় এবং Bulimia-এর কিছু পরেই শুরু হয়। এই দুটো সমস্যা সাধারণত ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের মধ্যেই বেশি দেখা যায়।

www.nagorikpathagar.org

খাদ্য গ্রহণে অস্বাভাবিকতার কারণ খুবই জটিল, যা সহজেই বোধগম্য নয়। একজন পরিপূর্ণ নারী হিসেবে বেড়ে উঠার অনুভূতি একজন মেয়ের মধ্যে এমন অভ্যাস গড়ে তোলে, যার প্রভাবে সে অস্বাভাবিক উপায়ে শরীরে কচিকাচার ভাব রাখার প্রচেষ্টা চালায়। সমাজে স্লিম শরীরের নারীদের আদর্শ মনে করা হয়। এই কারণে তরুণীরা স্লিম শরীরের অধিকারী হওয়ার জন্য প্রবল প্রচেষ্টা চালায়। এগুলোর কারণে তারা শারীরিক সমস্যার পাশাপাশি মানসিক সমস্যারও সম্মুখীন হয়। অভিভাবকদের জন্য এটি বোঝা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার, কেন তাদের সন্তানরা খাদ্য-পানীয় গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করে। তবে সন্তানরা খুব ভালোভাবেই বিশ্বাস করে, খাদ্য গ্রহণের ফলে তারা মোটা হয়ে যাবে এবং শরীরের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলবে।

অভিভাবকরা পরিবারে হালাল ও স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণের পরিবেশ তৈরি করতে পারেন, ভারসাম্যপূর্ণ ডায়েটের ব্যবস্থা করতে পারেন, যা সন্তানদের স্বাস্থ্যসম্মত খাবার গ্রহণে উৎসাহিত করতে পারে। বয়ঃসন্ধিকালের সময় কারও শরীর নিয়ে মন্তব্য করা মোটেই সন্তোষজনক নয়। পরিবারের সবাই যদি অন্তত একবেলা একসঙ্গে খাবার খায়, তাহলে এই ধরনের সমস্যা আগেই ধরে ফেলা যায় এবং দ্রুততার সাথে তা সমাধান করা যায়।

কঠিন বিষয় মোকাবিলা করার উপায়

ছেলেমেয়েদের স্বাতন্ত্র্য উপায়ে বেড়ে উঠার জন্য অভিভাবকদের নিশ্চিত করতে হবে, তারা যেন স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে—

- নিজেদের একজন পরিপূর্ণ পুরুষ ও নারী হিসেবে মেনে নেয়
- পরিবার ও নিকটাত্মীয়দের সঙ্গে মানিয়ে নেয়
- পৃথিবীর হাজারো মানুষের ভিড়ে নিজের অবস্থান খুঁজে নেয়।

সকল কিশোর একইভাবে বেড়ে উঠে না। কেউ খুব স্বাভাবিকভাবে ও নির্বিঘ্নে বয়ঃসন্ধিকাল পার করে, আবার কেউ খুব অস্থিরতার মধ্য দিয়ে এই সময়টা পার করে। তরুণরা তাদের কৈশোর বয়সে উচ্ছৃঙ্খল, অস্বাভাবিক আচরণ, হতাশা, অমনোযোগিতা, অলসতা ও দেরিতে ঘরে ফেরা ইত্যাদি অভ্যাসের মাধ্যমে পিতা-মাতার সামনে এক যুদ্ধক্ষেত্র হাজির করে। একটি সুস্থ পারিবারিক পরিবেশ, পরিবার ও সমাজে ইসলামি সংস্কৃতির অনুসরণ, উত্তম ও বিশ্বাসযোগ্য বন্ধু, পিতা-মাতা ও শিক্ষকদের পক্ষ থেকে প্রশংসাসূচক আচরণ—এই সকল

www.nagorikpathagar.org

সমস্যা সফলতার সঙ্গে মোকাবিলার অন্যতম উপাদান। একটি অতি উদার ও অবাধ স্বাধীনতার সমাজে পিতা-মাতারা রক্ষণশীল হতে চান। কিন্তু ইসলামি সীমারেখার মধ্যে সন্তানদের যথেষ্ট স্বাধীনতা প্রদান না করার ফলাফল বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নেতিবাচক হয়। নিম্নোক্ত প্রায়োগিক ও পরীক্ষিত পরামর্শ বয়ঃসন্ধিকালের ক্ষেত্রে খুবই কার্যকর—

সহমর্মিতা ও সৌহার্দ্যতা প্রদর্শন : বর্তমান সময়ের কিশোররা বিভিন্ন ধরনের চাপে পিষ্ট। ছেলেমেয়েরা সামাজিক প্রচলনের অনুসরণ, সেলিব্রেটি মডেলদের প্রশংসা করা এবং নিত্য-নতুন সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে চরম আগ্রহী। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও আচার-আচরণে এর ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

এই সকল পরিস্থিতিতে কিশোরদের এমন সঙ্গের প্রয়োজন, যা তাদের সহমর্মিতা জোগাবে। এই ক্ষেত্রে পিতা-মাতাই সন্তানদের আদর্শ সঙ্গী। পৃথিবীতে সন্তানদের সঙ্গে কী ঘটছে, সে ব্যাপারে তা পিতা-মাতাকে ভালোভাবে বোঝাতে এবং সন্তানদের মঙ্গলের জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ নিতে হবে। সন্তানদের এমন কাউকে প্রয়োজন, যে তাদের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেবে, তাদের সঙ্গে বন্ধুসুলভ আচরণ করবে এবং পথনির্দেশ করবে।

অবিরত অসদাচরণের মধ্যে বড়ো হওয়া কিশোরকে আদর-স্নেহের অনুভূতি বোঝানো কোনো সহজ বিষয় নয়। তারপরও এটি কিশোরদের এমন একটি সময়—যখন তাদের সহমর্মিতা পাওয়া খুবই দরকার। শর্তহীন সীমাহীন ভালোবাসা অর্জন এবং নিজেদের সীমা-পরিসীমা জ্ঞাত হওয়ার মাধ্যমে সন্তানরা দারুণভাবে উপকৃত হয়। যথাযথ উপায়ে সময় কাটানোর ফলে পিতা-মাতার সঙ্গে তাদের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয়। পিতা-মাতার সঙ্গে কথা বলা, হাসি-ঠাট্টা করা, আলিঙ্গন করা এবং তাদের সাহচর্য পাওয়া কিশোর-মনের প্রয়োজন পূরণে ব্যাপক অবদান রাখে।

ব্যক্তিগত ও একান্তে সময় কাটানোর সুযোগ : গোপনীয়তা অবলম্বন এবং ব্যক্তিগত সময় কাটানোর ক্ষেত্রে তাদের যথেষ্ট সুযোগ দিতে হবে। কিশোররা হঠাৎ করেই আত্মসচেতন হয়ে পড়ে। ফলে তাদের শরীর ও মনের ব্যাপারে গোপনীয়তা অবলম্বনের সুযোগ এবং একান্ত সময়ের প্রয়োজন—যাতে তারা চিন্তা করতে এবং নিজেদের মতো করে নিজেদের গড়ে তুলতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই পরিবারের সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের জন্য আলাদা কক্ষ বরাদ্দ রাখা উচিত। যদি তাও না হয়, বয়ঃসন্ধিকালের পূর্বে ভাই-বোনদের কক্ষ আলাদা করা উচিত। সন্তানদের বয়স ও উপযুক্ততার ওপর তাদের গোপনীয়তার বিভিন্ন পর্যায় নির্ভর করে।

www.nagorikpathagar.org

সন্তানরা কক্ষে কী করে এবং সেখানে কী রাখে, এই ব্যাপারে বুদ্ধিমত্তার সাথে পিতা-মাতার সচেতন হওয়া প্রয়োজন। কম্পিউটার, ল্যান্ডফোন ও টেলিভিশন অবশ্যই খোলামেলা জায়গায় পরিবারের সকলের জন্য উপযুক্ত স্থানে স্থাপন করতে হবে। এগুলো কারও ব্যক্তিগত কক্ষে স্থাপন করা যাবে না; যেখানে এগুলোর অপব্যবহার হতে পারে। মোবাইল ব্যবহারের ক্ষেত্রে সীমারেখা নির্ধারণ করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

সম্মানজনক আচরণ : পরিবারের মাঝে সদাচরণের সংস্কৃতি সন্তানদের অপরের সাথে সম্মানজনক আচরণে উদ্‌বুদ্ধ করে। শান্তির সম্ভাষণ 'আসসালামু আলাইকুম' পারস্পরিক সম্মান প্রদর্শনের শিক্ষা দেয়। কারও কক্ষে প্রবেশের ক্ষেত্রে অনুমতি প্রার্থনা ইসলামি শিষ্টাচারের অংশ। বিশেষ করে কিশোরদের জন্য এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সকল ব্যাপারে অভিভাবকদের উচিত রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহর অনুসরণ করা এবং তা সন্তানদের শিক্ষা দেওয়া। সন্তানদের সম্মান দেওয়ার ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ-এর আচরণ উম্মতের জন্য উদাহরণস্বরূপ। তিনি নিজের বিবাহিত কন্যা ফাতিমা রা.-কে সম্ভাষণ জানানোর জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন এবং তাঁর বসার জন্য নিজের কাপড় বিছিয়ে দিতেন।

মধ্যমপন্থা অবলম্বন : পিতা-মাতা ও সন্তানদের মাঝে সম্পর্কের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্বেচ্ছাচারী অভিভাবক সন্তানদের ওপর নিজেদের মতামত ও ইচ্ছা চাপিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে সন্তান ও নিজেদের বিপদ ডেকে আনে। তাদের অতি নিয়ন্ত্রণমূলক আচরণ সন্তানদের গতিশীলতা ও সৃষ্টিশীলতা ধ্বংস করে দেয়। ফলে সন্তানদের মধ্যে ক্রোধের জন্ম নেয়, যা পরবর্তী সময়ে বিদ্রোহী আচরণে রূপ নিতে পারে। অন্যদিকে উদাসীন অভিভাবকরা অতি প্রয়োজনের সময়েও সন্তানদের আচার-আচরণে হস্তক্ষেপ করে না; এরা হয় অতিমাত্রায় উদার কিংবা সন্তানদের ব্যাপারে উদাসীন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগেই তারা সন্তানদের পরিপক্ব মনে করে। এগুলো কিশোরদের জীবনে মৌলিক নিয়মানুবর্তিতা থেকে বিচ্যুতি ঘটায়। এই উত্তরাধুনিকতার যুগে এই সকল অতি উদার মনোভাব কিশোরদের জীবনে ধ্বংসাত্মক পরিণতি ডেকে আনে।

কঠোরতার সাথে বা কোমলতা অথবা কড়া আচরণের সাথে নরম আচরণ (Carrot and Stick) খুবই গুরুত্বপূর্ণ পন্থা, যা শিক্ষাবিদ ও মনোবিজ্ঞানীরা কিশোরদের শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যবহার করার পরামর্শ দেন। যেকোনো কাজ সম্পাদন করার ক্ষেত্রে ইসলাম মধ্যমপন্থার মূর্ত প্রতীক। মুহাম্মাদ ﷺ সব সময় মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতেন। যথাযথ ও ইনসাফপূর্ণ আচরণের ওপর অভিভাবকত্বের সফলতা নির্ভর করে।

www.nagorikpathagar.org

উঠতি বয়সের তর্ক-বিতর্ক এড়িয়ে চলা : যে সকল পরিবারে একই বয়সের ভাই-বোন রয়েছে, যেখানে সহোদরদের মধ্যে ঝগড়া খুবই স্বাভাবিক বিষয়। সহোদররা কীভাবে সময় কাটায়, তাদের সময়কে কীভাবে উপভোগ করে এবং কীভাবে বিশ্রাম নেয়—সকল কিছুর দিকে খেয়াল রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শৈশবকালে সঠিক উপায়ে এই সমস্ত কাজ সম্পাদনে উৎসাহিত করতে হবে। তারা যুক্তি, পালটা যুক্তি, চিৎকার-চ্যাঁচামেচি এবং বিভিন্ন বিষয়ে পারস্পরিক বিতর্কের মধ্যে দিয়ে একে অন্যের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখে। কথাবার্তা, হাসি-ঠাট্টা, অভিযোগ ও কান্নাকাটির মাধ্যমে তারা পরিবারকে মাতিয়ে তোলে। সন্তানদের এই সমস্ত আচরণ মাতা-পিতার নিকট অনেক সময় কষ্টকর মনে হতে পারে। তবে শাসন করার খুব বেশি প্রয়োজন না হলে তাদের আচার-আচরণে হস্তক্ষেপ না করে অভিভাবকদের উচিত সন্তানদের নিজের মতো করে চলতে দেওয়া। হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হলে মাতা-পিতাকে পক্ষপাতিত্ব থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। বিভিন্ন বিষয়ে সাধারণত বড়ো সন্তানের ওপর দোষ চাপানো হয় এবং ছোটোরা পিতা-মাতার অধিক সহমর্মিতা পেয়ে থাকে। এই বিষয়টি খেয়াল রাখা দরকার। ছোটোদের স্নেহ করা এবং বড়োদের সম্মান করার শিক্ষা বাচ্চাদের দিতে হবে। অন্য সকল জটিলতার মতো সহোদরদের মধ্যকার বিরোধও একসময় কেটে যাবে এবং এটি মায়াবী ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্কে রূপ নেবে, ইনশাআল্লাহ।

জীবনের অর্থবহ দিকগুলোতে সন্তানদের অংশগ্রহণ : উদ্দেশ্যহীনভাবে জীবনের পেছনে না ছুটে অর্থবহ জীবন পরিচালনা করতে সন্তানদের উদ্‌বুদ্ধ করতে হবে, যাতে তরুণরা পরবর্তী জীবনে নিজেদের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হয়। বর্তমানে অনেক উন্নতমানের নির্ভরযোগ্য সংঘ, ক্লাব ও সংস্থা রয়েছে। এর পাশাপাশি অনেক সংগঠনও রয়েছে—যেগুলো সমাজে পারস্পরিক সহাবস্থান, ইতিবাচক পরিবর্তন এবং অপরের সেবা প্রদানে উৎসাহিত করে। দায়িত্ব পালনে সক্রিয় ভূমিকা রাখার জন্য মুসলিম তরুণদের উৎসাহিত করতে হবে। অভিভাবকদের উচিত ভারসাম্যপূর্ণ সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলিতে পরিপূর্ণ কোনো সংঘ খুঁজে পেতে সন্তানদের সাহায্য করা—যাতে তারা একজন সক্রিয় মুসলিম নাগরিক হিসেবে নিজের জীবনে উন্নতি লাভ করতে পারে।

সুস্থ বিনোদনের ব্যবস্থা : কারও শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে বিনোদন অপরিহার্য। মানবজাতি যন্ত্রের মতো কাজ করতে পারে না। যথাযথ উপায়ে কাজ করার ক্ষেত্রে আমাদের শরীর ও মনের বিশ্রামের প্রয়োজন। অর্থহীন বিনোদন মন ও আত্মার কোনো কাজেই আসে না; মাদকদ্রব্যের ব্যবহার শরীরকে ধ্বংস করে দেয়। ইন্দ্রিয়পরায়ণতা আধ্যাত্মিক অনুভূতি বিনষ্ট করে দেয়।

www.nagorikpathagar.org

মুহাম্মাদ ﷺ তরুণদের ঘোড়দৌড়, তির-ধনুকের ব্যবহার ও সাঁতার কাটার মতো শারীরিক ব্যায়ামের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি শেখানোর ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছেন। রুচিশীল খেলাধুলা ও ব্যায়াম শারীরিক সুস্থতা, আনন্দ ও শক্তি বৃদ্ধির অন্যতম উৎস—যা একজন ব্যক্তির কল্যাণের জন্য অপরিহার্য। এই সকল ক্ষেত্রে পিতা-মাতাকে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সন্তানদের উৎসাহ দেওয়া উচিত, যাতে তারা এই সকল বিষয়ে অভ্যস্ত হতে পারে। অতিরিক্ত আদেশ-নিষেধ সন্তানদের মনে বঞ্চনার মনোভাব সৃষ্টি করে, যার ফলে তারা পিতা-মাতা এমনকী ধর্মের প্রতিও বিরক্তি প্রকাশ করে।

পারিবারিক কাজে অংশগ্রহণ : মুসলিম তরুণদের উচিত পর্যায়ক্রমে পরিবারের একজন দায়িত্বশীল সদস্য হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলা। একমাত্র এর মাধ্যমেই তারা মুসলিম সম্প্রদায়ের এবং সমাজের অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠতে পারবে। টেকসই মুসলিম পারিবারিক পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে সন্তানদের মাঝে বিশ্বস্ততা ও ঐক্যের অনুভূতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিশোরদের উচিত ছোটো ছোটো গৃহস্থালি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে পারিবারিক কার্যক্রমে জড়িয়ে পড়া। নিয়মিত পারিবারিক বৈঠক, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে খোলামেলা আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি করবে। এই সমস্ত বিষয় পরিবারের মাঝে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহাবস্থানের পরিবেশ সৃষ্টি করে।

তরুণদের মতামত ব্যক্ত করার ব্যাপারে উৎসাহিত করতে হবে, যাতে তারা আত্মবিশ্বাস অর্জনের পাশাপাশি সকলের নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করতে পারে। প্রাথমিক সময়গুলোতেই তাদের সম্ভাবনা ফুটে ওঠে। শিশুরা যখন কিশোর বয়সে পদার্পণ করে, তখন তাদের খামখেয়ালি মনোভাবের পরিবর্তে পরিণত ও দায়িত্বশীল আচরণে অভ্যস্ত করতে হবে। তাদের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে উম্মাহ ও মানবতার কল্যাণার্থে কাজ করার মানসিকতা। তাদের বোঝাতে হবে, জীবনটা গুরুত্বপূর্ণ; একে গুরুত্বের সাথে পরিচালনা করতে হবে।

ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ : কোনো পরিবারে কিশোরদের সাথে মারাত্মক সংকট সংঘটিত হলে কী করতে হবে? এই সকল পরিস্থিতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে, তা হলো—চরম অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতেও যৌক্তিক সমাধান বের করা। আমরা মাঝেমধ্যে শুনতে পাই, নিজ ধর্ম ও সংস্কৃতির বাইরের কারও সাথে সম্পর্ক রাখার ফলে ক্রোধবশত অনেক পিতা তাদের কন্যাদের শারীরিকভাবে শাস্তি দিয়ে থাকেন।

www.nagorikpathagar.org

অনেক পিতা-মাতা ইসলামের মৌলিক বিধিবিধানের ক্ষেত্রে আপস করেন, কিন্তু নিজেদের পারিবারিক মর্যাদা ও গৌরবকে অধিক প্রাধান্য দেন। অনেকেই আবার অন্যের দ্বারা পশ্চাৎপদ (Backdated) উপাধি পাওয়ার ভয়ে সন্তানদের ইসলামের মৌলিক শিক্ষা দেওয়া থেকে বিরত থাকেন। এর ফলে যখন তাদের নৈতিকভাবে অধঃপতিত সন্তানরা ধর্ম থেকে দূরে সরে যায়, তখন অভিভাবকরা হঠাৎ জেগে ওঠেন এবং তাদের ওপর জোরপূর্বক নিজেদের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে উদ্যত হন; কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যায়।

মানবজাতি রোবট নয়, যা হঠাৎ করে ধার্মিক হয়ে যাবে। হতাশা ও রাগ কখনোই ভালো কিছু বয়ে আনে না। এগুলো আগুনের মতো কাজ করে। যার ফলে মানুষ আবেগতাড়িত হয় এবং সর্বনাশা পরিবেশ তৈরি করে। রাগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে নবিদের ঐতিহ্য জ্বলন্ত উদাহরণ।

> 'রাগ মূলত শয়তানের পক্ষ থেকে আসে। শয়তানকে সৃষ্টি করা হয়েছে আগুন দিয়ে; পানির মাধ্যমে যাকে নির্বাপিত করা যায়। সুতরাং তোমাদের কেউ রাগান্বিত হলে সে যেন অজু করে নেয়।' আবু দাউদ
>
> 'তোমাদের কেউ রাগান্বিত হলে সে যেন চুপ থাকে।' আহমদ
>
> 'দাঁড়ানো অবস্থায় তোমাদের কেউ রাগান্বিত হলে সে যেন বসে পড়ে। যদি এমতাবস্থায়ও তার রাগ প্রশমিত না হয়, তবে সে যেন শুয়ে পড়ে।' আহমদ
>
> 'যখন যোগাযোগের মাধ্যমগুলো খোলা থাকে, তখন শান্ত পরিবেশ সৃষ্টি বাঞ্ছনীয়। জীবনের অন্য অনেক ক্ষেত্রের মতো কোনো সমস্যারই দ্রুত সমাধান খুঁজে বের করা যায় না। দুর্ভাগ্যবশত মানুষ অতি দ্রুততাপ্রিয়।' সূরা ইসরা : ১৯

সাহায্য-সহযোগিতা কামনা : জটিল স্বভাবের সন্তানকে লালন-পালন করা অনেক পিতা-মাতার জন্যই বিরক্তিকর। এই ক্ষেত্রে উত্তম সমাধান হলো—এই ধরনের সমস্যা সৃষ্টির আগেই ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ, তাদের আচার-আচরণ পর্যবেক্ষণ, মানসিকতা বোঝা এবং সমস্যা সমাধানে যথাসম্ভব প্রচেষ্টা চালানো। এই ক্ষেত্রে তাদের ব্যাপারে বন্ধু-বান্ধব, মসজিদের ইমাম ও সন্তান প্রতিপালনে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ গ্রহণ করা যেতে পারে। ত্বরিত ফল লাভের জন্য তাড়াহুড়ো কখনো আশানুরূপ ফলাফল বয়ে আনে না। প্রজ্ঞা ও সতর্কতার সাথে যথাসময়ে পদক্ষেপ গ্রহণই এই সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

সামাজিক অসুস্থতার প্রবল আক্রমণ

'শয়তান সুঁইয়ের মতো প্রবেশ করে এবং গাছের ন্যায় বিস্তৃতি লাভ করে।'—ইথিওপিয়ান প্রবাদ বাক্য

ব্যাধির প্রসার

সুস্থতা নয়, অসুস্থতা অতি দ্রুত এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই ছড়ায়। অনুকূল পরিবেশে মহামারি রোগ যেভাবে ছড়ায়, অসচেতন ও অতি উদার পরিবেশে সামাজিক ব্যাধি এর চেয়েও দ্রুত গতিতে ছড়ায়। কোনো ব্যক্তির পক্ষে এই পরিবেশে নিজেকে ঠিক রাখা অত্যন্ত কঠিন। বিশেষ করে তরুণদের ক্ষেত্রে তা আরও জটিল। বয়ঃসন্ধিকালে পরিপক্বতা ও স্থিতিশীলতার ঘাটতি থাকে, তখনও জীবনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য তারা প্রস্তুত থাকে না এবং জীবনের প্রকৃত অর্থও যথাযথভাবে বুঝতে পারে না।

সন্তানদের চারপাশের পরিবেশের ব্যাপারে পিতাকে সচেতন থাকতে হবে, যাতে তাদের পথ প্রদর্শন করতে পারে এবং জীবনের যে সকল বিষয়ে তাদের মধ্যে ঘাটতি রয়েছে, সেগুলোর ব্যাপারে তাদের পরিষ্কার ধারণা দিতে পারে। তরুণদের সাথে সম্পর্কিত আধুনিক সমাজের মূল সমস্যাগুলো নিচে তুলে ধরা হলো—

উত্ত্যক্ত (Bullying) ও হুমকি : শুধু স্কুলেই নয়; কর্মক্ষেত্রেও উত্ত্যক্তের শিকার হওয়া খুব ব্যাপক একটি সমস্যা। ক্রমবর্ধমান ইসলামাতঙ্ক পরিবেশে কিশোরদের জন্য এটি মারাত্মক সমস্যা।

www.nagorikpathagar.org

হেনস্তার শিকার ব্যক্তির ওপর এর মারাত্মক মানসিক প্রভাব রয়েছে, যা তার আত্মবিশ্বাসকে ধ্বংস করে দেয়। হেনস্তাকারী ব্যক্তির মধ্যে আত্মসম্মানবোধের অভাব রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, নিজেদের জীবনে তারা কোথাও না কোথাও দুর্ব্যবহারের শিকার হয়। ফলে তারা নিজেদের মধ্যে জমে থাকা ক্রোধ ও হতাশা অন্যের ওপর চাপিয়ে দেয়। যে কেউ-ই হেনস্তার শিকার হতে পারে; বিশেষ করে একাকী ব্যক্তি, সামাজিকভাবে পরনির্ভরশীল মানুষ কিংবা সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে এই সম্ভাবনা বেশি।

এই ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অভিভাবকদের উচিত সন্তানদের মাঝে আত্মসম্মানবোধ ও আত্মবিশ্বাসের বীজ বপন করা। ছোটোকালেই সন্তানদের মাঝে আস্থা ও ভরসা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে তারা কারও দ্বারা হেনস্তার শিকার হলে পিতা-মাতাকে নিঃসংকোচে জানাতে পারে। অপরদিকে তাদের এটিও শিক্ষা দিতে হবে, সকল মানুষই নিষ্পাপ হয়ে জন্মায় এবং ইসলামে পরস্পরকে হেনস্তার কোনো স্থান নেই। সূরা হুজুরাত : ১০

সমাজবিরোধী আচরণ : সকল ধরনের আত্মকেন্দ্রিক ও অগ্রহণযোগ্য কর্মকাণ্ড কিংবা যা অন্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, মানুষের ওপর যার বিরূপ প্রভাব রয়েছে এবং যা সমাজ জীবনকে ধ্বংস করে দিতে পারে—এমন সমস্ত কর্মকাণ্ডই সমাজবিরোধী কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর উৎপত্তি হয় উদাসীন পরিবারে। যেখানে দুর্বল পারিবারিক পরিবেশে সন্তান প্রতিপালন করা হয়। এ ছাড়াও বিদ্যালয়ে শিক্ষার্জনে জটিলতা, সমাজের ব্যর্থতা, মানসিক অসুস্থতা কিংবা প্রেরণার অভাব কিশোরদের মধ্যে সমাজবিরোধী কার্যক্রমের প্রবণতা তৈরি করতে পারে। সমাজবিরোধী কার্যকলাপের উল্লেখযোগ্য উদাহরণগুলো নিম্নরূপ—

১. খোলামেলা জায়গায় সকলের সামনে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ

২. পাড়ায় হইচই এবং উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করা

৩. জনগণের সম্পদ বিনষ্ট করা, দেয়ালে অযথা ছবি কিংবা পোস্টার লাগানো

৪. রাস্তায় মাদকদ্রব্য কেনাবেচা করা

৫. ফুটপাত বা রাস্তায় আবর্জনা ফেলা

৬. ধর্মীয়ভাবে নিষিদ্ধ পানীয় গ্রহণ।

নিরাপত্তার খাতিরে সন্তানরা কোথায় যাচ্ছে, কার সাথে কী উদ্দেশ্যে চলাফেলা করছে, এই ব্যাপারে অভিভাবকদের সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত

www.nagorikpathagar.org

সন্তানদের বাইরে থাকার অনুমতি দেওয়া যাবে না। এই সকল পদক্ষেপ তাদের সমাজবিরোধী কার্যক্রমে অংশগ্রহণের পথে বাধা হবে এবং তাদের এই ধরনের অপরাধের শিকার হওয়া থেকেও রক্ষা করবে।

চরমপন্থা : বর্তমানে তরুণদের মধ্যে চরমপন্থা ও মৌলবাদ ইস্যুতে মুসলিম সম্প্রদায় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। আধুনিক বিশ্বে মুসলিম যুবকদের চরমপন্থার সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যক্রমে জড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অভিযুক্ত করা হয়। তবে অনেক ক্ষেত্রে এটাকে Unhelpful Over Generalisation মনে করে। অথচ আল্লাহ পবিত্র কুরআনে মুসলিমদের 'উম্মাতে ওয়াসাত' তথা মধ্যমপন্থি জাতি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। (সূরা বাকারা : ১৪৩)

ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা, যা সর্বাবস্থায় চরমপন্থাকে পরিত্যাগ করতে বলে। এটি খুবই দুঃখজনক, সংখ্যায় ক্ষুদ্র হলেও আমাদের তরুণদের একটি অংশ মধ্যমপন্থা থেকে দূরে থাকতে পছন্দ করে এবং নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী মানুষদের বিচার করে। বিপরীতে এটাও অত্যন্ত খুশির বিষয়, মুসলিম যুবকরা বিশ্বব্যাপী তাদের দ্বীনি ভাই-বোনদের সাথে সংঘটিত সকল ধরনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রতিবাদ ব্যক্ত করেছে। সর্বোপরি মুসলিম উম্মাহর কোনো অংশ যখন ব্যথিত হয়, তখন একই শরীরের ন্যায় সমগ্র উম্মাহর উচিত উক্ত ব্যথায় নিজেদেরও ব্যথিত হওয়া। কিন্তু কেউ যতই রাগান্বিত কিংবা ব্যথিত হোক না কেন, যেকোনো ধর্ম-বর্ণের বিনা অপরাধী ব্যক্তিদের হত্যা করা কিংবা তাদের ওপর আক্রমণাত্মক আচরণ করা মোটেও সংগত নয়। তরুণদের জানতে হবে—পরিস্থিতি যতই অস্বাভাবিক হোক না কেন, ইসলামি নীতি ও আইনবহির্ভূত কোনো ধরনের পদক্ষেপ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

অভিভাবকদের উচিত সন্তানরা কাদের সাথে মিশছে, কোন ধরনের আলাপ-আলোচনা-আড্ডায় অংশ নিচ্ছে, অনলাইনে তারা কী করছে এবং কোন ধরনের বই অধ্যয়ন করছে, এই সকল বিষয়ে সতর্ক ও প্রজ্ঞাবান দৃষ্টি রাখা। পিতা-মাতার উচিত সন্তানদের সঙ্গে রাজনৈতিক ও স্পর্শকাতর বিষয়াবলির ব্যাপারে খোলামেলা আলোচনা করা। তবে তাদের এমনভাবে, এমন উপায়ে প্রতিপালন করতে হবে, যা সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে। তরুণদের বেশি বেশি অধ্যয়ন ও শ্রবণে উৎসাহিত করতে হবে। এক্ষেত্রে তাদের দিতে হবে বিশুদ্ধ পুস্তক ও বিশ্বস্ত বক্তার অনুসন্ধান।

www.nagorikpathagar.org

কিশোর গ্যাং : সাম্প্রতিক সময়ে কোনো কোনো এলাকায় মুসলিম তরুণদের মাঝে দলবদ্ধ সহিংসতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমাজবিজ্ঞানী এবং অনেক সামাজিক নেতৃবৃন্দের মতে, এই সমস্যার সাথে সামাজিক বঞ্চনা, দরিদ্রতা, অনিয়ন্ত্রিত বেকারত্ব এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে আশানুরূপ ফলাফল অর্জনে ব্যর্থতার বিরাট প্রভাব রয়েছে। অনেক কিশোর দলভুক্ত গ্রহণযোগ্যতার জন্য বিভিন্ন কিশোর গ্যাং-এ যোগ দেয়। কারণ, নিজের পরিবারে তারা পারিবারিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ খুঁজে পায় না। অনেকে এই ভেবে এসব গ্যাং-এ যোগ দেয়, এর থেকে দূরে থাকলে তারা বন্ধুদের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলতে পারে। এদের বেশিরভাগই মাদক ও রাস্তার সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত। যে সকল পিতা-মাতা সন্তানদের জন্য উষ্ণ সৌহার্দ্যপূর্ণ পারিবারিক পরিবেশ সৃষ্টি করেন, তাদের পর্যাপ্ত সময় দেন এবং তাদের সম্ভাবনাকে যথাসম্ভব কাজে লাগানোর নিশ্চয়তা প্রদান করেন, তাদের সন্তানদের বখে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

মাদক, অ্যালকোহল ও ধূমপান : অ্যালকোহল, মাদক ও ধূমপানের মধ্যে আসক্তি সৃষ্টি করার ক্ষমতা রয়েছে। অনেক তরুণ অন্যের অনুকরণে কিংবা বড়োদের আহ্বানে ধূমপান কিংবা নেশাজাতীয় মাদক গ্রহণ করে থাকে। অনেকে এই ব্যাপারে কৌতূহলী হয়ে মাদক গ্রহণের মাধ্যমে চাপমুক্ত হতে চায়।

কোনো তরুণ অল্প সময়ে মাদকাসক্ত হয়ে পড়লে এটি তাদের অধঃপতিত হওয়ার রাস্তা খুলে দেয় এবং অন্যান্য সমস্যাবলি দানা বাঁধার নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। মাদকদ্রব্য গ্রহণের ফলে লিভার, হার্ট ও পেটের মধ্যে মারাত্মক ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। ধূমপান ফুসফুসের মারাত্মক ব্যাধির মূল কারণ। এই সব ধ্বংসাত্মক শারীরিক ক্ষতি ছাড়াও সমাজের ওপর ধূমপানের আরও অনেক নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে, যা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষতির অন্যতম কারণও বটে। মাদক গ্রহণের ফলে তরুণদের মাঝে অনেক আচরণগত সমস্যা দেখা দেয়। যেমন—যৌন চর্চা, অর্থ জোগাড় করার জন্য চুরির আশ্রয় নেওয়া ইত্যাদি। এর ফলে আহত হওয়া, মৃত্যুবরণ করা কিংবা কারাগারে প্রেরণের মতো শাস্তিও হতে পারে।

সঙ্গদোষ কিশোরদের মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করে। সুতরাং সন্তানরা কাদের সাথে মেলামেশা করছে, এই ব্যাপারে অভিভাবকদের সতর্ক থাকতে হবে। আমাদের উচিত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে সন্তানদের সাথে মাদকদ্রব্য এবং এর সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলোর ব্যাপারে আলাপ এবং তাদেরকে ইসলামের বিধান অনুযায়ী স্বাস্থ্য, অর্থ, নৈতিকতার বিপর্যয়, মাদকের বিষক্রিয়া ও ভয়াবহতার ব্যাপারে সতর্ক করা।

www.nagorikpathagar.org

বর্ণবাদ, জাতিগত বিদ্বেষ ও ইসলামভীতি : বর্ণবাদ, জাতিগত বিদ্বেষ—এগুলো অমানবিক ও ঘৃণ্য সামাজিক ব্যাধি। এগুলোর ফলে ইতিহাসে মানবজাতি বারংবার ধ্বংসাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। দাসপ্রথা, উপনিবেশবাদ, ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ, হত্যাকাণ্ড এগুলোরই অনিবার্য ফল। জাতিগত বিদ্বেষের কারণে পূর্বে অনেকগুলো জাতি বিলীন হয়ে গেছে। বিগত শতাব্দীর দুটি ধ্বংসাত্মক বিশ্বযুদ্ধও জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের লড়াইয়ের ফলাফল। সাম্প্রতিক দশকগুলোতে বলকান অঞ্চলসহ বিশ্বের বিভিন্ন অংশ জাতিগত নিধনের সম্মুখীন। জাতিগত নিধনের অন্যতম মূল কারণ হলো ঘৃণ্য বর্ণবাদ, যা ধরণিতলে ভয়াবহ পরিস্থিতি বয়ে আনে। দৈনন্দিন জীবনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে বর্ণবাদ অবিশ্বাস ও ভীতির সৃষ্টি করে এবং সমাজে ঘৃণা ছড়ায়।

মুসলিম ছেলেমেয়েরা তাদের গায়ের রং এবং ধর্মের কারণে অনেক নেতিবাচক আচরণের সম্মুখীন হয়। তাদের দাড়ি ও হিজাবের কারণেও অনেক সময় নেতিবাচক আচরণের মুখোমুখি হতে হয়। বর্ণবাদ ও জাতিগত বিদ্বেষের সবচেয়ে কম ক্ষতিকর দিক হলো—তা অন্তরে অন্যের জন্য ঘৃণা সৃষ্টি করে। এর সবচেয়ে হানিকর ও খারাপ দিক হলো—এটি তাদের একাডেমিক অর্জন এবং সামাজিক কার্যক্রমকে মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। যে সকল মুসলিম ছেলেমেয়েরা দ্বীনের সৌন্দর্য হিজাব ও দাড়ি রাখার কল্যাণকে উপলব্ধি করতে পারে এবং যাদের ওপর তাদের পরিবারের অকুণ্ঠ সমর্থন রয়েছে, নেতিবাচক আচরণের দ্বারা তাদের মনঃক্ষুণ্ন হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

বর্ণবাদ ও ইসলামভীতি দূরীকরণের ক্ষেত্রে মুসলিম অভিভাবকদের দুইভাবে ভূমিকা পালন করতে হবে। প্রথমত, আমাদের সন্তানদের এমন জ্ঞান ও শিষ্টাচারিতায় সমৃদ্ধ করতে হবে—যাতে তারা বর্ণবাদ ও ধর্মবিরোধী সকল কার্যক্রমের বিরুদ্ধে মর্যাদার সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারে এবং এই সকল ঘৃণিত সামাজিক ব্যাধির বিপক্ষে যথাযথ উপায়ে লড়াই করাকে গৌরবের বিষয় মনে করে। তারা যেখানেই থাকুক না কেন, আমাদের উচিত মানবজাতির বৈচিত্র্যের ব্যাপারে তাদের কুরআনের শিক্ষা প্রদান করা—যা ঐশ্বরিক বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অবতীর্ণ হয়েছিল। (সূরা হুজুরাত : ১৩)

মুসলিম তরুণদের তাকওয়ার বাহক হিসেবে বর্ণবাদবিরোধী মানসিকতা অর্জন করতে হবে। কারণ, আল্লাহর কাছে মর্যাদা অর্জনের এটাই পূর্বশর্ত। তাদের এটাও স্মরণ করিয়ে দিতে হবে, বর্ণবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য কাউন্টার হিসেবে উলটো বর্ণবাদ বা ঘৃণার চাষ করলে কখনোই বিজয় লাভ করা সম্ভব না।

www.nagorikpathagar.org

মুসলিমরা যতই বর্ণবাদ কিংবা ইসলামবিরোধীদের দ্বারা আক্রান্ত হোক না কেন, আমাদের উচিত মর্যাদার সঙ্গে এই সকল পরিস্থিতি মোকাবিলা করা। প্রতিশোধপরায়ণ নয়; বরং মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহারই আমাদের মূল অস্ত্র।

যৌন বিশৃঙ্খলা : তিন বর্ণের শব্দ Sex (সেক্স), যা বর্তমান সময়ের উত্তরাধুনিক সমাজে জীবন ধারণের অনেক কিছুই নির্ধারণ করে দেয়। এটি এমন একধরনের দুরন্ত আকাঙ্ক্ষা, যা ব্যক্তি ও সমাজের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। যিনা বা ব্যভিচার ইসলামে খুবই গুরুতর অপরাধ। মহান আল্লাহ তায়ালা ব্যভিচার কিংবা যিনাকে শুধু নিষিদ্ধই করেননি; বরং যৌন চিন্তার উদ্রেক ঘটায় এমন যেকোনো বস্তুর কাছে ভিড়তেও নিষেধ করেছেন (সূরা ইসরা : ৩২)। যৌন-কামনা মানব-প্রকৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং অনেকগুলো কারণে পুরুষ মানুষের মধ্যে যৌন-কামনা বেশি মাত্রায় দেওয়া হয়েছে। তবে সতর্ক থাকতে হবে, এই যৌনশক্তি যেন কখনো হিংস্র রূপ ধারণ না করে; নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রেখে যথাযথ দায়িত্বশীলতার সঙ্গে এর ব্যবহার করতে হবে।

অবাধ যৌনতার ব্যাপারে অতি উদার মানুষ যা-ই বলুন না কেন, শুধু ব্যক্তিগত উপভোগ্য বিষয় হলেও সমাজে এর ব্যাপক ধ্বংসাত্মক দিক রয়েছে। অবাধ যৌনতার ফলে মানুষ অনেক ধরনের যৌনবাহিত রোগে আক্রান্ত হয়। এর মধ্যে এইচআইভি, ক্লামিয়া, সিফিলিস অন্যতম; যেগুলো পরবর্তী সময়ে সন্তান জন্মদানে অক্ষমতা ও মরণব্যাধিতে রূপ নেয়।

যৌন নির্যাতন ও ধর্ষণের মতো বিষয়গুলো খুব স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিবাহবহির্ভূত যৌন সম্পর্ক এখন অনেকটাই সামাজিকভাবে স্বীকৃত। বিবাহ বিচ্ছেদের মাত্রা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। এর থেকে কিশোররা প্রতিনিয়ত যা শিখছে, সেগুলো থেকে তাদের রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে যাচ্ছে। সন্তানদের মধ্যে ইসলামি জ্ঞান ও দায়িত্বশীলতার অনুভূতি জাগ্রত করা অভিভাবকদের সবচেয়ে বড়ো দায়িত্ব। অভিভাবকদের উচিত সন্তানদের সাথে যৌনতার ব্যাপারে, ইসলামে এর অবস্থানের ব্যাপারে সতর্কতার সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করা। তরুণদের আগে জানতে হবে—যিনা ও ব্যভিচার এমন হারাম, যা আরও দশটা হারামের দুয়ার খুলে দেয়।

সমকামিতা : বিশ্বব্যাপী সমকামিতা কিংবা সমলিঙ্গের মধ্যে যৌন সম্পর্ক খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। বর্তমানে অনেক উন্নত সমাজে সমকামীদের অধিকার সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলো সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করছে।

www.nagorikpathagar.org

ফলে অনেক রাষ্ট্রই সমকামিতার বৈধতা দানে উদ্‌বুদ্ধ হচ্ছে। সমলিঙ্গের মাঝে বিবাহ অথবা যৌন সম্পর্ক অনেক দেশে আইনগত বৈধতাও পাচ্ছে। কিছু সমাজে এই সকল বিষয়কে সামাজিক মর্যাদা দেওয়া হলেও মূলধারার কোনো ধর্মেই এটি গ্রহণযোগ্য নয়।

এই বিষয়টি অন্যান্য সমাজের মতো আমাদের সম্প্রদায়কেও বিভক্ত করার পূর্বেই আমাদের উচিত, ভদ্রতার সাথে সমকামিতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলা। ইসলাম কখনো মানুষের জীবন ধারণের পদ্ধতির ব্যাপারে সহিংসতা কিংবা ঘৃণা ছড়ানোকে সমর্থন করে না। কিন্তু ধৈর্য ও প্রজ্ঞার সাথে ইসলামি বিধানের যথার্থতা তুলে ধরার দায়িত্ব মুসলিমদের রয়েছে। (সূরা ফুসসিলাত : ৩৪)

সন্তানদের শিক্ষা দেওয়ার পূর্বে অভিভাবকদের উচিত এই ব্যাপারে নিজেদের শিক্ষা এবং যথেষ্ট পরিমাণ ধারণা লাভ করা। পবিত্র কুরআনের অনেক জায়গায় এই ব্যাপারে আলোকপাত করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ—সূরা আ'রাফ : ৮০-৮৪, সূরা হুদ : ৭৭-৮৩, সূরা নামল : ৫৪-৫৬, সূরা আনকাবুত, ২৮-৩৪ এবং সূরা আস-সাফফাত : ১৩৩-২৩৭।

শিশুকামিতা : শিশুরা হলো চারাগাছের মতো, যাদের যথাযথ পরিচর্যা প্রয়োজন। তাদের সঙ্গে কোনো ধরনের অপব্যবহার কিংবা অপকর্মে লিপ্ত হওয়া কুরুচিপূর্ণ মানুষের কাজ। দুর্ভাগ্যবশত, প্রায় প্রত্যেক সমাজেই দুর্বল শিশুরা অপরাধীদের দ্বারা যৌন সহিংসতার শিকার হচ্ছে; অথচ এই সময়ে তাদের নিঃশর্ত ভালোবাসা ও স্নেহ পাওয়ার কথা ছিল।

শিশুকামিতা কেবল অমানবিকই নয়; বরং জঘন্য অপরাধ—যা শিশুদের নিষ্কলুষতাকে ধ্বংস করে। নিপীড়ন করার পর অনেক ধর্ষক শিশুদের জীবননাশেও উদ্যত হয়। সভ্য সমাজের আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো মানুষের নাগরিক দায়িত্ব পূরণের ক্ষেত্রে এক প্রকারে আস্থার জায়গা হিসেবে কাজ করে। শিশুকামিতার মতো মারাত্মক অপরাধের বিনাশ সাধনের জন্য এই সমস্ত সংস্থাগুলোকে আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। সন্তানরা কার সঙ্গে মেলামেশা করছে এবং কাদের ওপর আস্থা রাখছে, এই ব্যাপারে জ্ঞাত হওয়া অভিভাবকদের জন্য আবশ্যক। প্রাপ্তবয়স্কদের অগ্রহণযোগ্য কর্ম এবং এর সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য আচরণের ব্যাপারে ছেলেমেয়েদের অবগত করতে হবে। পিতা-মাতাদের সব সময় দায়িত্বশীল ও খোলা মনের হতে হবে, যাতে সন্তানরা যেকোনো বিষয়ে আলোচনার জন্য তাদের নিকট আসতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে।

www.nagorikpathagar.org

পারিবারিক সহিংসতা : বর্তমান সময়ের তরুণরা অধিকতর রাগ ও হতাশায় নিমজ্জিত হচ্ছে। বেকারত্ব, মাদকদ্রব্য গ্রহণ কিংবা পারিবারিক চাপ এর মূল কারণ। অধিকাংশ তরুণ চারপাশের লোকদের মৌখিক ও শারীরিকভাবে আক্রমণের মাধ্যমে নিজেদের হতাশা কাটাতে চাচ্ছে। মুসলিম সম্প্রদায়ের কোনো কোনো জায়গায় এই ধরনের পারিবারিক সহিংসতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এর অধিকাংশ ভুক্তভোগী নারী; পুরুষ ভুক্তভোগীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। পিতা-মাতার উচিত কিশোর ছেলেমেয়েদের পরিবার ও সমাজের ধার্মিক পূর্বপুরুষদের সৎ কর্মের বিষয়ে অবহিত করা। ইসলামের অন্যতম শিক্ষা হলো—জীবনসঙ্গী ও সন্তানদের আমানত হিসেবে বিবেচনা করা। তাই তাদের সাথে দুর্ব্যবহার কিংবা অপকর্ম করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

অভিভাবকদের উচিত সন্তানদের ইতিবাচক ও স্বাস্থ্যকর উপায়ে রাগ ও হতাশা দূর করার উপায় শিক্ষা দেওয়া। যেমন : স্বাস্থ্যকর খেলাধুলা, ঘোরাফেরা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডসহ হালাল বিনোদনের ব্যবস্থা করা।

বস্তুবাদ ও মূল্যবোধের অবক্ষয় : বিগত কয়েক শতাব্দীতে পশ্চিমা দেশগুলোতে বস্তুবাদ খ্রিষ্টধর্মকে তার নৈতিক প্রভাব থেকে সরিয়ে নিজেই এর স্থান দখল করে নিয়েছে এবং সমাজকে অনৈতিকতার মুখে ঠেলে দিয়েছে। উত্তরাধুনিক পশ্চিমা সমাজে নৈতিক আপেক্ষিকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যেখানে জীবনের প্রকৃত মূল্যবোধ উপলব্ধি করার সুযোগ রয়েছে খুব কম। ফলে সততা, বিশ্বস্ততা, নৈতিকতা ও ন্যায়বিচারের মতো সর্বজনীন মূল্যবোধগুলো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও আত্মকেন্দ্রিকতার কাছে পরাজিত হচ্ছে। ফলাফলের দিকে লক্ষ না রেখে শুধু উপভোগ করার আকাঙ্ক্ষা অল্প বয়সেই প্রাধান্য পাচ্ছে।

তরুণদের কাছে জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের ব্যাপারে জানতে চাইলে অধিকাংশই উত্তর দেয়—তারা ধনী হতে চায় কিংবা জীবনকে শুধুই উপভোগ করতে চায়। টেলিভিশন, কম্পিউটার প্রভৃতি উপকরণাদি মানুষকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্ক থেকে এমনভাবে বিরত রাখছে, যার ফলে তরুণরা ভুলেই যাচ্ছে—এর চেয়ে আরও উত্তম উপায়ে মানুষের সাথে সম্পর্ক রাখা যায়। পরিবারের সবাই একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করা এবং পরস্পরের সাথে পর্যাপ্ত সময় ব্যয় করা আশঙ্কাজনকহারে কমে যাচ্ছে। বস্তুবাদী উপকরণ, বিশাল দালান, দ্রুতগামী গাড়ি এবং জাঁকজমকপূর্ণ পোশাকের ওপর অধিক হারে গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। বস্তুবাদী নারী-পুরুষ সবাই এর পেছনে ছুটছে।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ মানুষকে নিজস্ব গুণ ও যোগ্যতার কারণে মর্যাদা দিয়েছেন। ইসলামে নারী-পুরুষের ভূমিকা পরস্পরের পরিপূরক। ইসলামে উপার্জন করে পরিবার চালানোর বাধ্যবাধকতা নারীদের দেওয়া হয়নি।

বর্তমান সময়ে পুরুষদের সাথে ক্যারিয়ার গঠনের প্রতিযোগিতায় নারীদের ওপর সমাজ কর্তৃক বিরাট বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়। ফলে তারা কর্মক্ষেত্রে পুরুষদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে নিজেদের আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করতে হয়; একই সঙ্গে গৃহস্থালি কাজেরও সামাল দিতে এবং মায়ের দায়িত্বও পালন করতে হয়।

ইসলামি শিষ্টাচার বস্তুবাদী ধর্মহীন জীবনব্যবস্থার আরেক ভুক্তভোগী। বর্তমানে অনেক মুসলিম যুবকের মধ্যে শিষ্টাচারের ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। এমনকী যারা ইসলামি কার্যক্রমে অংশ নেয়, তাদের মধ্যেও শিষ্টাচারিতার অনুপস্থিতি লক্ষ করা যায়। যত্নশীল ও দায়িত্বশীল আচরণ সমাজজীবনের মূল ভিত্তি। ইতিহাসজুড়ে মুসলিমরা আদর্শ হিসেবে রাসূল ﷺ-এর চরিত্রের অনুসরণ করেছে। তারা ভালোবাসা, সহমর্মিতা ও অপরের কল্যাণের দিকে লক্ষ রেখে অনুভূতিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু বর্তমানে অনেক মুসলিম; এমনকী মুসলিম সমাজকর্মীদের আচরণের মধ্যেও অহংবোধ ও আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রবেশ পাচ্ছে। তরুণ মুসলিমরা আল্লাহ ও মানুষের অধিকারের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে ব্যর্থ হচ্ছে।

অভিভাবকরা কী করতে পারেন?

সর্বপ্রথম আমাদের বস্তুবাদের ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, যাতে আমরা তরুণদের উৎসাহিত করতে পারি। একই সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া, সালাত আদায় ইত্যাদির মাধ্যমে উত্তম পারিবারিক আবহ তৈরি করে তাদের সাথে উপযুক্ত সময় ব্যয় করতে হবে। এই ধরনের প্রচেষ্টা ছাড়া বস্তুবাদী আচরণ থেকে সন্তানদের বিরত রাখা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। পিতা-মাতা ও সন্তানদের মাঝে ক্রমবর্ধমান ইতিবাচক ও সম্মানজনক মেলামেশা সন্তানদের অন্যের সাথে কল্যাণকর আচরণ, দয়া ও শ্রদ্ধাশীল আচরণে উদ্‌বুদ্ধ করতে বিরাট ভূমিকা পালন করে।

অভিভাবকদের অবশ্যই ছেলেমেয়েদের নিকট পুরুষ ও নারীর স্বতন্ত্র ও পরিপূরক ভূমিকার ব্যাপারে আলোচনা করতে হবে, যাতে তারা ভবিষ্যতের পিতা-মাতা হিসেবে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী এসব দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারে।

নারী-পুরুষ উভয়কেই সামর্থ্য অনুযায়ী সর্বোচ্চ প্রচেষ্টার মাধ্যমে দ্বীন ও দুনিয়াবি বিষয়ে সমানভাবে পারদর্শী করতে হবে। মুসলিমদের উচিত অন্যদের সাথে মিলে

www.nagorikpathagar.org

মাতৃত্বকে শ্রেষ্ঠ পেশা হিসেবে উপস্থাপন করা, যাতে সন্তানরা মায়ের শর্তহীন ভালোবাসা ও আদর-যত্ন উপভোগ করতে পারে। তরুণ ছেলেদের শিক্ষা দিতে হবে—ভদ্রতা, সতীত্ব ও ইসলামের ব্যাপারে বোধগম্যতার মধ্যেই নারীর প্রকৃত সৌন্দর্য নিহিত। তার চেহারা, গায়ের রং, চুলের স্টাইল কিংবা কোমরের পামের মধ্যে তাদের প্রকৃত সৌন্দর্য নিহিত নয়। একইভাবে কন্যাদেরও জানাতে হবে, চেহারা ও অধিক অর্থ উপার্জনের মধ্যেই পুরুষের চরিত্র নিহিত নয়; বরং চরিত্র ও দ্বীনের অনুশীলনের মধ্যেই পুরুষের প্রকৃত সৌন্দর্য লুকায়িত।

বিয়েকে উপভোগ্য, প্রশান্তিদায়ক ও গতিশীল সম্পর্ক হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে। তবে এর জন্য কঠোর পরিশ্রম, পারস্পরিক সম্মান, সমঝোতা ও ত্যাগের মানসিকতার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কারও সতীত্ব রক্ষা, দ্বীনের অধিক পূর্ণতা ও ভালোবাসার সাথে সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে এটি একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রতিশ্রুতি। আমরা যখন এই সকল আচরণে আমাদের সন্তানদের অভ্যস্ত করাতে পারব এবং তাদের মধ্যে আমাদের চরিত্রের প্রতিফলন ঘটাতে পারব, তখনই কেবল আশা করতে পারব—তারা জীবনে সফল হবে।

ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম

> 'আল্লাহ তাঁর প্রজ্ঞানুযায়ী মানুষে মধ্যে সৎ ও অসৎ উভয় ধরনের প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।' সূরা শামস : ৮

ন্যায়ভিত্তিক, ভারসাম্যপূর্ণ সমাজে ধর্মকে পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহিত করা হয়, যাতে সমাজে সমৃদ্ধি অর্জন ও অন্যায়কে দমন করা সহজ হয়। ধর্মপরায়ণতার জন্য এর পরিচর্যা ও সহায়ক পরিবেশ প্রয়োজন। এগুলো শুধু ধর্মের বিকাশের জন্যই দরকার নয়; বরং টিকে থাকার জন্যও দরকার। মানবসভ্যতার ইতিহাসজুড়ে দেখা যায়—শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সৎ মানুষ গড়ার লক্ষ্যেই। কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ধর্ষণকারী, শিশুকামী, গ্যাংস্টাইটার, মাদক ব্যবহারকারী কিংবা হত্যাকারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কিন্তু সমাজ যখন তার এই সমস্ত প্রকৃত আশ্রয়স্থল ও নির্দেশনা (ধর্ম) হারাল, তখনই অপকর্মগুলো অধিক হারে বাড়তে থাকল।

সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা এক বিশাল চ্যালেঞ্জ এবং এটি কেবল মুসলিমদের সমস্যা নয়; বরং সকল সমাজেই এই সমস্যাগুলো খুবই সাধারণ সমস্যা। মুসলিমদের এই সকল ব্যাধির বিরুদ্ধে লড়াই করে এর মূলোৎপাটন করতে হবে। মুসলিমদের এমন সব সামাজিক উদ্যোগে অংশগ্রহণ করা উচিত—

www.nagorikpathagar.org

যেগুলো মিডিয়া ও অন্যান্য বিনোদনমূলক ইন্ড্রাস্টিতে প্রদর্শিত বেহায়াপনা, অশ্লীলতা এবং সকল ধরনের সামাজিক ব্যাধির মূলোৎপাটন কিংবা হ্রাস করার ক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমাদের সমাজে আধ্যাত্মিকতার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কার্যকরভাবে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার লক্ষ্যে আমাদের অংশীদারিত্বমূলক প্রচেষ্টা আরও বাড়াতে হবে। এটি কেবল তখনই সম্ভব হবে, যখন আমরা চারদিকে কী ঘটছে—এই ব্যাপারে সচেতন থাকব এবং সক্রিয়ভাবে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ও অবিশ্বাসীদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এর বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রদান করতে পারব। কোনো ব্যাপারে শুধু বিলাপ করা কিংবা দুঃখ প্রকাশ করা সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কখনোই সহায়ক ভূমিকা পালন করে না। যত দ্রুত আমরা এই বিষয়টিকে বুঝব, ততই আমাদের জন্য মঙ্গল।

পিতা-মাতার উচিত পারিবারিক পর্যায়ে বিভিন্ন উপায়ে সন্তানদের চারপাশে সুরক্ষাপ্রাচীর তৈরি করা এবং আরও সক্রিয়ভাবে তাদের লালন-পালনে সময় দেওয়া, যাতে করে সন্তানরা অনৈতিকতার কালো গহ্বরে পতিত না হয়।

কিছু সহায়ক পরামর্শ

- ইসলামি মূল্যবোধ ও নৈতিকতা মেনে চলুন। এগুলো সন্তানের সীমা-পরিসীমা নির্ধারণ করে দেবে, যেগুলোর ওপর ভিত্তি করে পিতা-মাতা সন্তান লালন-পালন করবে।

- সন্তানরা যখন কথা বলতে চায়, তখন তাদের কথা শুনুন। তাদের প্রতি পূর্ণ মনোযোগী হোন। আচরণ যত তুচ্ছই হোক না কেন, তাদের থামিয়ে দেবেন না। সন্তানের সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করবেন না। তাদের সাথে গুরুত্বের সাথে আচরণ করুন।

- তাদের সাথে আপস করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকুন। সন্তানরা পিতা-মাতার সকল নির্দেশ মান্য করবে, এই ধরনের আশা করা অযৌক্তিক। সন্তান ও পিতা-মাতা উভয়ের মধ্যেই বিভিন্ন বিষয়ে আপস-মীমাংসা করার অনুভূতি থাকতে হবে—যাতে তারা এমন একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে, যে সিদ্ধান্তে উভয়পক্ষই সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য।

- অবিরত প্যারেন্টিং স্টাইল স্থিতিশীল হওয়া দরকার। অভিভাবকদের ভিন্ন আচরণ কিংবা অভিভাবকাদের মধ্যে মতের পার্থক্য কিশোরদের মনে সন্দেহের বীজ বপন করে।

www.nagorikpathagar.org

- কথা বলার ক্ষেত্রে সততা অবলম্বন এবং কার্যক্রমে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করুন। সন্তানদের নিকট বিশেষ করে কিশোরদের নিকট কোনো কিছু গোপন করার প্রচেষ্টা পিতা-মাতার প্রতি সন্তানদের আস্থা কমিয়ে দেয়।

- আপনার যেকোনো ধরনের ভুলের জন্য ক্ষমা চান। সন্তানদের জানা উচিত, তাদের পিতা-মাতা নির্ভুল নয়। অভিভাবকরা যখন কোনো ভুলের ব্যাপারে সন্তানদের সামনে ক্ষমা চায়, তখন অভিভাবকদের ন্যায়পরায়ণতা পরিষ্কার হয়। ফলে সন্তানরা কখনো তাদের পক্ষপাতদুষ্ট হিসেবে বিবেচনা করতে পারে না। সন্তানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভুলগুলোকে ক্ষমা করে দিন এবং ইতস্ততবোধ, রাগ কিংবা হতাশা দূরীকরণে তাদের সাহায্য করুন।

- পারিবারিক যেকোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন। কিশোররা অনেক সময় চমকপ্রদ ধারণা নিয়ে হাজির হয়, যা পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। একই সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অবদান রাখার সুযোগ প্রাপ্তির ফলে তাদের মধ্যে উক্ত সিদ্ধান্তের অংশীদারিত্বের অনুভূতি তৈরি হয় এবং তারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করে।

- সন্তানদের সাথে বসসুলভ নয়, বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করুন। তাদের সাথে সময় নিয়ে কথা বলুন এবং বিভিন্ন বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা দিন।

- সন্তানদের যোগ্যতাকে মূল্যায়ন করুন এবং যেকোনো ভালো কাজের জন্য তাদের পুরস্কৃত করুন। এগুলো তাদের আত্মিক প্রশান্তি জোগানোর পাশাপাশি সৎ কাজে উৎসাহিত করে। এটি তাদের এই নিশ্চয়তাও প্রদান করে, তাদেরও মূল্যায়ন করা হচ্ছে। সন্তানদের সকল ইতিবাচক প্রচেষ্টা ও কাজের প্রশংসা করতে হবে। তবে পিতা-মাতাকে অবশ্যই সর্তক হতে হবে—যাতে তা ঘুসের পর্যায়ে না পড়ে।

ভালোবাসা ও সম্মানের ওপর ভিত্তি করে সন্তানদের সঙ্গে যথাযথ উপায়ে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তুলুন।

তাদের জন্য দুআ করুন। হিদায়াত একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে এবং মুসলিমদের উচিত নিজেদের সকল কর্মকাণ্ড এবং এর ফলাফলের ব্যাপারে আল্লাহর ওপর নির্ভর করা। সন্তানদের হিদায়াতের জন্য অবিরত 'দুআ' বিশ্বাসী অভিভাবকদের জন্য অপরিহার্য।

www.nagorikpathagar.org

শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের প্রেরণা

'সহজ করো, কঠিন করো না; সুসংবাদ দাও, দুঃসংবাদ দিয়ো না।'
—সহিহ বুখারি

মানবজাতি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী

মানবজাতিকে স্বাধীনভাবে চলার সুযোগ এবং ভালো-মন্দ বিচারের যোগ্যতা দেওয়া হয়েছে। আমাদের জন্য সৌভাগ্য যে, আল্লাহ পৃথিবীকে আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জস্বরূপ সৃষ্টি করেছেন। কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা না থাকলে আমাদের অন্তর অকার্যকর হয়ে যেত এবং আমরা চরম হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে যেতাম। চরম অলসতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা আমাদের গ্রাস করে রাখত। বাধা-প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ মানুষকে সামনে এগিয়ে নেয় এবং তার ভাগ্যের পরিবর্তনে উৎসাহিত করে। ফলে সমাজে গতিশীলতা তৈরি হয় এবং এর অধিবাসীরা দুঃসাহসী হয়ে ওঠে। এই ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে অনেক ভুলভ্রান্তি হবে। আর এ সকল ভুলভ্রান্তির মধ্য দিয়েই সমৃদ্ধি ঘটবে।

প্রেরণা কী?

পরিষ্কারভাবে বলতে গেলে এটা হচ্ছে—

- সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়া এবং কাউকে অনুপ্রাণিত করার যোগ্যতা।
- দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও মনোবল; কোনো কিছু অর্জনের বাস্তব আকাঙ্ক্ষা।
- পরিবর্তন আনার মানসিকতা।

www.nagorikpathagar.org

- সফলতাকে লক্ষ্য বানিয়ে নেওয়া।
- সক্ষমতা অর্জন করা যায়—এমন লক্ষ্যে পৌঁছানোর যোগ্যতা।
- নিরবচ্ছিন্ন পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের প্রতিজ্ঞা।

প্রেরণা মানুষের সফলতার মূল চালিকাশক্তি। এটি অভ্যন্তরীণ প্রেরণা, উৎসাহ, আসক্তি ও অগ্নি—যা কোনো কিছু অর্জনের প্রতিজ্ঞাকে বাঁচিয়ে রাখে। প্রেরণা মানুষের প্রতিজ্ঞার কেন্দ্রবিন্দু। তবে এটি বিমূর্ত, যা পরিমাপ করা যায় না। প্রেরণা বা উৎসাহকে জিইয়ে রাখার জন্য জ্বালানির প্রয়োজন। কিশোরদের জীবনের শুরুতে পিতা-মাতা, গুরুজন ও শিক্ষকদের পক্ষ থেকে কিশোরদের অন্তরে উক্ত জ্বালানির জোগান দেওয়া উচিত।

কোন বিষয় তরুণদের স্পন্দিত করে? কোন জিনিস তাদের মধ্যে কোনো কিছু অর্জনের প্রেরণা জোগায়? শারীরিক চাহিদা, সমাজ, আত্মকেন্দ্রিকতা ও তুষ্টি মানুষের আচরণে কোনো পরিবর্তন আনে কি? মানবজাতির মধ্যে কিছু করার ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক প্রবণতা কি স্বভাবগত? অন্তর্নিহিতভাবেই কি মানবজাতি সৎপ্রবণ অথবা অসৎপ্রবণ?

এগুলোকে দার্শনিক জিজ্ঞাসা মনে হতে পারে। তবে আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে এর গুরুত্ব ব্যাপক। সভ্যতার শুরু থেকেই মানুষ এই সকল প্রশ্নের উত্তর খুঁজে আসছে, কিন্তু কোনো ধরনের ঐশ্বরিক নির্দেশনা ছাড়া এগুলোর উত্তর অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

ইসলামের আগমনের পর আরব ও অন্যান্য জাতি বিস্ময়কর সব মানবীয় গুণাবলির বিকাশ ঘটিয়েছে। এই বিষয়টিই আজকের পৃথিবীর পথ দেখিয়েছে। এর মূল কারণ হলো—তারা ছিল ওহি দ্বারা অতিমাত্রায় অনুপ্রাণিত। তাদের ঈমানের গভীরতা ছিল সীমাহীন। জীবনের মহান উদ্দেশ্যকে তারা বুঝতে পেরেছিল। পরবর্তী সময়ে ইসলামের সাথে মুসলিমদের আত্মার সম্পর্ক দুর্বল হওয়ার কারণে সেই গৌরব তারা হারিয়ে ফেলে। চিন্তার ক্ষেত্রে তারা স্থবির হয়ে পড়ে এবং কর্মের ক্ষেত্রে হয় নিষ্ক্রিয়। কর্মদক্ষতা, গৌরব, আত্মনিয়ন্ত্রণের সক্ষমতা, দায়িত্বানুভূতি, সৃজনশীলতা, লক্ষ্য অর্জনের অঙ্গীকার ও উদ্যোগসহ যে সকল যোগ্যতা তাদের শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসিয়েছিল, তার সবগুলোই ধীরে ধীরে তাদের মধ্য থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ প্রত্যেক মানুষকেই বিপুল পরিমাণ সম্ভাবনা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। ব্যক্তি-চরিত্র ও অভ্যাসের ক্ষেত্রে আমরা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, যা আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করে। যে পরিবেশে আমরা বেড়ে উঠি, সেটি হয় আমাদের সম্ভাবনাকে বিকশিত এবং জানাশোনার পরিধিকে প্রসারিত করে অথবা আমাদের সম্ভাবনাকে অপ্রকাশিত ও অপূর্ণাঙ্গ করে রাখে। এজন্য পিতা-মাতা সন্তানদের জীবন ধারণের জন্য যে পরিবেশ তৈরি করে, তা সন্তানদের ভবিষ্যৎ জীবনের ওপর ব্যাপাকভাবে প্রভাব ফেলে।

তরুণরা কীভাবে নিজের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারবে এবং তা উৎকৃষ্ট উপায়ে ব্যবহারে উৎসাহ পাবে? মুসলিম তরুণরা কীভাবে তাদের চিন্তা-চেতনায় ও কর্মে আরও উৎসাহি হতে পারে? যার মাধ্যমে তারা নিজের সম্প্রদায়কে পুনর্জাগরিত করতে পারে এবং উপযুক্ত উপায়ে মানবতার সেবা করতে পারে?

এর উত্তর হচ্ছে—অনুপ্রেরণা, আদর্শ মডেল এবং বেড়ে উঠা ও সফলতার মধ্যে ভারসাম্য। এই পথে তারা ব্যর্থ হতে পারে। কিন্তু সচেতন অভিভাবক মাত্রই জানেন, আত্মমর্যাদার সাথে কীভাবে এই সমস্ত ব্যর্থতা মোকাবিলা করতে হয়।

আত্মমর্যাদাবোধ

আত্মমর্যাদাবোধ একটি ইতিবাচক জীবনদর্শন, যা ব্যক্তির ইমেজ, আত্মসচেতনা ও আত্মবিশ্বাসকে ফুটিয়ে তোলে। আল্লাহ তায়ালা বিশ্বাসীদের আত্মমর্যাদাবোধ অর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে নিজেদের ব্যাপারে আমাদের সর্বোচ্চ সুধারণা রাখতে হবে। পিতা-মাতা কীভাবে সন্তানের আত্মমর্যাদাকে পরিমাপ করেন, নিচে কিছু ব্যক্তিগত গুণাবলি তুলে ধরা হলো; যার মাধ্যমে মাতা-পিতা ইচ্ছা করলে সন্তানদের আত্মমর্যাদাবোধের লেভেল পরিমাপ করতে পারেন।

সহনশীলতা	দুঃসাহসিকতা	উচ্চাকাঙ্ক্ষা	ধার্মিকতা
প্রফুল্লতা	সচেতনতা	বিবেচনাবোধ	আত্মবিশ্বাস
নির্ভরযোগ্যতা	দৃঢ় প্রতিজ্ঞা	বন্ধু ভাবাপন্নতা	শক্তিময়তা
পরোপকারের স্পৃহা	সততা	বিশ্বস্ততা	উৎসাহ-উদ্দীপনা
প্রাণময়তা	পরিচ্ছন্নতা	ধৈর্য	উদ্যম
দায়িত্বশীলতা	চিন্তাশীলতা	সময়ানুবর্তিতা	জনপ্রিয়তা

www.nagorikpathagar.org

প্রত্যেক কিশোরেরই স্বতন্ত্র গুণাবলি রয়েছে এবং তাদের সেভাবেই মূল্যায়ন করতে হবে। এটা মানুষের প্রকৃতিগত ব্যাপার; কিশোর হোক বা প্রাপ্তবয়স্ক হোক, মানুষ তার প্রিয়জনদের নিকট থেকে সমানভাবে সম্মান ও স্বীকৃতি পাবে। এই বিষয়টি আল্লাহর রাসূল ﷺ খুব ভালোভাবেই বুঝতেন। এজন্য তিনি প্রত্যেক সাহাবির প্রতি এমনভাবে মনোযোগ দিতেন—সবাই মনে করত, রাসূল ﷺ তাঁকেই বেশি আপন ভাবেন। ছেলেমেয়েদের ইতিবাচক যোগ্যতাকে প্রশংসার মাধ্যমে উৎসাহ দেওয়া পিতা-মাতার দায়িত্ব। তবে প্রশংসা হতে হবে যথাযথ ও সময়োপযোগী। অযাচিৎ প্রশংসার দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে। এর ফলে কিশোরদের পদস্খলনও ঘটতে পারে। কারণ, এটি তাদের আত্মতুষ্টিতে ভোগায়।

কিশোররা শিক্ষার্থী; তাই তাদের দ্বারা যেকোনো ভুল সংঘটিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক বিষয়। সচেতন অভিভাবক বাচ্চার সব দিকে সতর্ক নজর রাখেন। যেহেতু তারা ধীরে ধীরে দায়িত্বশীল জীবনে পদার্পণ করবে, তাই তারা যাতে ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, এজন্য তাদের ছোটো ছোটো অনিচ্ছাকৃত ভুলগুলো মার্জনা করা উচিত; কিন্তু ইচ্ছাকৃত বড়ো ভুলগুলোর ব্যাপারে কোনোভাবেই ছাড় দেওয়া যাবে না। বৃদ্ধ বয়সে রূঢ়ভাবে অন্যের কাছ থেকে শিক্ষা অর্জনের চেয়ে কিশোর বয়সেই উত্তম ও যথাযথ পরিবেশে সংশোধিত হওয়া উচিত।

সন্তানদের সংশোধনের ক্ষেত্রে অভিভাবকদের উচিত পরিস্থিতি নিজ হাতে নিয়ন্ত্রণ করা, যাতে পূর্ববর্তী ভুলগুলো পুনরায় সংঘটিত না হয়। দয়া ও শ্রদ্ধা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনে কঠোরতা ও অপমানের চেয়ে কার্যকরভাবে কাজ করে। পিতা-মাতার কখনোই সন্তানদের ব্যাপারে কটু মন্তব্য করা কিংবা তাদের হীন করা উচিত নয়। কারণ, এটা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে ব্যর্থতার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

সন্তানদের অনুপ্রেরণা জোগাতে এবং তাদের মাঝে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মাতা-পিতার প্রত্যাশাও গুরুত্বপূর্ণ। অতি নিম্নমানের প্রত্যাশা সন্তানদের আত্মমর্যাদা ও গৌরবকে ধ্বংস করে দিতে পারে। আবার অতি উচ্চমানের প্রত্যাশা তাদের ওপর অতিরিক্ত চাপের অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারে, যা তাদের সফলতার সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করে দেয়।

অতি সম্ভাবনাময়ী সন্তানদের অভিভাবকদের উচিত তাদের শারীরিক, মানসিক ও অনুভূতিগত উৎকর্ষের দিকে লক্ষ রাখা। তড়িৎকর্মা কিশোররা বড়ো ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারে। সুতরাং তাদের সৃষ্টিশীল পরামর্শ প্রদান প্রয়োজন,

www.nagorikpathagar.org

যাতে তারা কোনো ধরনের বিরক্তি ছাড়াই নিজেদের তৈরি করতে পারে। অন্যদিকে কম সম্ভাবনাময়ী সন্তানের পিতা-মাতার উচিত কিশোরদের যথাযথ যত্ন নেওয়া এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা নিশ্চিত করা।

বর্তমান সময়ে (Inclusive) অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি অনেক বেশি আলোচিত হচ্ছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা সবার অংশগ্রহণমূলক এমন একটি সমাজ সৃষ্টি করে, যেখানে সমাজ গঠনে সবার অবদান থাকে এবং কেউ কারও বোঝা হয়ে থাকে না। কিশোরদের মধ্যে যদি শিক্ষাগত, আচরণগত বা অন্য কোনো ধরনের সমস্যা দেখা দেয় অথবা শারীরিক বা মানসিক অক্ষমতা দেখা দেয় কিংবা বিশেষ কোনো গুণাবলি তাদের মধ্যে প্রকাশিত হয়, তবে কোনো অবস্থায় তাদের যেন হেয় করা না হয়। এই সময়ে তাদের প্রয়োজন পূর্ণ সমর্থন ও বিশেষ যত্ন। যে সকল কিশোরকে বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অতিক্রম করতে হয়, তাদের অনেকেই এমন সোনার মানুষে পরিণত হয়—যারা সভ্যতা বিনির্মাণে বিশেষ অবদান রাখে।

উৎসাহ

কিশোররা সাধারণত আবেগপ্রবণ, ধারণানির্ভর ও সংবেদনশীল হয়। ফলে তারা জীবনের বাস্তবতা ও জটিলতার পর্যায়ে পৌঁছতে পারে না। তাই এই সময়ে তাদের প্রয়োজন গুরুজনদের পক্ষ থেকে অবিরত উৎসাহ, প্রশংসা ও ভালো কাজের স্বীকৃতি। এগুলো না করা হলে তারা কর্মের উদ্দীপনা হারিয়ে ফেলে।

তাদের ব্যাপারে অকর্মা, ব্যর্থ, নিরাশাবাদী, বেয়াদব, বোকা ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। কারণ, এগুলো তাদের কর্মস্পৃহা ধ্বংস করে দেয়। আপনার সন্তানের সাথে অন্যের সন্তান কিংবা দুই সহোদরের মধ্যে তুলনা করা হয়তো যেতে পারে, কিন্তু অহেতুক তুলনা তাদের আত্মবিশ্বাসকে দুর্বল করে দেয় এবং তাদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি করে।

বিদ্যালয়ের কার্যক্রম কিংবা পরীক্ষার ফলাফল কিশোরদের হতাশার কারণ হতে পারে। এই বিষয়ে পিতা-মাতার সতর্ক থাকতে হবে। কিশোরদের শিক্ষাজীবনের প্রত্যেকটি পরীক্ষায় এবং সকল কার্যক্রমে তাদের কাছ থেকে সর্বোচ্চ ফলাফল প্রত্যাশা করা অযৌক্তিক। বিদ্যালয়ের প্রাথমিক পর্যায়ে অতিরিক্ত চাপ জাতীয় পর্যায়ের পরীক্ষাগুলোতে সন্তানদের সফলতার হারকে নষ্ট করে দিতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

যে সকল কিশোর কর্ম-উদ্দীপনা হারিয়ে ফেলে, তারা শুধু আত্মবিশ্বাসহীনতায়ই ভোগে না; বরং একপর্যায়ে আত্মহরণমূলক আচরণের দিকে ঝুঁকে পড়ে। তারা নিজেদের নিগৃহীত ভাবতে শুরু করে এবং নিজের ক্ষতি করতে উদ্যত হয়। আর এমন আচরণের কারণে অভিভাবকরা সন্তানদের বকাঝকা করতে থাকে। এতে সন্তানদের সাথে পিতা-মাতার দূরত্ব তৈরি হয় এবং তাদের মাঝে পারস্পরিক বোঝাপড়া মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়। এগুলো পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। অবসাদগ্রস্ত সন্তানদের যত্ন সহকারে লালন-পালন করা প্রয়োজন। বিশেষ করে তাদের সাথে আচরণ ও কথাবার্তায় পিতা-মাতাকে যত্নবান ও সতর্ক থাকতে হবে, যাতে সন্তানরা নিজেদের ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করে এবং নিজেদের সম্ভাবনাকে পুনরায় কাজে লাগানোর মানসিক শক্তি লাভ করতে পারে। আমাদের সন্তানদের নিকট তার অসাধারণ সম্ভাবনার কথা তুলে ধরতে হবে এবং এই সম্ভাবনাকে সর্বোত্তম উপায়ে কাজে লাগিয়ে লক্ষ্য অর্জনের জন্য উৎসাহ প্রদান করতে হবে।

অনুকরণীয় আদর্শ

অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব তরুণদের মাঝে একধরনের অদৃশ্য মনস্তাত্ত্বিক নেতৃত্বের আভাস দেয়। ইসলামের ইতিহাস অনুকরণীয় আদর্শিক নারী-পুরুষে ভরপুর। রাসূল ﷺ সকল বয়সের মানুষের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শিক ব্যক্তিত্ব।

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> ‘তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে তাদের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের ওপর আস্থা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।’ সূরা আহজাব : ২১

বর্তমানে অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব কারা? এই ক্ষেত্রে বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তের মুসলিম তরুণরা এক নিরাশাপূর্ণ চিত্র অবলোকন করছে। তাদের চারদিকের পরিবেশ আজ উম্মাহর ব্যর্থতা ও অক্ষমতায় পরিপূর্ণ। বর্তমান বিশ্ব চরম নিপীড়িত অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান মুসলিম নেতৃত্বের প্রতি মুসলিম জনসাধারণের আস্থা নেই বললেই চলে। অনুকরণীয় আদর্শিক ব্যক্তিত্বের সংখ্যাটাও দুঃখজনকভাবে খুবই কম। এই শূন্য জায়গাটা দখল করে নিয়েছে তথাকথিত সেলিব্রেটিরা, যাদের জীবনের লক্ষ্যই হলো ‘খাও-দাও, ফুর্তি করো’। তারা ভোগবাদী সংস্কৃতি ও বস্তুবাদী আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থের হাতিয়ারস্বরূপ ব্যবহৃত হচ্ছে।

www.nagorikpathagar.org

সর্বোপরি সমাজ ও রাষ্ট্রে যোগ্য অনুকরণীয় ব্যক্তিত্বের ঘাটতি মুসলিম তরুণদের জন্য এক বিশাল চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সন্তানদের জন্য সফলতা অর্জন গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তাদের জানতে হবে—এই সফলতার অর্থ কী? তাদের মধ্যে লক্ষ্য নির্ধারণের সাহস এবং তা অর্জন করার সক্ষমতা থাকতে হবে। এজন্য তাদের এমন এক আদর্শিক ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন, যে তাদের সফলতার পন্থা বাতলে দেবে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রেষণা জোগাবে। এক্ষেত্রে পিতা-মাতার চেয়ে তাদের আপনজন আর কে আছে? পিতা-মাতাকেই সন্তানের অনুকরণীয় ব্যক্তি হতে হবে।

পিতা-মাতা সন্তানদের আকাশ ছোঁয়া লক্ষ্য নির্ধারণে সহযোগিতা করবে—এটাই স্বাভাবিক। তবে এই ক্ষেত্রে কোনো ধরনের বাড়াবাড়ি কাম্য নয়। তাদের জন্য এমন লক্ষ্য নির্ধারণ করা উচিত, যা নির্ধারিত সময়ে অর্জন করা তাদের জন্য সম্ভব। সন্তানের সামর্থ্যের সীমা মাথায় রেখেই লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে।

সন্তানদের সামনে সফলতার আসল অর্থটা তুলে ধরাও আমাদের দায়িত্ব। আল্লাহ মানুষের অন্তরের মধ্যে আত্মতৃপ্তি ও প্রশান্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করে দিয়েছেন, যা শুধু অর্থপূর্ণ উপায়ে সময়কে কাজে লাগানোর মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব। মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কালামে ইরশাদ করেন—

> ‘হে নবি! আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে।’ সূরা আহজাব : ৪৫

মুসলিমদের প্রথম প্রজন্ম তাঁদের সাথিদের মাঝে অসামান্য নিদর্শন উপস্থাপন করে গিয়েছেন, যা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল। তাঁদের ইসলামের প্রতি আহ্বানের ধরন ও উপকরণ তৃষ্ণার্ত আরবদের মাঝে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। এই অনুপ্রেরণায় ইসলামের প্রতি তাঁদের যে গভীর উপলব্ধি তৈরি হয়েছিল, তা তাঁদের সামনে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করেছে। সাহাবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদেরও এমন অনুকরণীয় চরিত্র উপস্থাপন করা উচিত, যাতে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হতে এবং সামনে এগিয়ে যেতে উৎসাহ পায়।

ভারসাম্যপূর্ণ লালন-পালন

সন্তান লালন-পালনে সফলতা তখনই আসে, যখন পিতা-মাতা সন্তানের শারীরিক-মানসিক অনুভূতি ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের প্রতি সব সময় নজর রাখেন।

www.nagorikpathagar.org

এ সময়ে পিতা-মাতার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সন্তানদের মধ্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি এবং তাদের ঈমানকে জাগ্রত করা। যে সকল মুখস্থবিদ্যা অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রের তরুণদের সৃষ্টিশীলতা পঙ্গু করে দিয়েছে, সেগুলো অর্জনের পরিবর্তে মুসলিম তরুণদের চিন্তাশীল হতে এবং তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বৈশ্বিক জ্ঞান অর্জন এবং উম্মাহর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য প্রেষণা দেওয়া উচিত।

যে কারও জীবনে ভারসাম্য বজায় রাখা সর্বাবস্থায় সহজ হয়ে উঠে না। এটি বাস্তবায়নের চেয়ে বলা অনেক সহজ। প্রাপ্তবয়স্ক বাচ্চারা সাধারণত অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব কিংবা সমাজের রোলমডেলদের অনুসরণ করতে পছন্দ করে। তাই পিতা-মাতার উচিত এমন কারও সাথে সন্তানদের সংযোগ স্থাপন করে দেওয়া, যাদের সাথে তারা ইতিবাচক উপায়ে ভারসাম্যপূর্ণ জীবন পরিচালনা করতে পারে; যারা নিজেরাও ইতিবাচক ও ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী। এই ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ-এর জীবনী অধ্যয়নকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক হিসেবে কাজে লাগানো যেতে পারে। যাতে তরুণরা নবিজির জীবন থেকে অনুপ্রেরণা পায়, তাঁকে ভালোবাসতে পারে এবং তাঁর পবিত্র জীবন পদ্ধতিকে অনুসরণ করতে পারে। ইসলামের ইতিহাসে এমন অসংখ্য আদর্শিক মহান ব্যক্তিত্ব রয়েছে, যাদের থেকে মুসলিম তরুণরা অনুপ্রেরণা পেতে পারে।

প্রকৃত সফলতার দীক্ষা

প্রত্যেক পিতা-মাতাই সন্তানদের সফলতা কামনা করে। স্বপ্ন দেখেন; যদিও সফলতার সংখ্যা ভিন্ন হতে পারে। সফলতার সাথে আত্মবিশ্বাসের একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে। ইসলামের দৃষ্টিতে সফলতার অর্থ হলো—ভারসাম্যপূর্ণ উপায়ে দুনিয়া ও পরকালীন জীবনের কল্যাণ অর্জন করা এবং একটির কারণে অপরটির ক্ষতিসাধন না করা। অর্থাৎ একই সঙ্গে দুনিয়া ও পরকালের কল্যাণ অর্জনই চূড়ান্ত সফলতা।

আল্লাহর রাসূল ﷺসহ অন্য সকল প্রেরিত নবি-রাসূল মানবতার মহান শিক্ষক ছিলেন। পবিত্র কুরআনে শোয়াইব ؑ-এর কথা এভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে—

> ‘আমার সফলতা একমাত্র আল্লাহর দয়ার ওপরই নির্ভরশীল।’
> সূরা হুদ : ৮৮

www.nagorikpathagar.org

প্রত্যেক মুসলিমের জন্য এটি বিশ্বাস করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ, সফলতা একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। সচেতন অভিভাবকগণ উত্তম শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে সন্তানদের মঙ্গলের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। পিতা-মাতাকে অবশ্যই সন্তানদের জন্য মানসম্মত স্কুল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুঁজে বের করতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে, নিজের ঘরই সবচেয়ে বড়ো আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান—যেখানে জীবনের সূচনালগ্ন থেকেই শিশুদের প্রকৃত শিক্ষা শুরু হয়। খলিফা উমর ﵁-এর মতে, এর সময়কাল হচ্ছে বাচ্চার জন্ম থেকে সাত বছর। এটি এমন একটি সময়, যখন পিতা-মাতার কর্তব্য হলো নিজের বেশিরভাগ সময় ও শক্তি সন্তানের পেছনে বিনিয়োগ করা, তাদের সাথে খেলাধুলা করা এবং খেলার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া।

পর্যায়ক্রমিক উন্নতি

সফলতার জন্য মানবীয় যোগ্যতা, তথা ইচ্ছাশক্তি, অধ্যবসায়, সহনশীলতা ও নিয়ন্ত্রিত জীবন অপরিহার্য উপাদান। এই সকল গুণাবলি হঠাৎ করে বা কাকতালীয়ভাবে অর্জিত হয় না। এর জন্য প্রয়োজন নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা এবং ধাপে ধাপে উন্নয়ন। সকল মানুষ সমানভাবে এই সকল গুণের অধিকারী হয় না। অনেকের মধ্যে ছোটোকাল থেকেই এগুলোর একটি কিংবা একাধিক গুণাবলির ঘাটতি থাকে। পরিবার ও চারপাশের ইতিবাচক পরিবেশ এই সকল ঘাটতি অনেকটা পুষিয়ে নিতে পারে। সন্তানদের মধ্যে এই সকল গুণাবলি অর্জনে পিতা-মাতার বিরাট ভূমিকা রয়েছে।

নিজেদের প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্রে সন্তানদের উৎসাহের প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রে তাদের সাহস জোগানোর পাশাপাশি সকল ধরনের চাপমুক্ত রাখতে হবে। তাদের ভালো কাজের স্বীকৃতি, লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রেষণা এবং পিতা-মাতার সাথে পর্যাপ্ত পরিমাণ সময় কাটানোর সুযোগ দিতে হবে। পিতা-মাতা যদি সন্তানদের চরিত্রের মাঝে কার্যকর উপায়ে আল্লাহ ও রাসূল ﷺ-এর প্রতি ভালোবাসা ও বিশ্বাস, আত্মনির্ভরশীলতা, আত্মবিশ্বাস ও আত্মপর্যালোচনার সমন্বয় ঘটাতে পারে, তাহলে তা তাদের ভারসাম্যপূর্ণ ও সমৃদ্ধ জীবনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। পিতা-মাতা সন্তানদের সাথে চিরকাল থাকতে পারবে না, কিন্তু নিম্নোক্ত কাজগুলোর মাধ্যমে তারা সন্তানদের জীবনে সফলতার বীজ বপন করে যেতে পারে—

www.nagorikpathagar.org

১. জোর-জবরদস্তির পরিবর্তে উৎসাহদানের মাধ্যমে তাদের আগ্রহী করে তোলা।
২. স্বেচ্ছাচারিতার পরিবর্তে যথাযথ দিকনির্দেশনা প্রদান।
৩. নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রেখে তাদের মেধার মূল্যায়ন।
৪. সহজ উপায়ে তাদের জন্য দৈনন্দিন কাজের রুটিন নির্ধারণ।
৫. নিয়ন্ত্রণ ও চাপ প্রয়োগের পরিবর্তে সমর্থন ও উৎসাহ প্রদান।
৬. কোনো ধরনের অযথা হস্তক্ষেপ ছাড়াই তাদের নিজ নিজ পছন্দের প্রতি গুরুত্ব প্রদান।

পিতা-মাতার উচিত সন্তানদের থেকে অল্প সময়ে বিশাল কিছু প্রত্যাশা না করা। তবে তাদের শক্তি-সামর্থ্যের যথাযথ প্রবৃদ্ধির ব্যাপারে অবশ্যই যত্নশীল হতে হবে। কারণ, এর মাধ্যমে তারা ধীরে ধীরে নিজেদের উন্নতি ঘটাতে সক্ষম হয়। 'পৃথিবী একটি জটিল ও প্রতিযোগিতাপূর্ণ জায়গা। এখানে জীবন চলার পথ কণ্টকাকীর্ণ'—এই বিশ্বাস জীবনকে চ্যালেঞ্জিং ও দুঃসাহসিক করে তোলে। এই বিশ্বাসকে সন্তানদের হৃদয়ে বদ্ধমূল করার মাধ্যমে তাদের জীবনকে উপভোগ্য করে তুলতে হবে। তাদের বোঝাতে হবে—জীবন খুবই কঠিন, কাউকে ওপরে উঠতে হলে সফল হওয়ার দৃঢ় সংকল্প থাকতে হবে। আন্দালুসিয়ার কিংবদন্তি ইমাম কুরতুবি (রহ.) একবার বলেছিলেন—

> 'একটি প্রথম শ্রেণির ইচ্ছা এবং দ্বিতীয় শ্রেণির মেধা, একটি প্রথম শ্রেণির মেধা এবং দ্বিতীয় শ্রেণির ইচ্ছার ওপর জয়ী হয়।'

ব্যর্থতার মোকাবিলা

মানুষ প্রতিনিয়ত ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়। কিছু সাময়িক সফলতাও ব্যর্থতার কারণ হতে পারে। ব্যর্থতাকে যেকোনো প্রচেষ্টার সর্বশেষ উপায় হিসেবে না ভেবে, তা থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজের সামর্থ্যকে কাজে লাগানো উচিত। ব্যর্থতাকে আত্মোপলব্ধির অন্যতম সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থতাই সফলতার খুঁটি হিসেবে কাজ করে। এক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে—আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করার পর সফলতার জন্য আল্লাহর ওপর নির্ভর করব। যে মুসলিম প্রতিনিয়ত চেষ্টা চালিয়ে যায়, তার ব্যর্থতার কোনো কারণই নেই; যদিও তা মাঝেমধ্যে ব্যর্থ প্রচেষ্টা বলে মনে হতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

আমরা জীবনে যা কিছুই করি না কেন, আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত মহান প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন। কারণ, আমাদের নিয়্যাত ও প্রচেষ্টার ভিত্তিতেই প্রতিফল নির্ধারিত হবে।

'মানবজাতি সর্বদা দ্রুত সফলতা আশা করে।' সূরা আস-সফ : ১৩

'আর আমরা খুবই তাড়াহুড়োপ্রবণ।' সূরা বনি ইসরাইল : ১১

পুরো জীবনজুড়ে সন্তানরা নিশ্চিতভাবে অনেক ব্যর্থতার সম্মুখীন হবে। একে মোকাবিলা করার জন্য অভিভাবকদের সন্তান থেকে ব্যর্থতাকে আলাদা করার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। কেউ সবকিছুতে দক্ষ হতে পারে না। সুতরাং এক জায়গার ব্যর্থতার অর্থ এই নয়—সে সারাজীবনেই ব্যর্থ। ব্যর্থতা ইতিবাচক মনোভাবসম্পন্ন তরুণদের লক্ষ্যকে আরও শাণিত করে এবং তাদের মধ্যে অনুপ্রেরণা জোগায়। ব্যর্থতার মাধ্যমে তারা নতুন নতুন যোগ্যতা অর্জন করে এবং ব্যর্থতাকে কাটিয়ে উঠার পথ ও পাথেয় জানতে পারে। এটি তাদের মাঝে আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি করে। ব্যর্থতার সময়ে পিতা-মাতার কর্তব্য হলো—সন্তানদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া। যাতে তারা এই সকল বিপদসংকুল অবস্থা থেকে শিক্ষা অর্জন করে পূর্বের চেয়ে জোরালোভাবে এবং বিজ্ঞতার সাথে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে পারে।

তরুণরা কর্মশক্তিতে ভরপুর; তারা পুতুলতুল্য নয়। তারা সৃষ্টিশীল ও প্রতিভাবান। তাদের মধ্যে একই সঙ্গে উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ভয় ও উদ্‌বিগ্নতা কাজ করে। পিতা-মাতার দায়িত্ব হচ্ছে তাদের সার্বিক যত্ন নেওয়া। তাদের স্বপ্ন-প্রণোদিত করতে প্রতিনিয়ত চেষ্টা ও দুআ করা এবং তাদের ব্যাপারে নেতিবাচক হওয়া থেকেও বিরত থাকা।

কিশোর মননে উৎসাহদান

সন্তানের বেড়ে উঠায় সাহায্যের জন্য পিতা-মাতার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় উচ্চ ডিগ্রিধারী হওয়া আবশ্যক নয়; কিংবা খুব বিত্তশালী হওয়াও জরুরি নয়। এই বিষয়গুলো হয়তো সন্তান প্রতিপালনে বাড়তি সুবিধা যোগ করতে পারে, কিন্তু কিশোরদের অনুপ্রাণিত করার জন্য এগুলো অত্যাবশ্যকীয় নয়। আমাদের যা দরকার, তা হলো—সন্তানদের সাথে পারস্পরিক বোঝাপড়া, লেগে থাকা এবং বাড়িতে থাকাকালীন সময়ে তাদের সাথে সার্থক সময় কাটানো। স্কুল ও সামাজিক পরিবেশ কিশোরদের স্বতঃপ্রণোদিত (Self-motivated) হওয়ার দিকে ধাবিত করে।

www.nagorikpathagar.org

কেবল উৎসাহ প্রদর্শন এবং সার্থক সময় কাটানোর মাধ্যমে সাধারণ পিতা-মাতাও অসাধারণভাবে কিশোর সন্তানদের অনুপ্রাণিত করতে পারেন। ভালোবাসার ভাষা সকলেই বোঝে। তাই সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার ভালোবাসা প্রকাশ এবং তাদের ভালো বিষয়ের প্রতি পিতা-মাতার আগ্রহ সন্তানদের মাঝেও ভালোবাসা তৈরি করে।

বিদ্যালয়ে উৎসাহ : সন্তানদের জন্য এমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রয়োজন, যেখানে তারা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবে এবং প্রতিনিয়ত উৎসাহ-উদ্দীপনা পাবে। নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর মাধ্যমে কিশোররা উৎসাহ পেয়ে থাকে—

- শিক্ষার পরিবেশ
- ভালো নিয়মনীতি
- উচ্চাকাঙ্ক্ষা
- বিভিন্ন লক্ষ্য অর্জনে পাঠ্যসূচি নির্ধারণ
- অধিকার ও দায়িত্বে স্বীকৃতি
- স্পষ্ট ও অনুকূল শৃঙ্খলা
- পারস্পরিক সম্মান ও আস্থার ভিত্তিতে সম্পর্ক স্থাপন
- ইতিবাচক প্রতিযোগিতা ও
- সৃষ্টিশীল কার্যক্রমে অংশগ্রহণ

একদিকে কঠোর শৃঙ্খলা, সুন্দর আচার-আচরণ পদ্ধতি, পাঠ্যক্রমের বাইরে সৃষ্টিশীল কার্যক্রম এবং ভালো ফলাফল, অন্যদিকে একটি নিরাপদ পরিবেশ বিদ্যালয়ে সন্তানদের মনোযোগ বৃদ্ধিতে এবং তাদেরকে পরিতৃপ্ত রাখতে সহায়তা করে।

ঘরের পরিবেশে উৎসাহ : পরিবারে পিতা-মাতাকে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে, যেখানে সন্তানরা সবার ভালোবাসা অনুভব করবে এবং নিজেদেরকে একজন বিবেচনাযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে চিন্তা করবে। পিতা-মাতাকে মনে রাখতে হবে, সন্তানদের সফলতার পূর্ণাঙ্গ মালিকানা আল্লাহ তায়ালার হাতে। তাই সন্তানরা কোনো ভুল করলে চড়াও না হয়ে তাদের ভুল ধরিয়ে দিতে হবে এবং ভুলগুলোর গঠনমূলক সমালোচনা করতে হবে। ভুল করা মানবজাতির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। ইসলামে শুধু প্রচেষ্টার জন্য রয়েছে একটি পুরস্কার। আর সফল প্রচেষ্টার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ পুরস্কার।

www.nagorikpathagar.org

সন্তানরা যদি শৃঙ্খলা এবং ইসলামি আচার-আচরণের সীমা-পরিসীমার ব্যাপারে জ্ঞাত থাকে, তাহলে এই সকল সীমা-পরিসীমার মধ্যে থেকেই তারা সফলতা অর্জন করতে পারবে। অভিভাবক হিসেবে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে—

- সন্তান এবং আমাদের মাঝে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা না রাখা।
- রসিক মনোভাবাপন্ন হওয়া, যাতে সন্তানরা আমাদের সাথে মিশতে পারে। মনে রাখতে হবে, রসহীন ব্যক্তি জড়পদার্থ তুল্য।
- যেকোনো কাজে তাদের ওপর আস্থা রাখা।
- যেকোনো কাজে দায়িত্ব গ্রহণে তাদের উৎসাহিত করা।
- কোনো কাজের নির্দেশনা দেওয়ার আগে তাদের পরিপক্বতা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা।
- নিয়মিত উপদেশের পাশাপাশি বিভিন্ন উপমার মাধমে তাদের শিক্ষা দেওয়া।
- তাদের পছন্দকে অগ্রাধিকার দেওয়া (বিভিন্ন রকমের পছন্দের সুযোগ থাকলে তা তাদের সামনে তুলে ধরা)।
- বড়ো বড়ো লক্ষ্যকে বাস্তবানুগ অর্থে তাদের সামনে তুলে ধরা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লক্ষ্য অর্জনের অনুভূতির মাধ্যমে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করা।
- তাদের নতুন নতুন ধারণার সাথে পরিচিত করানো। আমাদের সাথে দ্বিমত করা সত্ত্বেও তাদের চিন্তা-প্রস্তাবনার উপকারী দিকের প্রতি লক্ষ রাখা।
- তাদের ভুলগুলোকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করা।
- খুব চাপের মুহূর্তেও তাদের সঙ্গ দেওয়া।
- সন্তানদের প্রশংসা করা এবং তাদের ভালো কাজের স্বীকৃতি দেওয়া।

প্রশংসা করার ক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রাখা জরুরি

- নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রশংসা করা।
- স্পষ্টবাদিতা ও সত্যতা অবলম্বন করা। শর্তমুক্ত শব্দ যেমন : 'যদি' 'কিন্তু' ইত্যাদি পরিহার করা।
- স্বতঃস্ফূর্ততা প্রকাশ করা।
- শারীরিক অভিব্যক্তি প্রকাশ করা। যেমন : হাসি, আলিঙ্গন, চুমু দেওয়া।

www.nagorikpathagar.org

- তাদের কৃতিত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে উদার মনের পরিচয় দেওয়া।
- সতর্কতা অবলম্বন করা। অতিরঞ্জিত প্রশংসার মাধ্যমে তাদের সম্ভাবনাকে নষ্ট না করা।

সামাজিক উৎসাহ : সন্তানদের মানুষ করার ক্ষেত্রে পরিবার যে সমস্ত বিষয়ে কঠোর সংগ্রাম করে, সমাজের উচিত এই ব্যাপারে তাদের পাশে থাকা। মুসলিম সমাজে ইসলামি মূল্যবোধের অনুশাসন এবং সমাজের সার্বিক অগ্রগতির জন্য সমাজকে সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদানে ইমাম ও সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ বিরাট ভূমিকা রাখতে পারেন।

মসজিদ, ইসলামিক সেন্টার এবং অন্যান্য সংস্থার মাধ্যমে ইসলামি সমাজের কর্তব্য হচ্ছে—

- উন্নত মুসলিম ও সচেতন নাগরিক তৈরির উদ্দেশ্যে তরুণদের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- তরুণদের জন্য সমাজকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণের দরজা খোলা রাখা, যেন তারা উৎসাহের সাথে সমাজকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে।
- তরুণদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করা এবং বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় তাদের অংশগ্রহণ করানো।
- তরুণদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে পেশাদারিত্ব নিশ্চিত করতে চেষ্টা করা।
- একজন আত্মপ্রত্যয়ী মুসলিম হিসেবে বেড়ে উঠার ক্ষেত্রে তরুণরা যেন সমাজকে নিজেদের অংশ মনে করে—এমন শিক্ষা ও পরিবেশ নিশ্চিত করা।
- তরুণদের তাদের ইসলামি ও সামাজিক দায়িত্ব পালনে উৎসাহিত করা।

www.nagorikpathagar.org

পারিবারিক পরিবেশ

'একবার রাসূল ﷺ হাসান ইবনে আলি رضي الله عنه-কে চুম্বন করলেন। সে সময় আল আকরা ইবনে হারিস আত-তামিমি رضي الله عنه তাঁর পাশে বসা ছিলেন। আল আকরা رضي الله عنه বললেন—"আমার দশটি সন্তান রয়েছে। তাদের কাউকে আমি কখনো চুম্বন করিনি।" রাসূল ﷺ তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন—"যে মানুষের প্রতি দয়া করে না, তার প্রতিও দয়া করা হয় না।"'—আল আদাবুল মুফরাদ, বুখারি

পারিবারিক পরিবেশের গুরুত্ব

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তুলনায় মাধ্যমিকের কিশোররা বিদ্যালয় ও পরিবারের বাইরে বেশি সময় ব্যয় করে। তারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের থেকে বেশি স্বাধীনতা পায় এবং চারদিকের দুনিয়া সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে শুরু করে। বিদ্যালয়ের নিয়মকানুন, শিক্ষক ও বন্ধু-বান্ধব, টিভি প্রোগ্রাম, ইন্টারনেট ও বহির্বিশ্বের দ্বারা তাদের চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন হয়, যা তাদের কাজকর্মকে প্রভাবিত করে। এর পাশাপাশি পারিবারিক পরিবেশ, পিতা-মাতা, বর্ধিত পরিবার এবং সমাজে বিভিন্ন মানুষের আচার-আচরণের দ্বারাও তরুণদের চালচলন ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়।

যে সমাজের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের চর্চা হয় না এবং যেখানে সামাজিক মর্যাদা নির্ধারিত হয় সম্পত্তি ও পদ-পদবির ওপর নির্ভর করে, সে সমাজে পারিবারিক পরিবেশই কিশোরদের আধ্যাত্মিক শিক্ষার একমাত্র উপায়। একজন মানুষের মর্যাদা তার তাকওয়া ও চারিত্রিক মাধুর্যতার ওপর নির্ভর করে—এই বিষয়টি কিশোর মন-মগজে ক্রমান্বয়ে প্রবেশ করাতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

পিতা-মাতার উচিত সন্তানের পেছনে সার্থক সময় ব্যয় এবং তার সুস্থ মনন গঠনে সহায়তা করা। এই ক্ষেত্রে পিতা-মাতাকে অনুকরণীয় চরিত্রের অধিকারী হতে হবে, যাতে কিশোররা সেলিব্রেটিদের পরিবর্তে নিজ পরিবারেই অনুসরণীয় আদর্শ খুঁজে পায়।

এর পাশাপাশি সন্তানদের বিশেষ প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলির প্রতিও পিতা-মাতার খেয়াল রাখতে হবে। সন্তানদের সমস্যা একেকজনের ক্ষেত্রে একেক ধরনের হতে পারে। এই সকল সমস্যার নির্দিষ্ট ও একক কোনো সমাধান নেই। তাই অভিভাবকদের সৃষ্টিশীল ও অগ্রণী চিন্তার অধিকারী হতে হবে, যাতে তারা সন্তানদের যাবতীয় সমস্যা সমাধান করতে এবং চারপাশের বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি থেকে ফিরিয়ে সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে পারেন।

পরিবারই কিশোরদের ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত্তি

পরিবার এমন একটি স্থান, যেখানে কিশোরদের নিঃশর্তভাবে ভালোবাসা হয়, তাদের মতামত গ্রহণ করা হয় এবং নিশ্চয়তা বিধান করা হয়। পারিবারিক পরিবেশে কিশোররা আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এর মাধ্যমে তারা বহির্বিশ্বে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে। এগুলো তখনই সম্ভব, যখন পিতা-মাতা দৃঢ় মানসিকতা ও ইসলামি গুণাবলিসম্পন্ন হন এবং নিজেদের আচার-আচরণে কঠোরতা পরিহার করে ভালোবাসাসহ পরিপূর্ণ সহমর্মিতা প্রদর্শন করেন। কিশোররা চারদিক থেকে যখন নানামুখী কথাবার্তা শুনতে পায়, তখনও যেন পরিবারের লক্ষ্য ঠিক থাকে। যে সকল পিতা-মাতা সন্তানদের ইসলাম শিক্ষা দিতে চায়; কিন্তু নিজেদের জীবনে ইসলামের অনুশাসন মেনে চলে না কিংবা ইসলামের ওপর সামাজিক রীতিকে প্রাধান্য দেন, তাদের এই আচরণ সন্তানদের বিভ্রান্ত করে। এর মানে এই নয়, সামাজিক রীতি সব ক্ষেত্রেই নেতিবাচক; বরং এটি সমাজের মানুষদের আত্মপরিচয়ের অংশ। এগুলোও মানুষের বিভিন্ন আচার-আচরণকে প্রভাবিত করে, তবে সকল সামাজিক রীতি অন্ধভাবে অনুসরণ করা যাবে না; অন্তত যেগুলো ধর্মীয় শিক্ষার বিরুদ্ধে যায়।

বয়ঃসন্ধিকাল সন্তানদের জীবনের আলাদা কোনো অংশ নয়। এই সময়টায় তারা বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। তাদের আচার-আচরণে অনেক পরিবর্তন আসে। মেজাজ রুক্ষ হয়। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ তৈরি হয়। ফলে তাদের সঠিক গাইড করা সম্ভব না হলে বিপথে যাওয়ার ব্যাপক সম্ভাবনা থাকে এবং এই প্রভাব তার জীবনের পুরোটা সময়জুড়েই থাকে। তাই পিতার উচিত

www.nagorikpathagar.org

এই সময়ে তাদের যোগ্য সঙ্গ দেওয়া, তাদের সাথে খোলামনে কথা বলা এবং বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দেওয়া।

ইসলামি অনুশাসনের অন্যতম রীতি হচ্ছে বয়ঃসন্ধিকালের পূর্বেই সন্তানদের এই ব্যাপারে অবগত করা; যদিও বয়ঃসন্ধিকালের আগে তা আবশ্যক নয়। যে সমাজে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা ব্যক্তিদের তাচ্ছিল্য করা হয় এবং ধার্মিকদের বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়, সে সমাজে সন্তানদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে হবে। তারা কী ধর্মীয় বিধিবিধান মেনে চলছে—সে ব্যাপারে তাদের যথেষ্ট অবগত করতে এবং নিজ ধর্মের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে হবে।

এক্ষেত্রে পিতা-মাতার কর্তব্য হচ্ছে, সন্তানদের ইসলামের মৌলিক অনুশাসনের সাথে পরিচিত করানো। বর্তমান সময়ের সাথে এগুলোর সামঞ্জস্যতা বোঝানো এবং এই সকল অনুশাসনের পেছনের যে সমস্ত প্রজ্ঞা রয়েছে, তা বর্ণনা করা। সন্তানদের সাত বছর বয়স থেকেই নামাজ আদায়ের শিক্ষা দিতে হবে। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বে সিয়াম পালন এবং পর্দার চর্চা শুরু করাতে হবে, যাতে প্রাপ্তবয়স্কে উপনীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এগুলো তাদের জন্য সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। তাদের মধ্যে ইসলামের প্রতি ভালোবাসা জন্মানোর উপায় হচ্ছে তাদের সামনে ইসলামের উদারতা, ধৈর্য ও সহানুভূতির ব্যাপারগুলো উপস্থাপন করা। রূঢ়তা তাদের অন্তরকে বিপথের দিকে ধাবিত করে। আর হঠাৎ করে ধর্মীয় অনুশাসন প্রয়োগ করলে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এজন্য ছোটোকাল থেকেই এগুলোর প্রতি তাদের অনুরক্ত করানো গুরুত্বপূর্ণ।

ইসলামে প্রতিটি বিষয়কে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করতে হবে। ইসলাম কখনো মৌলিক বিশ্বাস ও বিধিবিধানের ক্ষেত্রে আপস করে না। সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও কঠোর পরিশ্রমের সাথে সাথে উত্তম সামাজিক আচরণ, ইসলামি নিয়মকানুন, পরিচ্ছন্নতা ও লজ্জাবোধ একজন মুসলিমের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সকল মৌলিক মানবীয় যোগ্যতা ছাড়া একজন মুসলিম কখনো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে এবং সমাজের কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। তাই এই সব বিষয়ে অধিক গুরুত্বারোপ করতে হবে।

গৌণ বিষয়ে ইসলামে ছাড় রয়েছে। মৌলিক মূল্যবোধের চেয়ে বাহ্যিক অবয়বের প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ ধর্মীয় চেতনাবিরোধী। দিনশেষে একজন ভালো মানুষ এবং আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়াই একজন মুসলিমের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যেভাবে ফলের গুণাগুণ তার বৃক্ষের মান নির্ণয় করে, ঠিক সেভাবে একজন তরুণের আচার-আচরণে তার পারিবারিক অবস্থার প্রতিফলন ঘটে।

www.nagorikpathagar.org

পরিবার ও বিদ্যালয়ের পরিবেশে ভিন্নতা থাকতে পারে, কিন্তু এত বেশি পার্থক্য থাকা উচিত না, যাতে পরস্পরের পরিবেশ সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী হয়। কারণ, প্রত্যেক কিশোরের আচার-আচরণকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে এ দুটো পরিবেশের ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে। সন্তানদের মঙ্গলের ক্ষেত্রে পরিবার ও সমাজ পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। এক্ষেত্রে অভিভাবকদের সাথে শিক্ষকদের নিয়মিত যোগাযোগ ও সুসম্পর্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এতে বাড়ি ও স্কুলের মধ্যে সমন্বয় করা সহজ হয়।

সন্তানদের সার্থক সময়দান

একটি উত্তম ও কার্যকর পারিবারিক পরিবেশ তৈরির ক্ষেত্রে পিতা-মাতা উভয়েরই নিরবচ্ছিন্ন সাধনা ও মনোযোগ প্রয়োজন। আধুনিক সমাজে সন্তানদের অনিয়ন্ত্রিত চাহিদা পিতা-মাতার জন্য চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই পিতা-মাতার উচিত সন্তানদের প্রতিনিয়ত সঙ্গ দেওয়া, যাতে তারা এর বিকল্প হিসেবে অন্য কিছু না গ্রহণ করে। প্রত্যেক পিতা-মাতার সাথে সন্তানদের গভীর ও ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন অপরিহার্য। পরিবারকে ভালোবাসা, মমতাপূর্ণ ও ইসলামি ভাবধারায় পুষ্ট করে গড়ে তুলতে মায়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, বেঁচে থাকা এবং মানসম্মত জীবনযাপনের জন্য অর্থ উপার্জনের প্রচেষ্টার কারণে সন্তানদের সাথে পর্যাপ্ত সময় দান অনেকের জন্য খুবই কঠিন হয়ে যাচ্ছে। সন্তানদের সঙ্গে সময় কাটানোর ক্ষেত্রে কাজের অতিরিক্ত চাপ বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

প্রচলিত পরিবারগুলোতে মায়েরা পারিবারিক বিষয়গুলো দেখাশোনার পাশাপাশি সন্তানদের মানসিক বিকাশের জন্য ঘরে অবস্থান করেন। কিন্তু বর্তমানে অনেক মা পারিবারিক উপার্জন বৃদ্ধি কিংবা আধুনিক জীবনযাত্রার সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে নিজের ইচ্ছায় কিংবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বামীর চাপের কারণে বাইরে কাজ করতে বাধ্য হন। ফলে কিশোররা টেলিভিশন, কম্পিউটার ও অন্যান্য প্রযুক্তিগত বিনোদন সামগ্রীর মধ্যেই সময় কাটায়। এটা সন্তান ও পিতা-মাতার মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করে এবং তাদের মাঝে পারস্পরিক যোগাযোগকে কঠিন করে তোলে। বিশেষ করে সন্তানরা কীসে অভ্যস্ত হচ্ছে, সে ব্যাপারে পিতা-মাতা থাকে উদাসীন। অথচ পিতা-মাতা উভয়কেই এটি স্বীকার করতে হবে, সন্তানদের আধ্যাত্মিক, আবেগ ও মানসিক বিকাশের জন্য পিতা-মাতার মনোযোগ ও সাহায্য প্রয়োজন; যদি তারা বড়ো হয়ে যায় তবুও। কেবল প্রতিবন্ধী সন্তানের জন্যই অভিভাবকের সঙ্গ দরকার এমন নয়; সকল সন্তানের জন্যই তা দরকার।

www.nagorikpathagar.org

এক্ষেত্রে পিতা-মাতা উভয়কে এমন একটি উপায় বের করতে হবে, যাতে সন্তানদের গুণগত সময় দেওয়া এবং তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখা নিশ্চিত হয়। এক্ষেত্রে পারিবারিক বিষয়াদি দেখাশোনার জন্য বাইরের কাজ কমিয়ে দেওয়া যেতে পারে, বাইরে অযথা সময় না কাটিয়ে তাড়াতাড়ি বাসায় ফেরা যেতে পারে, প্রয়োজনে পরিবারের অন্যান্য সদস্য যেমন : দাদা-দাদির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

আমার অভিজ্ঞতায় যতটুকু দেখেছি, দায়িত্ববান পিতা-মাতার সন্তানরা সুখ-সমৃদ্ধি ও আত্মবিশ্বাসের সাথে বেড়ে ওঠে। যে সকল সন্তান ঘরের কাজকর্মে কার্যকর ভূমিকা রাখে, তারা অন্যদের চেয়ে তুলনামূলক অধিক আত্মমর্যাদাসম্পন্ন। তাদের মধ্যে পড়াশোনায় ভালো করার প্রবণতা অধিক দেখা যায়। তাদের সমাজবিরোধী কাজে জড়ানোর সম্ভাবনা খুবই কম থাকে। পিতাদের উচিত সন্তান লালন-পালনে মায়েদের সাহায্য করা। নেতিবাচক পরিবেশ এবং অসংখ্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি মুসলিম ছেলেদের আত্মোন্নয়ন উপযোগী পরিবার গঠনে পিতার ভূমিকা অতীব জরুরি।

প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েদের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে কিছু নির্দিষ্ট মানসিক চাহিদা থাকে। এগুলোর মধ্যে অনেক কিছুই বিব্রতকর, যা তারা অতি আপনজন ছাড়া অন্য কারও কাছে প্রকাশ করে না। অনেক সময় ছেলেরা তাদের সমস্যার কথা সহজে প্রকাশ করতে পারলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেয়েরা পারে না। তারা নিজেদের সমস্যার কথা গোপন রাখে। তাই বয়ঃসন্ধিকালীন সময়ে একজন আত্মবিশ্বাসী ও মমতাময়ী মায়ের উচিত তার মেয়েকে মানসিকভাবে সাহায্য করা; বিশেষত মেয়েলি বিষয়গুলোতে। একইভাবে একজন আত্মবিশ্বাসী ও যত্নবান পিতারও উচিত পুরুষালি বিষয়গুলোর ব্যাপারে ছেলেকে সাহায্য করা। তবে এ ক্ষেত্রে সন্তানদের সঙ্গে সুসম্পর্ক প্রয়োজন। আত্মিক সম্পর্ক ছাড়া এগুলো সম্ভব নয়। কারণ, সন্তানরা সাধারণত পিতা-মাতার নিকট এই বিষয়গুলো প্রকাশ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না।

একটি মুসলিম যুব-সংস্কৃতি তৈরি

কাঙ্ক্ষিত প্রজন্ম গড়ার জন্য একটি চমৎকার ও যুগোপযোগী মুসলিম সংস্কৃতি প্রয়োজন। এটি মুসলিম তরুণদের যোগ্য করে গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। মুসলিম তরুণদের বিভিন্ন ঘরানা ও সংস্কৃতির মানুষের সাথে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন, এটি ইসলামি মূল্যবোধের অংশ। সমাজের সকল ধরনের মানুষের সাথে

www.nagorikpathagar.org

তাদের বন্ধুত্ব থাকা প্রয়োজন। তবে ঘনিষ্ঠ বন্ধু তৈরির ক্ষেত্রে এমন মানুষ বাছাই করতে হবে—যাদের সাথে তার মূল্যবোধের মিল রয়েছে; অন্তুতপক্ষে নিজেদের মূল্যবোধবিরোধী যেন না হয়।

শিশুরা যে বয়স থেকে মসজিদের আদব রক্ষা করতে পারে, সে বয়স থেকেই তাদের মসজিদ নিয়ে যাওয়া উচিত। এতে তাদের নিকট বিভিন্ন বর্ণ ও সংস্কৃতির মানুষের সাথে মেলামেশার সুযোগ তৈরি হয়।

ইসলামের ইতিহাসে মসজিদ সব সময় সামাজিক ও শিক্ষাবিষয়ক কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ভূমিকা রেখে আসছে। দুর্ভাগ্যবশত বর্তমানে অনেক মসজিদই নিশ্চল। শুধু সালাতের সময় ছাড়া বাকি সময় বন্ধই থাকে। মসজিদগুলো যদি শুধু সালাতের জন্যই ব্যবহার করা হয়, তাহলে উম্মাহর পুনর্জাগরণের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে। মদিনায় সমাজের কেন্দ্রবিন্দু ছিল রাসূল ﷺ-এর মসজিদ। সুতরাং বর্তমান সময়ের মসজিদগুলোও সেভাবেই পরিচালনা করা উচিত।

জামাতের সাথে সালাত আদায় এবং কুরআন শিক্ষার পাশাপাশি মসজিদগুলোতে আরও কিছু সামাজিক কার্যক্রম আয়োজন করতে হবে। যেমন : জীবনধর্মী আলোচনা, কুইজ, সিরাত, ইতিহাস, গণিত, বিজ্ঞান প্রতিযোগিতা, নারীদের জন্য নারী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পৃথকভাবে প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। মসজিদের ইমামদের মানুষের সাথে যোগাযোগের দক্ষতা অর্জন করতে হবে। সমাজ সম্পর্কিত মৌলিক ধারণা রাখতে হবে—যাতে তারা বৃদ্ধ, কিশোর সবার সাথে মিশতে পারে। মসজিদভিত্তিক কার্যক্রমে তরুণদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সুযোগ দিতে হবে।

ছুটির দিনে কিংবা বিভিন্ন উপলক্ষ্যে মসজিদ ও সামাজিক সংগঠনগুলো সম্মিলিতভাবে আনন্দ ও শিক্ষামূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করতে পারে। এতে কিশোররা একদিকে যেমন সুস্থ বিনোদনের সুযোগ পায়, অন্যদিকে তেমনি ভালো মানুষদের সাথে একটি বলয় তৈরি করতে পারে। এর মাধ্যমে তারা প্রকৃত মুসলিম হিসেবে সবার সাথে বড়ো হতে পারে। এই সকল কার্যক্রম অন্যের সাথে বন্ধুত্ব তৈরির সুযোগ করে দেয়, যা কিশোরদের সামাজিক জীবনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিশোররা খুব সহজেই বন্ধুত্ব তৈরি করতে এবং তা ভাঙতে পারে। অনেক বন্ধু গ্রহণের মাধ্যমে তারা নিজেদের এবং চারদিকের বিশ্ব সম্পর্কে জানতে পারে। পিতা-মাতার কর্তব্য হলো উপযুক্ত বন্ধু বাছাইয়ে সন্তানদের সহযোগিতা করা। কারণ, তাদের আচার-আচরণে বন্ধু-বান্ধবের সাহচর্যের ভূমিকা অনেক বেশি। চরিত্রবান বন্ধুরা একে অপরকে কল্যাণমূলক কাজে উৎসাহিত করে, যা প্রথাগত একাডেমিক নির্দেশনামূলক বক্তৃতা থেকে অনেক শক্তিশালী।

www.nagorikpathagar.org

পিতা-মাতাকে এই বিষয়েও যত্নবান হবে হবে—যাতে সন্তানরা এমন ছেলেদের সাথে না মিশে, যারা তাদের বিপথে নিয়ে যেতে পারে কিংবা অসৎ কাজে উৎসাহিত করে। তরুণ যুবকরা সাধারণত জাঁকজমকপূর্ণ সংস্কৃতিতে অধিক আগ্রহী; অথচ বর্তমান কর্পোরেট সংস্থাগুলো নিজেদের আর্থিক লাভের জন্যই এই সকল সংস্কৃতি তৈরি করে।

রাসূল ﷺ তাই সতর্ক করে বলেছেন—

> 'মানুষ তার বন্ধুর দ্বীনের অনুসরণ করে। সুতরাং বন্ধু হিসেবে কাকে গ্রহণ করেছ, এই ব্যাপারে লক্ষ রাখো।' আবু দাউদ, তিরমিজি

যদি সময় ও প্রয়োজনীয় অর্থ থাকে, তাহলে ছুটির দিনগুলো পরিবার নিয়ে ইসলামিক ঐতিহাসিক স্থানগুলোতে কাটানো উচিত। এক্ষেত্রে উমরাহ পালন সবচেয়ে উত্তম। এই সকল ভ্রমণের মাধ্যমে পূর্বের ইতিহাসের সাথে পরিচিত হওয়া যায়। এতে কিশোররা আরও উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হয়।

মুসলিম কিশোরদের সম্ভাবনা বিকাশের অন্যতম উপায় হলো ছোটোকাল থেকেই তাদের বিভিন্ন ইসলামিক আসরে নিয়ে যাওয়া এবং মুসলিম ভাবাপন্ন সামাজিক সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য উৎসাহিত করা। নবিজিও তরুণ বয়সে হিলফুল ফুজুল নামক সমাজকল্যাণমূলক একটি সংস্থার সদস্য হয়েছিলেন। ছোটোকাল থেকে এসব কাজে অংশগ্রহণ করার ফলে কিশোররা চ্যালেঞ্জিং দায়িত্ব গ্রহণে সাহস পায়। একই সঙ্গে তারা বেড়ে উঠার জন্য যথাযথ ইসলামিক পরিবেশেও পায়।

মুসলিম পিতা-মাতার উচিত সন্তানদের প্রয়োজনীয় সমর্থন দেওয়া, যাতে তারা নিজেদের সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে মনে করে। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম থেকে কোনো কিছু পাওয়ার জন্য এটিই আমাদের উত্তম বিনিয়োগ। এক্ষেত্রে অভিভাবকদের উচিত সন্তানদের ওপর অতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ অথবা অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ থেকে বিরত থাকা।

গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ

সহযোগিতাপূর্ণ ও ইতিবাচক পারিবারিক পরিবেশ সৃষ্টি করা একটি বিশাল কাজ। ঠিক কীভাবে এই কাজ শুরু করতে হবে, তা নির্ধারণ করা সহজ নয়।

www.nagorikpathagar.org

তবে কিছু পরামর্শ অনুসরণ করা যেতে পারে, যেগুলো এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে—

- যথাসময়ে সালাত আদায় করুন। সম্ভব হলে সন্তানদের মসজিদে নিয়ে যান। নিদেনপক্ষে ঘরেই একসঙ্গে নামাজ আদায় করুন।
- প্রত্যেক দিন কুরআন তিলাওয়াত করুন। এটি ঘরে কল্যাণ বয়ে আনে এবং শ্রোতা ও পাঠক উভয়ের অন্তরে প্রশান্তি জোগায়।
- যেকোনো ব্যাপারে কেউ পরামর্শ চাইলে কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণ করতে বলুন। এই দুই প্রধান উৎস মানবজীবনের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় সকল সমস্যার সমাধান পেশ করে। তাই সকল ক্ষেত্রে মুসলিমদের এগুলোর শরণাপন্ন হওয়া উচিত।
- দৈনন্দিন কার্যক্রমে আল্লাহর দেওয়া নির্দেশ এবং রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহর অনুসরণ করুন। সর্বদা আল্লাহর স্মরণ ও তওবার মধ্যে থাকুন। প্রতিটি কাজে রাসূল ﷺ-এর শেখানো মাসনুন দুআগুলো পাঠ করুন।
- কথা ও কাজে ইসলামের অনুসরণ করুন। কারণ, এটিই মুসলিম হওয়ার মূলকথা। এর মাধ্যমে সন্তানরা আপনাকে নিজেদের রোলমডেল মনে করবে এবং আপনার কাছে ইসলামের সঠিক বার্তা পাবে।
- সকল নিকটাত্মীয় ও প্রতিবেশীর সাথে আন্তরিক সম্পর্ক বজায় রাখুন। এগুলো কিশোরদের সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধি করে এবং অভাবীদের সাহায্য করার মানসিকতা তৈরি করে। এগুলো নবি-রাসূলদের কাজ, যা একটি সুখী ও সফল সমাজ গঠনের অন্যতম উপাদান।
- নিয়মিত পারিবারিক প্রোগ্রামের আয়োজন করুন। এই ধরনের প্রোগ্রাম পরিবারের সদস্যদের মাঝে বন্ধনকে আরও মজবুত এবং ইসলামের প্রতি বিশ্বাস ও জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে। সন্তানদের পারিবারিক বিষয়ে পরামর্শদানের সুযোগ দিন। পরিবার নিয়ে চিন্তা করার ক্ষেত্রে তাদের উৎসাহিত করা উচিত।

www.nagorikpathagar.org

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দিনগুলো

'প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জ্ঞান অর্জন বাধ্যতামূলক।'—তিরমিজি

মাধ্যমিক বিদ্যালয় নির্বাচন

সন্তানদের জন্য সঠিক মাধ্যমিক বিদ্যালয় নির্বাচন করা পিতা-মাতার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং কঠিন কাজগুলোর একটি। প্রাথমিক বিদ্যালয় শেষে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উঠানোর সময়টি অনেক উদ্‌বিগ্নতা ও অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে পার করতে হয়। বেশিরভাগ বাচ্চাই এই সময়টিকে জীবনের একটি রোমাঞ্চকর মুহূর্ত হিসেবে দেখে। আকার-আকৃতি, পরিবেশ, পাঠদানের পদ্ধতি কিংবা খেলার মাঠ ইত্যাদি মিলিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক বিদ্যালয় অনেকটাই আলাদা।

প্রাথমিক বিদ্যালয় বাচ্চাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা শক্ত ভিত্তি গড়ে দেয়, আর মাধ্যমিক বিদ্যালয় কঠোর পরীক্ষার মাধ্যমে সেই ভিত্তির ওপর বাস্তব কাঠামো নির্মাণ করে। মাধ্যমিক বিদ্যালয় কিশোরদের সামাজিক দায়িত্ব পালনে প্রস্তুত করে, যা তাদের শিক্ষাজীবনকে করে আরও বেশি সমৃদ্ধ। মাধ্যমিক শিক্ষার গুরুত্বের কথা মাথায় রেখে সচেতন পিতা-মাতা সন্তানকে সবচেয়ে ভালো বিদ্যালয়ে দিতে চান। কিছু কিছু বাবা-মা বাচ্চাদের ভালো বিদ্যালয়ে দেওয়ার আশায় বাসাও পরিবর্তন করেন, যদি বাসার কাছের বিদ্যালয়ের মান সন্তোষজনক না হয়।

মুসলিম বাবা-মায়ের জন্য ভালো একটি বিদ্যালয় নির্ধারণ করা খুবই কষ্টসাধ্য। কেননা, তাদের লক্ষ করতে হয়—শিক্ষার পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানে কোন ধরনের নিয়মনীতি অনুসর করা হয়, তাদের নীতিবোধ ও সামাজিক পরিবেশ কেমন ইত্যাদি। কারণ, এগুলো বাচ্চার চরিত্র গঠনের সাথে সম্পর্কিত।

www.nagorikpathagar.org

তবে এই ধরনের প্রত্যাশা পূরণ প্রায় অসম্ভব। পিতা-মাতার অবশ্যই এটা মাথায় রাখা উচতি, সন্তানদের বিদ্যালয়ে যাওয়ার জন্য কতটুকু পথ পাড়ি দিতে হবে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো সাধারণত তাদের প্রস্তাবিত কর্মসূচিসংবলিত প্রসপেক্টাস ছাপিয়ে থাকে। সেখানে বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পাশের নিময়াবলি, উপস্থিতির ওপর নম্বরসহ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়াদি উল্লেখ থাকে। এই সমস্ত বিষয়াদি ছাড়াও প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের সাথে স্কুলের বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে কথা বলা যেতে পারে। তবে যা-ই করি না কেন, সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

ভালো বিদ্যালয় সেগুলোই, যেগুলো প্রাতিষ্ঠানিক উন্নতির দিকে জোর দেয়, কঠোর নিয়মানুবর্তিতা এবং পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরিতে কাজ করে থাকে। প্রতিটি বাচ্চাই স্বতন্ত্র। শুধু তাদের উপযুক্ত পরিবেশের মধ্যে দিতে হয়—যেখানে তারা নিজেদের মানিয়ে নিতে সক্ষম। কোনো কিশোর যদি পড়ুয়া হয়, তাহলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় উচ্চ মানসম্পন্ন বিদ্যালয়ে তাকে দেওয়া উচিত। আর অপড়ুয়া বা অমনোযোগী কিশোরকে এমন স্কুলে ভর্তি করানো উচিত, যেখানে আর্ট, খেলাধুলা, কারিগরি ইত্যাদি বহুমুখী প্রতিভা বিকাশে কাজ করা হয়। এতে অপড়ুয়া ছাত্ররা এই সব বিষয়ের কোনো একটিতে নিজের ক্যারিয়ার গড়তে পারবে। সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা, ইতিবাচক চিন্তা-ভাবনা ও শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ততা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণের প্রক্রিয়াকে আরও উপভোগ্য করে তোলা। ভালো মানের বিদ্যালয়গুলো সকল ধরনের শিক্ষার্থীর জন্য সমান ব্যবস্থা রাখে, যাতে মেধাবী শিক্ষার্থীরা বিরক্ত কিংবা হতাশ না হয়; একই সঙ্গে অপেক্ষাকৃত দুর্বল শিক্ষার্থীরা যেন ঝরে না পড়ে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর সঠিক ও সম্পূর্ণ তথ্য পিতা-মাতার জ্ঞাত থাকা জরুরি, যাতে তারা বাচ্চাদের স্কুলে পাঠানোর ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হন। বিদ্যালয় সম্পর্কে তথ্য নেওয়ার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো আমাদের বিবেচনা রাখা উচিত তা হলো—

- শিক্ষার্থীরা কি সহজে বিদ্যালয়ে পৌঁছতে সমর্থ? সামগ্রিক পরিবেশ কি নিরাপদ? সামাজিক স্থিতিশীলতা কি আছে?
- বিদ্যালয় পরিদর্শকদের সর্বশেষ পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন এই বিদ্যালয় সম্পর্কে কী বলে?

www.nagorikpathagar.org

- বিদ্যালয়টি কী সহশিক্ষায় পাঠদান করে, নাকি শুধু ছেলে অথবা মেয়েদের পাঠদান করে?
- প্রাতিষ্ঠানিক অর্জনের ক্ষেত্রে এবং বহুমুখী সুযোগের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়টির মান কী?
- এই বিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণ শেষে শিক্ষার্থীরা সাধারণত কেমন প্রতিষ্ঠানে যায়?
- বিদ্যালয়টির র‍্যাগিং ও ইভটিজিং বন্ধ করা ব্যাপারে কী পলিসি আছে? র‍্যাগিং ও ইভটিজিং বিরুদ্ধে তারা কী ব্যবস্থা নিয়ে থাকে?
- বিদ্যালয়টির কোনো লিখিত আচরণবিধি আছে কি? যদি থাকে, তাহলে তারা কি তা যথাযথ উপায়ে পালন করে?
- বাবা-মা কি বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার রাখে? তারা কি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাথে সহজে যোগাযোগ করতে পারে?
- ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতির হার কেমন? অনুমোদিত অনুপস্থিতি সম্পর্কে বিদ্যালয় কী ব্যবস্থা গ্রহণ করে?
- বাচ্চাদের দুর্ব্যবহারজনিত কারণে স্থায়ী ও অস্থায়ী বহিষ্কারের হার কত?
- বিদ্যালয় সম্পর্কে শিক্ষার্থী ও বাবা-মায়ের মনোভাব কেমন?
- শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মধ্যকার সম্পর্ক কেমন?
- শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক আচরণ কেমন?
- বাড়ির কাজ (Home work) সম্পর্কিত কর্মপন্থা কীরূপ?
- বাচ্চাদের বিশেষ শিক্ষাগত প্রয়োজন (Special Educational Needs–SEN) পূরণে বিদ্যালয় কী ধরনের বিশেষ সুবিধা প্রদান করে?
- বিদ্যালয়টি কি পরিপাটি, পরিচ্ছন্ন এবং শিক্ষা গ্রহণের জন্য অনুকূল? বন্ধুত্বপূর্ণ শিক্ষার পরিবেশ আছে সেখানে?

স্বতন্ত্র নাকি মিশ্র বিদ্যালয়

স্বতন্ত্র পড়াশোনার বিষয়ে বিপরীতমুখী দুটি দৃষ্টিকোণ রয়েছে। সহশিক্ষার প্রবক্তাগণ বিশ্বাস করে, ছেলেমেয়ে উভয়কে একসঙ্গে বেড়ে উঠা উচিত এবং জীবন সম্পর্কে শেখা উচিত, যেন তারা পরস্পরকে ভালো করে জানতে পারে। অবাধ মেলামেশাকে তারা প্রগতিশীল ও মুক্তচিন্তার উপকরণ বলে মনে করে

www.nagorikpathagar.org

এবং একে উৎসাহিত করে। যারা এই চিন্তাধারার অনুসারী নয়, তাদের গণ্য করে সেকেলে হিসেবে। তাদের মতে, ছেলেমেয়ে একে অপরের পরিপূরক নয়; বরং প্রতিযোগী। পুরুষ ও মহিলাকে তাদের নিজস্ব শক্তি কিংবা দুর্বলতা দ্বারা মূল্যায়ন করা হয় না।

এর বিপরীতে একদল লোক রয়েছে যারা ভাবে, মহিলাদের স্থান হচ্ছে ঘরের ভেতরে বিশেষত রান্নাঘরে; শুধু রান্না করার জন্য এবং পরিবারের অন্য সদস্যদের সেবা করার জন্য। তারা মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণকে শুধু সময়ের অপচয় বলেই গণ্য করে না; বরং তারা বিশ্বাস করে, এটা সমাজের জন্য ক্ষতিকারকও বটে। ধর্ম ও সংস্কৃতির নামে অনেক নারীই নিজেদের সাধারণ মানবিক অধিকার শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়।

ইসলাম এক্ষেত্রে মধ্যমপন্থি। ইসলামে শিক্ষা একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। জ্ঞান অর্জন করা নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই বাধ্যতামূলক। ছেলে ও মেয়ে উভয়েরই উচিত এমন একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করা, যা তাদের মেধার বিকাশ সাধনে অধিক সহায়ক।

পাশ্চাত্যের অনেক গবেষক তাদের গবেষণায় খুঁজে পেয়েছেন, ছেলেমেয়ে উভয়ই স্বতন্ত্র শিক্ষাব্যবস্থায় ভালো ফলাফল করে থাকে। নিরপেক্ষ ধর্মীয় ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে তারা শিক্ষাক্ষেত্রে সফলতা অর্জনের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষাব্যবস্থাকে সুপারিশ করেছেন। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে এবং বাবা-মায়ের চাহিদা অনুযায়ী মিশ্র পদ্ধতিতে পাঠদানরত কিছু বিদ্যালয়ও ভালো পাঠদানের উদ্দেশ্যে এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য ছেলেমেয়েদের স্বতন্ত্র টিউটোরিয়াল দলে বিভক্ত করে শিক্ষার আয়োজন করেছে। এই গবেষণায় আরও দেখা যায়, জাতীয় পর্যায়ের পরীক্ষাগুলোতে স্বতন্ত্র বিদ্যালয়ের মেয়েরা বেশি ভালো ফলাফল করে।

ছেলেমেয়েরা দৈহিক ও মানসিক উভয়দিক থেকেই স্বতন্ত্র। ছেলেরা; বিশেষ করে সদ্য যৌবনে পা দেওয়া ছেলেরা আচরণের ক্ষেত্রে অনেকটা আক্রমণাত্মক। এই সময় তারা শিক্ষকদের থেকে তুলনামূলক বেশি মনোযোগ আশা করে। অন্যদিকে মেয়েরা স্বভাবতই একটু চুপচাপ প্রকৃতির। ফলে মিশ্র শিক্ষাব্যবস্থায় প্রবেশের ফলে তারা থাকে ছেলেদের দ্বারা কিছুটা অবদমিত অবস্থায়। এতে একাডেমিকভাবে তারা ক্ষতিগ্রস্তও হতে পারে। ছেলেমেয়ে স্বতন্ত্র হারে পরিপক্বতা অর্জন করে এবং তাদের শিক্ষাগত পছন্দের ক্ষেত্রেও ভিন্নতা রয়েছে। এ সমস্ত যুক্তির ভিত্তিতে গবেষকরা বলেন—'স্বতন্ত্র শিক্ষাব্যবস্থাই শিক্ষার্থীদের জন্য অধিকতর উপযোগী।'

www.nagorikpathagar.org

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলাম বলে—যৌবনপ্রাপ্তির একদম শুরু থেকেই যুবক ও যুবতির কর্তব্য হলো, তাদের যৌন জীবনের পবিত্রতা রক্ষা করা। ইসলাম বিবাহবহির্ভূত যৌনজীবনকে শুধু অসমর্থনই করে না; বরং কঠোরভাবে নিষেধ করে। এমনকী যে সমস্ত বিষয় ও পদক্ষেপ মানুষকে যিনার দিকে ধাবিত করে, সেগুলোও ইসলামে নিষিদ্ধ। তাই বিপরীত লিঙ্গের সাথে চোখাচোখি বা মুচকি হাসির মাধ্যমে ভাব বিনিময়, প্রেমালাপ—সবই নিষিদ্ধ। এ বিষয়গুলো থেকে স্বতন্ত্র শিক্ষাব্যবস্থায় খুব সহজেই বেঁচে থাকা যায়। কারণ, সেখানে লালসার উপস্থিতি থাকে না। এতে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের মূল উদ্দেশ্যের প্রতি মনোযোগী হতে পারে।

ইসলামি মূল্যবোধসম্পন্ন বিদ্যালয়সমূহ

অতি উদার পরিবেশে স্বাতন্ত্র্য বিদ্যালয়গুলোতেও নোংরা সংস্কৃতি প্রবেশ করার সুযোগ আছে। কারণ, সমাজে স্বীকৃত চরিত্রগুলো বিদ্যালয়ের মধ্যেই ফুটে ওঠে। ফলে মুসলিম কিশোররা ঘরোয়া শিক্ষা পরিবেশ এবং বিদ্যালয়ের অনৈতিক পরিবেশের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেলার সম্ভবনা আছে। এজন্যই অনেক মুসলিম পিতা-মাতা মনে করেন, তাদের সন্তানরা আরও ভালোভাবে গড়ে উঠবে এবং আরও আত্মবিশ্বাসী হবে—যদি তারা একটি ধর্মীয় মূল্যবোধসম্পন্ন বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে পারে। এতে সন্তানরা ঘর ও বিদ্যালয়ে শেখা মূল্যবোধগুলোকে পরস্পরের সাথে মেলাতে পারবে। ফলে তাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

মুসলমানদের উচিত সন্তানদের ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত করা। এজন্য যে ধরনের স্কুলে ভর্তি করানো প্রয়োজন, সেখানেই সন্তানদের ভর্তি করা পিতা-মাতার কর্তব্য।

জীবনের সঠিক ভিত্তি স্থাপনের প্রস্তুতি

সন্তানদের শিক্ষার জন্য উপযুক্ত বিদ্যালয় নির্বাচন করলেই যে পিতা-মাতার দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়—ব্যাপারটি এমন নয়; বরং বাবা-মায়েদের উচিত সন্তানদের নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি নজরদারি করা এবং এটা নিশ্চিত করা, তারা বিদ্যালয় থেকে সর্বোত্তম শিক্ষা অর্জনে সক্ষম হচ্ছে।

www.nagorikpathagar.org

প্রাতিষ্ঠানিক অর্জন : এটা স্বীকৃত যে সঠিক অক্ষরজ্ঞান, সংখ্যাজ্ঞান, তথ্যপ্রযুক্তিসংক্রান্ত ধারণা এবং যোগাযোগ দক্ষতা মানুষকে অনেকাংশেই এগিয়ে রাখে। এই সকল দক্ষতা ছাড়া বাচ্চারা পরবর্তী সময়ে বড়ো ক্ষেত্রে নিজেদের মানিয়ে নিতে হিমশিম খেতে পারে, যা তাদের আত্মবিশ্বাসকে অনেকাংশেই কমিয়ে দেবে। বড়ো হওয়ার সাথে সাথে যখন তারা স্কুলজীবন শেষ করে চাকরির বাজারে প্রবেশ করবে, তখন মনে হবে—কেউ তাদের পাত্তাই দিচ্ছে না। তখন তাদের কাছে মনে হবে পৃথিবীটা অনেক সংকীর্ণ। এই সময় অনেকে সমাজের বোঝাও হয়ে যায়। পিতা-মাতা ও শিক্ষকদের দায়িত্ব হলো—কিশোরদের ঝড়ে পড়া থেকে রক্ষা করা। তবে এ বিষয়ে পিতা-মাতার দায়িত্বটাই সবচেয়ে বেশি।

যত্নবান ও দায়িত্ববান বাবা-মায়েরা সন্তানদের খোঁজখবর নেয়। তারা কীভাবে দিন কাটাচ্ছে, স্কুলে তাদের পারফর্মেন্স কেমন, স্কুল থেকে বাড়ির কাজ কী দেওয়া হয়েছে ইত্যাদি বিষয়ে তারা সন্তানদের থেকে জানতে চায়। সন্তানরা কাদের সাথে মিশছে, কাদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছে, কোন বিষয়টি তাদের জন্য বেশি উপভোগ্য, কোন বিষয়টি বুঝতে কষ্ট হচ্ছে ইত্যাদি বিষয়ে তারা সার্বক্ষণিক খোঁজখবর নেয়। খোলাখুলি ও বন্ধুভাবাপন্ন আচরণ সন্তানদের সম্ভাবনা বিকাশে সাহায্য করে। একই সঙ্গে তাদের কোনো সমস্যা থাকলে জটিল আকার ধারণের আগেই তা জানা যায় এবং সমাধানে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া যায়।

বাবা-মা যদি সন্তানদের প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়গুলোতে সরাসরি সাহায্য করতে না পারে, তবে অন্তত এতটুকু নিশ্চিত করতে হবে—সন্তান যেন মনে করে, বাবা-মা তাদের প্রাতিষ্ঠানিক অর্জনসমূহ এবং নিত্যদিনের কার্যক্রমের ব্যাপারে যত্নশীল।

পিতা-মাতার উচিত নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রাখা—

- বাচ্চা কি স্বেচ্ছায় বিদ্যালয়ে যায়?
- শ্রেণিকক্ষ কিংবা বিদ্যালয় থেকে দেওয়া বাড়ির কাজে কোনো সমস্যা আছে কি?
- বিদ্যালয় কি তাদের ভালো লাগছে?
- বিদ্যালয়ের কার্যক্রম শেষে তারা কি সরাসরি বাসায় ফেরত আসছে?
- তারা কি প্রতিদিনই সতেজ থাকে, নাকি মাঝেমধ্যে চুপসে যায়?
- সামাজিক আচরণে কি তাদের উন্নতি ঘটছে?
- তাদের শিক্ষাগত ফলাফল কি সব সময় একই রকম থাকে?

www.nagorikpathagar.org

বাসায় পড়ার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন একটি ভালো রুটিন ও সুষ্ঠু নিয়মানুবর্তিতা। তাদের নিজস্ব রুটিন তৈরির ব্যাপারেও উৎসাহ দেওয়া যেতে পারে, যেন তারা সহজে মেনে চলতে পারে। তাদের দুই ধরনের রুটিন থাকতে পারে; একটি নিত্যনৈমিত্তিক তথা বিদ্যালয় চলাকালীন, অন্যটি বন্ধের দিনের জন্য। বাবা-মা-সন্তান প্রত্যেকেরই গুরুত্ব ও দৃঢ়তার সাথে এগুলো মেনে চলা উচিত। একটি রুটিনে নিচের বিষয়গুলো থাকতে পারে—

- বিষয়ভিত্তিক পড়াশোনা এবং বিদ্যালয় থেকে দেওয়া বাড়ির কাজ (সাধারণ দিনে)।
- বন্ধুদের সাথে মেলামেশা (বন্ধের দিনগুলোতে)।
- নিজের জন্য কিছু ব্যক্তিগত সময় (প্রতিদিন এবং বিশেষত ছুটির দিনে)।
- পড়াশোনার জন্য কম্পিউটারেরর ব্যবহার (যখন প্রয়োজন)।
- আরবি শিক্ষা ও কুরআন তিলাওয়াত (প্রতিদিন, বিশেষত ছুটির দিনে)।
- বয়সভিত্তিক কার্যক্রম (খেলাধুলা)।
- সংবাদপত্র পাঠ, খবর ও অন্যান্য ভালো অনুষ্ঠান উপভোগ করা (নিয়মিত)।

স্কুলের সিলেবাসের পাশাপাশি অন্যান্য তথ্যভান্ডার থেকে সহায়ক জ্ঞান অর্জনে সময় দেওয়া জরুরি। যেমন : রেফারেন্স বই, ইন্টারনেট, সংবাদপত্র, সাময়িকী ইত্যাদি। বাবা-মায়েদের উচিত বাচ্চারা যাতে এই ব্যাপারগুলোতে সময় দিতে পারে—সেদিকে খেয়াল রাখা। একই সঙ্গে ঘরের পরিবেশ শান্ত রাখাও তাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব—যাতে বাচ্চারা নির্বিঘ্নে পড়াশোনা করতে পারে।

বাবা-মায়েদের উচিত বাচ্চাদের নিজেদের কাজ নিজেদেরই করতে দেওয়া। এতে তারা আত্মনির্ভরশীল হয়ে বেড়ে উঠবে। তবে তারা যদি প্রয়োজন অনুভব করে, তাহলে বাচ্চাদের জন্য অতিরিক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করতে পারে।

প্রাতিষ্ঠানিক সফলতা এবং ভালো ফলাফল পাওয়ার জন্য বাচ্চাদের 'শেখার দক্ষতা' (Learning Skills) অর্জন করতে হবে। এটা তাদের পুরো জীবনের জন্য শেখার ক্ষেত্রে পাথেয় হিসেবে কাজ করবে।

www.nagorikpathagar.org

অন্যান্য যোগ্যতা

মানুষ একটি জটিল ও উচ্চ মেধাসম্পন্ন সৃষ্টি, যার রয়েছে বিভিন্ন ধরনের মেধা ও যোগ্যতা। যেমন—

ক. **নিজস্ব মেধা (Intelligence) :** নিজস্ব বুদ্ধি বা মেধা একজন মানুষকে নিজের ব্যাপারে, নিজের চিন্তা-চেতনা ও প্রয়োজনের ব্যাপারে সচেতন করে তোলে।

খ. **শারীরিক যোগ্যতা :** এটি মানুষকে শরীরের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় জানতে এবং শারীরিক যোগ্যতা বিকাশে সাহায্য করে।

গ. **অনুভূতিগত (Emotional) যোগ্যতা :** এটি মানুষকে অন্যদের সম্পর্কে সচেতন এবং অপরের কল্যাণ অর্জনে উৎসাহিত করে।

ঘ. **দৃষ্টিলব্ধ দক্ষতা :** এটি মানুষকে বিভিন্ন বিষয়ের অবলোকন এবং বিভিন্ন মতবাদ ও স্থান সম্পর্কে সচেতন হতে সাহায্য করে।

ঙ. **ভাষাগত দক্ষতা :** ভাষা আমাদের শিখতে, বলতে, পড়তে ও লিখতে সাহায্য করে।

চ. **গাণিতিক দক্ষতা :** সংখ্যাগত সমস্যার সমাধান এবং যৌক্তিক চিন্তা করতে সহায়তা করে।

ছ. **বৈজ্ঞানিক দক্ষতা :** বিশ্ব সম্পর্কে জানতে, কৌতূহল, চিন্তা ও অনুসন্ধানে সাহায্য করে।

জ. **দার্শনিক যোগ্যতা :** জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা করতে এবং জানতে সাহায্য করে।

কিশোররা এই যোগ্যতাগুলো নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। জন্মগতভাবে একেকজন এককটি বিষয়ে অধিক দক্ষ। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো পরীক্ষার মাধ্যমে কিছু প্রথাগত যোগ্যতা যাচাই করে মাত্র। যে সকল কিশোর অতিরিক্ত প্রতিভাধর, তারা বিদ্যালয়ে ভালো করার সম্ভাবনা বেশি। বিদ্যালয়ের পড়াশোনায় যাদের বেগ পেতে হয়, তারাও কোনো না কোনো বিষয়ে দক্ষ। উদাহরণস্বরূপ—যার কাছে গণিত ও বিজ্ঞান জটিল মনে হয়, সে নরম দিলের অধিকারী হতে পারে, অন্য মানুষের সাথে ভদ্রভাবে চলাফেরা অথবা সে শিল্পমনা হতে পারে। নিজের সন্তানদের মাঝে এই সকল যোগ্যতা খুঁজে নিতে অভিভাবক ও শিক্ষকদের একসঙ্গে কাজ এবং সন্তানদের যোগ্যতার বিকাশে সঠিকভাবে সাহায্য করতে হবে। তবে পাশাপাশি যে সকল বিষয়ে তারা কম দক্ষ, সেই সকল বিষয়ে অতিরিক্ত যত্ন নেওয়াও জরুরি।

www.nagorikpathagar.org

শারীরিক ও মানসিক বিকাশ

একটি সুখী জীবন নির্ভর করে ভারসাম্যপূর্ণ শারীরিক, ভাবাবেগ ও মানসিক বিকাশের ওপর। পিতা-মাতার উচিত সন্তানের যথাযথ বিকাশের জন্য পুষ্টিকর, পরিমিত ও স্বাস্থ্যকর খাদ্য সরবরাহের। পাশাপাশি নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম এবং তুলনামূলক চাপমুক্ত জীবনের ব্যবস্থা করা। এগুলো তাদের সুস্বাস্থ্য অর্জনে সহায়তা করে। বর্তমান সময়ে বাচ্চাদের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা টেলিভিশন ও কম্পিউটারের সামনে বসে থাকা খুবই সহজ। এগুলো তাদের শারীরিকভাবে অকার্যকর করার পাশাপাশি তাদের অলস, সামাজিকভাবে নিস্তেজ এবং অন্য মানুষদের সাথে মেলামেশায় অক্ষম করে তোলে।

কোনো বিষয় নিয়ে চিন্তা করা এবং তার প্রতিফলন ঘটানোর দক্ষতা অর্জনকে ইসলাম উৎসাহিত করে। এর জন্য সন্তানদের পর্যাপ্ত পরিমাণ স্বাধীনতা প্রদান করতে হবে। পাশাপাশি প্রয়োজনীয় শৃঙ্খলায় রাখতে হবে, যাতে তাদের মধ্যে নিম্নোক্ত দক্ষতাগুলো বৃদ্ধি পায়। যেমন—

- তথ্য যাচাই করার দক্ষতা
- যুক্তি প্রয়োগের দক্ষতা
- অনুসন্ধিৎসা
- সৃষ্টিশীল চিন্তা
- সঠিক মূল্যায়নের যোগ্যতা

পিতা-মাতা ও শিক্ষক উভয়ের কর্তব্য হলো, সন্তানদের এ কথা বোঝানো— স্কুলজীবন শুধু গৎবাঁধা কতগুলো বিষয় মুখস্থ করার সময় নয়, যা পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরপরই স্মৃতি থেকে মুছে যায়; বরং স্কুলজীবন হলো চিন্তা করার সক্ষমতা অর্জনের সময়। যখন চিন্তা করার ক্ষমতা বাধাগ্রস্ত হয়, তখন মনে হয় স্থবির এবং সামনে এগোনোর তেজ হারিয়ে যায়। চিন্তাশক্তির মাধ্যমে নিজের মেধাকে সৃষ্টিশীল উপায়ে কাজে লাগানো যায়। তাই চিন্তাশক্তি অর্জন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইসলাম এই চিন্তাশক্তির সাথে আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতার ভিত্তিতে আত্মসচেতনতা ও আন্যান্য সৃষ্টির প্রতি দায়িত্বানুভূতির সংযোগ স্থাপন করে। নিজেদের মেধাকে সৃষ্টিশীল উপায়ে কাজে লাগানোর মাঝেই প্রথম দিকের মুসলিমদের সফলতা নিহিত ছিল। তাঁদের স্বপ্ন ছিল আকাশ ছোঁয়া। ফলে তাঁরা সকলের কল্যাণার্থে একটি জ্ঞানভিত্তিক সভ্যতা বিনির্মাণে সফল হয়েছিলেন। সে সভ্যতা ছিল সৃষ্টিশীল কর্ম ও আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ। ইউরোপীয় রেনেসাঁসও সৃষ্টিশীল কার্যক্রম ও গতিশীলতায় ভরপুর ছিল।

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু দুঃখজনক হলো, এই সভ্যতা মানুষকে তাদের স্রষ্টা থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। মানবজীবনকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও জাতীয়তাবাদী স্বার্থে ব্যস্ত রাখে। আর এভাবেই ইউরোপ ধর্মনিরপেক্ষ বস্তুবাদের বিশালতায় হারিয়ে যায়।

ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জীবনমুখী দক্ষতা

জীবনে সফলতার জন্য উন্নত শিক্ষা জরুরি। শুধু স্কুলে ভালো ফলাফল অর্জন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভালো ডিগ্রি লাভই শিক্ষা নয়। পিতা-মাতার উচিত সন্তানদের পছন্দ অনুযায়ী চাকরি, ক্যারিয়ার গঠন এবং সমাজের সার্বিক কল্যাণে কাজ করতে উৎসাহিত করা, যাতে তারা নিজের আগ্রহ ও মেধাকে বিকশিত করতে পারে। মুসলিম উম্মাহর এমন জ্ঞানী ও দক্ষ জনবল প্রয়োজন, যারা বিগত কয়েক শতাব্দীর জরাজীর্ণ ও উদাসীনতা কাটিয়ে নতুন সমাজ গড়তে সক্ষম।

কিশোররা শুধু যেন ভালো অ্যাকাডেমিক ফলাফল অর্জনের চেষ্টায় ব্যস্ত না থাকে। এর পাশাপাশি তারা যেন নিজেদের ব্যক্তিগত, সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক দায়িত্বের ব্যাপারেও সচেতন হয়। দায়িত্ববান হওয়ার জন্য এবং জীবনে আস্তে আস্তে স্বাধীনতা লাভের জন্য শিক্ষার্জন করা মাধ্যমিক স্কুলে এক নতুন ধরনের আবেগ তৈরি করে। এই সকল দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে সমাজকল্যাণমূলক কাজ এবং এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিস সহায়ক ভূমিকা পালন করে। পিতা-মাতার উচিত সন্তানদের এই সকল কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহ প্রদান করা। এগুলো তাদের সমাজের পরিপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হয়ে গড়ে উঠতে সাহায্য করবে।

ব্যক্তিগত দক্ষতা হচ্ছে নিজেকে বোঝা। একই সঙ্গে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও সম্মানজনক উপায়ে জীবন পরিচালনার জন্য নিজের মর্যাদা অনুধাবন করা। কিছু প্রবাদ আছে। যেমন : 'নিজেকে জানো' কিংবা 'যারা নিজেকে চেনে, তারা তাদের রবকেও চিনতে পারে।' এগুলো যুগ যুগ ধরে মানুষকে বিকিশিত করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। যদিও এই কথাগুলো ব্যক্তিসত্তাকে ছাড়িয়ে স্রষ্টার ব্যাপারে জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করে। এটি মানুষকে আত্মকেন্দ্রিক ও অহংকারী হওয়ার পরিবর্তে সচেতন ও দায়িত্বশীল করে তোলে।

বাচ্চাদের ভারসাম্যপূর্ণ বিকাশের জন্য তারা নিজেদের ব্যাপারে কতটুকু জানে, তাদের চালচলন, ব্যক্তিত্ব ও মেধা সম্পর্কে তারা কতটুকু চিন্তা-ভাবনা করে ইত্যাদি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পিতা-মাতার সঠিক দিকনির্দেশনা সন্তানদের অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস অথবা হীনম্মন্যতা থেকে রক্ষা করবে। আমাদের উচিত

www.nagorikpathagar.org

ছেলেমেয়েদের সাথে সমস্ত বিষয়ে আলোচনা করা এবং তাদের এমন কাজে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা, যার মাধ্যমে তারা নিজেদের বিকশিত করতে পারে। একই সঙ্গে নিজেদের সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতা নির্ধারণ করতে এবং এগুলোকে মোকাবিলা করার উপায়ও জানতে পারে। মনে রাখতে হবে, নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে গভীর সচেতনতা সফলতার মূল চাবিকাঠি।

সামাজিক দক্ষতা হচ্ছে অন্যকে বোঝা এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে মানুষের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা। কিশোররা সাধারণত পিতা-মাতা এবং চারপাশের মানুষদের সাথে সম্পর্কের মধ্য দিয়ে এই ধরনের দক্ষতা অর্জন করে। পিতা-মাতার সঙ্গে অন্যান্য মানুষের সম্পর্ক কিশোরদের প্রভাবিত করে। মানুষ সামাজিক জীব, 'মানুষের দক্ষতা' কিংবা অন্যের সাথে সুসম্পর্ক তৈরি করার সক্ষমতা সামাজিক জীবনের মূল সার। এটি হতে পারে অন্যের সাথে কথা বলা, উত্তম আচরণের মাধ্যমে অন্যকে সম্মান করা, অন্য মানুষকে গুরুত্ব দেওয়া, তাদের সমবেদনা জানানো এবং সকলের সাথে মিলেমিশে কাজ করা। সামজিক দক্ষতা কিশোরদের ভালো বন্ধু বাছাই, ভিন্নমত সহ্য এবং সকলের সাথে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে সহায়তা করে।

জীবনমুখী দক্ষতা হচ্ছে অন্যেকে বিরক্ত না করে কিংবা অন্যের কোনো প্রকার অসুবিধা সৃষ্টি না করে স্বাভাবিকভাবে জীবন চলার পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা। কিশোররা এই সকল দক্ষতা শিখতে পারে পিতা-মাতার সচেতন পদক্ষেপের মাধ্যমে, যা সন্তান পালনের কষ্টকে সার্থক করে তোলে।

আধ্যাত্মিক প্রশান্তি

আধুনিক বিশ্ব এমনভাবে গড়ে উঠেছে, যা আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়ে বন্ধ্যা। এর ফলে উদ্‌বিগ্নতা, অশান্তি, চাপ ও দুশ্চিন্তা মানব-মনকে আচ্ছাদিত করে রেখেছে। নিজ আত্মাকে গুরুত্ব না দেওয়ার কারণে মানব-মন আজ প্রশান্তির জীবন থেকে অনেক দূরে। এটি খুবই আশ্চর্জজনক, অপ্রতিরোধ্য বস্তুবাদ আমাদের 'মেধাবী পশুতে' রূপান্তরিত করেছে; যেখানে আত্মার খোরাক রয়েছে যৎসামান্যই। বর্তমানে মানুষ নিজের বস্তুবাদী অর্জনের ক্ষেত্রে অনেক গর্ববোধ করে। আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রযুক্তি, শিল্পকলা ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতার মতো 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রভু' আমাদের জীবনকে ঘিরে রেখেছে। বর্তমানে আমরা ও মারাত্মক আধ্যাত্মিক পিপাসায় ভুগছি। এই পিপাসা মেটাতে অনেকে অনেক পথ বেছে নিচ্ছে।

www.nagorikpathagar.org

মানবজাতির সৃষ্টি, এর টিকে থাকা এবং সফলতা সম্পূর্ণরূপে আমাদের স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালার ওপর নির্ভরশীল। তিনি আমাদের স্বাধীনতা দিয়েছেন, যাতে পৃথিবীতে নিজের কর্মের জন্য বিচার দিবসে তাঁর নিকট জবাবদিহি করতে হয়। বিচার দিবসের ওপর পরিপূর্ণ বিশ্বাসই আধ্যাত্মিকতার মূল ভিত্তি। মুসলিমরা কখনো নিজেদের আধ্যাত্মিকতা প্রদর্শন করে বেড়ায় না কিংবা নিজেকে হতাশাবাদী বানায় না। আমাদের মাঝে যখন আধ্যাত্মিকতা বেড়ে উঠে, তখন তা আমাদের প্রকৃতি, চালচলন, অভিব্যক্তিসহ পুরো জীবনে প্রতিফলিত হয়। রাসূল ﷺ-এর সাহাবিদের আধ্যাত্মিকতার ব্যাপারে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন—

> 'তাঁদের মুখমণ্ডলে সিজদার চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়।' সূরা ফাতহ : ২৯

আধ্যাত্মিকতার এই মরুভূমির যুগে সন্তানদের মাঝে আল্লাহ ও রাসূল ﷺ-এর প্রতি ভালোবাসা ও আস্থা তৈরি করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। আধ্যাত্মিক সফলতা মানুষকে প্রশান্তি ও চিন্তামুক্ত জীবনযাপন করতে সহায়তা করে। এটি সত্য, আধুনিকতার এই যুগে সন্তানদের মধ্যে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করা খুবই চ্যালেঞ্জিং। তবে কিশোররা প্রকৃতিগতভাবেই অনুসন্ধিৎসু ও দুঃসাহসী হয়। কিশোরদের যদি আধ্যাত্মিকতা ও ভালোবাসাপূর্ণ পরিবেশে গড়ে তোলা হয়, তাহলে তারা এগুলোতে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে।

অন্যান্য চ্যালেঞ্জ

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির গণ্ডি পার হওয়ার পর সন্তান পালনের নতুন অধ্যায় শুরু হয়। স্কুলজীবনের শুরুতেই নতুন একটি বিষয় সামনে চলে আসে, তা হলো—তারা স্কুলের নতুন পরিবেশের সাথে কীভাবে মানিয়ে নেবে; বিশেষ করে প্রথম কয়েক মাস। কিশোররা সাধারণত খুব দ্রুত বন্ধু বানাতে এবং নতুন সিস্টেমের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে। তবে এর জন্য স্কুলের পরিবেশ সহায়ক হতে হয়। যে সকল স্কুলে বিভিন্ন সংস্কৃতি এবং নানা ব্যাকগ্রাউন্ডের কিশোররা ভর্তি হয়, সেই সকল স্কুলে নিজেদের মানিয়ে নেওয়া কিশোরদের জন্য কষ্টকর। চঞ্চল ও মিশুক স্বভাবের কিশোররা খুব সহজেই নতুন পরিবেশে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে, কিন্তু চাপা ও লাজুক স্বভাবের কিশোররা নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে সময় নেয়। যে সকল কিশোর পিতা-মাতার ওপর খুব বেশি নির্ভরশীল, তাদের জন্য নতুন পরিবেশে মানিয়ে নেওয়া বেশ কঠিন।

www.nagorikpathagar.org

যেহেতু শিক্ষকরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কিশোরদের আরও স্বনির্ভর হিসেবে দেখতে চায়, তাই এখানে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের থেকে প্রাথমিকের মতো নিবিড় সহায়তা পায় না। এক্ষেত্রে পিতা-মাতা ও শিক্ষকদের উচিত স্কুলের পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেওয়ার জন্য তাদের যথাসাধ্য সহায়তা করা।

মানিয়ে নেওয়ার বিষয়টি ছাড়াও মাধ্যমিক পর্যায়ের কিশোর-কিশোরীদের শিক্ষা ও সামাজিক বিষয়াদিসহ আরও বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়।

বিদ্যালয়ে ইসলামের অনুশীলন

প্রাপ্তবয়স্ক তরুণ মুসলিমদের জন্য ইসলামের মৌলিক নীতির অনুসরণ অপরিহার্য। এটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য একধরনের চ্যালেঞ্জস্বরূপ। কারণ, স্কুলেই তাদের নিয়মিত সালাত আদায় এবং রমজান মাসে রোজা পালন করতে হয়। অন্যদিকে মেয়েদের শালীন পোশাক এবং মাথায় হিজাব পরিধান করে স্কুলের নিজস্ব ড্রেসকোডের অনুসরণ করতে হয়। খেলাধুলার সময় ছেলেমেয়ে উভয়কে নিজেদের সতরের দিকে খেয়াল রাখতে হয়।

বর্তমানে কিছু কিছু স্কুলে হিজাব পরিধানের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করা হয়। এমন পরিস্থিতির শিকার হলে মুসলিম শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ জায়গা থেকে প্রধান শিক্ষকের কাছে নিজেদের মৌলিক ও ধর্মীয় অধিকার দাবি করতে হবে। এতে অনেক ভুল বোঝাবুঝির নিরসন হবে। এই ক্ষেত্রে ইসলামের প্রতি ছেলেমেয়েদের দৃঢ় বিশ্বাস, শিষ্টাচারপূর্ণ আচরণ এবং অন্যকে প্রভাবিত করার যোগ্যতা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম তার মৌলিক নীতির ক্ষেত্রে খুবই শক্ত; তবে যুক্তি প্রদানের ক্ষেত্রে রাগান্বিত হওয়া যাবে না। এটি জানাও গুরুত্বপূর্ণ যে, নফল বিষয়ের ক্ষেত্রে ইসলামে বেশ ছাড় রয়েছে। মুসলিম কিশোরদের উচিত ইসলামের ব্যাপারে আগ্রহী হওয়া এবং নিজেদের দ্বীনের ব্যাপারে গর্ববোধ করা। এই সকল ক্ষেত্রে পিতা-মাতার উচিত সন্তানদের যথাসাধ্য সহযোগিতা করা।

বুলিং ও নিরাপত্তাজনিত বড়ো ইস্যু

স্কুলে বুলিং একটি আলোচিত এবং বড়ো ইস্যু, যেটি সমাজে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি করে। বুলিং হলো ইচ্ছাকৃতভাবে বারংবার কাউকে উত্ত্যক্ত কিংবা আঘাত করা। নিম্নোক্ত উপায়ে বুলিং হয়ে থাকে—

শারীরিক : আঘাত করা, লাথি মারা কিংবা মালামাল ছিনিয়ে নেওয়া।

মৌখিক : কটু নামে ডাকা, অপমান করা কিংবা বাজেভাবে ইঙ্গিত করা।

www.nagorikpathagar.org

পরোক্ষ : কারও নামে কদর্য গালগল্প ছড়িয়ে দেওয়া, সামাজিক বন্ধন থেকে কাউকে তাড়িয়ে দেওয়া কিংবা কারও সম্পর্কে জঘন্য মন্তব্য করা।

একটি কিশোর সাধারণত ছয়টি কারণে অন্যের দ্বারা বুলিংয়ের শিকার হয়। যথা—

- বর্ণ
- লিঙ্গ
- শারীরিক কাঠামো
- প্রতিবন্ধকতা
- যৌন দৃষ্টিভঙ্গি
- বয়স ও
- ধর্ম

দুঃখজনকভাবে শারীরিক ও মানসিক নিপীড়নের অন্যতম হাতিয়ার এই বুলিং অনেক স্কুলেই খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। শিক্ষার্থীদের অনেকেই বুলিং-এর শিকার হওয়ার আশঙ্কায় থাকে। বিশেষ করে মাধ্যমিক স্কুলের নতুন শিক্ষার্থীরা এর শিকার বেশি হয়। ভালো মানের স্কুলগুলোতে শক্ত বুলিংবিরোধী নীতিমালা এবং তা পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা থাকে। যে সকল স্কুল বুলিংয়ের প্রতি জিরো টলারেন্স দেখায়, সেই সকল স্কুলে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সম্মানের অধিক উপস্থিতি দেখা যায়।

নির্যাতনকারীরা মূলত সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন, সহজ-সরল, নিরীহদের বুলিংয়ের জন্য টার্গেট করে থাকে। মুসলিম কিশোররা তাদের জাতিগত ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণে বুলিংয়ের শিকার হয়। মাথায় স্কার্ফ পরিধানকারী মুসলিম মেয়েরাও বুলিংয়ের শিকার হয়ে থাকে। পিতা-মাতার দায়িত্ব হলো সন্তানদের বুলিং মোকাবিলা করার যথাযথ উপায় সন্তানদের শিক্ষা দেওয়া; তাদের বন্ধু বৃদ্ধি, অন্যের সঙ্গে মেলামেশা, ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা এবং চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার যোগ্যতা অর্জনে উৎসাহিত করা। তবে বুলিংয়ের মোকাবিলা করতে গিয়ে যাতে কোনো ধরনের অঘটন না ঘটে কিংবা বুলিংয়ের জবাবে পালটা বুলিংয়ের ঘটনা যাতে না ঘটে—এই ব্যাপারে লক্ষ রাখতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

নিয়মানুবর্তিতা

স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা মানব-মনের স্বভাবিক প্রকৃতি। কিশোররা যখন বড়ো হয় এবং মাধ্যমিক স্কুলে পদার্পণ করে, তখন তারা স্বাধীনতার স্বাদ অনুভব করতে শুরু করে। তারা স্কুলে নিজেদের কাজ নিজেরা গুছিয়ে রাখে এবং অনেক ক্ষেত্রে লাঞ্চের সময় স্কুলের বাইরে যাওয়ার অনুমতি পায়। এই ধরনের স্বাধীনতা ও সহজতা তাদের মঝে সৃষ্টিশীলতা, নতুন চিন্তা, উদ্যোগ ও উৎসাহ জোগায়। অন্যদিকে মাত্রাতিরিক্ত স্বাধীনতা 'ডোন্ট কেয়ার' মানসিকতা সৃষ্টি করে, যা পারিবারিক বন্ধনে ভাঙন সৃষ্টি এবং সামাজিক বন্ধনকে দুর্বল করে।

দায়িত্বহীন স্বাধীনতা বিপজ্জনক। যেকোনো সভ্য সমাজের জন্য স্বাধীনতার সাথে দায়িত্বশীলতা জড়িত। ইসালামে আল্লাহর নিকট, নিজের ও অপরের নিকট দায়বদ্ধতা স্বাধীনতার পূর্বশর্ত। এটিকে আপাত অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ বলে মনে হলেও তা স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তোলে এবং মানবজাতিকে বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা করে। সীমাহীন স্বাধীনতা সমাজে নৈরাজ্যের সৃষ্টির কারণ।

সমাজের অনিয়ন্ত্রিত ও বিভ্রান্তিকর স্বাধীনতা স্কুলজীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। অনেক মাধ্যমিক স্কুলে শ্রেণিকক্ষের নিয়ম রক্ষা সবচেয়ে কঠিন বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের আচার-আচরণের কারণে নিজেদের পেশা ছেড়ে দেয়। কিছু ছাত্র আছে যারা শিক্ষক কিংবা প্রতিষ্ঠানকে কোনো সম্মান প্রদর্শন করে না। এক্ষেত্রে সন্তানকে যাবতীয় আদব-কায়দা শেখানো পিতা-মাতার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

স্কুল সমাজ থেকে বিছিন্ন কোনো দ্বীপ নয়। তরুণদের জীবন টিভি প্রোগ্রাম, ইন্টারনেট, প্রিন্টেড মিডিয়া, পিতা-মাতার জীবনযাপনের ধরন এবং সমাজের অন্যান্য বিষয়ের দ্বারা প্রভাবিত। তরুণরা নিজেদের জীবনে নানামুখী চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। যেমন—

ব্যক্তিগত সমস্যা : দুর্বল আত্মসম্মানবোধ, পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়া, আবেগ এবং আচার-আচরণগত সমস্যা।

পারিবারিক প্রভাব : প্যারেন্টিং-এ দুর্বলতা, অর্থনৈতিক দৈন্যতা, পারিবারিক কলহ।

স্কুলের পরিবেশ : পাঠ্যসূচি, সহাপাঠীদের চাপ, অলিখিত কারিকুলাম, শিক্ষকদের নিম্নমানের প্রত্যাশা।

সামাজিক সমস্যা : বর্ণ ও সংস্কৃতি, সামাজিক বঞ্চনা, বেকারত্ব, মিডিয়া চিত্র।

সামাজিক প্রবণতা : নৈতিক অবক্ষয়, অবাধ যৌনতা ও আদর্শগত ধাঁধা।

www.nagorikpathagar.org

সমাজের প্রত্যেকের ন্যায় তরুণরাও নিজেদের স্বীকৃতি ও সম্মান চায়। যারা প্রকৃতই সুবিধাবঞ্চিত বা নিজদের বঞ্চিত মনে করে, তারা অস্বাভাবিক কার্যকলাপ করতে শুরু করে। নিজেদের হতাশা প্রকাশ কিংবা সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে নিজেদের ক্রোধ ঝাড়ানোর জন্য গ্যাংফাইট, মাদকের অপব্যবহারসহ এমন কোনো সমাজবিরোধী অপকর্ম নেই—যাতে তারা নিজেদের জড়ায় না। অনেকে নেতিবাচক চরিত্রকে নিজেদের রোলমডেল হিসেবে গ্রহণ করে, যা সমাজের বৃহৎ স্বার্থের বিরুদ্ধে যায়। নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য মূল্যবোধবহির্ভূত নতুন নতুন প্রযুক্তির প্রমোশন এবং এগুলোর অপব্যবহারে তরুণসমাজ আজ ধ্বংসের সম্মুখীন।

তরুণরা সব সময় বিশেষ কিছু হতে চায়। তারা আলোচিত হতে চায়, নিজের স্বীকৃতি চায়। সমাজের যেকোনো পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তারা নিজেদের অগ্রভাগে দেখতে চায়। এর অন্যতম দৃষ্টান্ত হচ্ছে মোবাইল ফোনের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার। এর মাধ্যমে তারা স্কুলে নিজেদের সামর্থ্যের প্রদর্শন করে বেড়ায়। বিভিন্ন জরিপে দেখা যায়, অন্যান্য বিষয়ের মতো মোবাইল ফোন মর্যাদার অন্যতম চিহ্ন হিসেবে বিবেচিত হয়—যা আধুনিক তরুণ সংস্কৃতির অন্যতম অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানের পুরো সংস্কৃতি মার্কেটিং বসদের সৃষ্টি, যাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজেদের তৈরিকৃত পণ্যের বিক্রয় নিশ্চিত করা। এটি আমাদের সময়ের জীবন্ত আলোচনার বিষয়।

সন্তানদের মাধ্যমিক স্কুলের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম উক্ত স্কুলের কঠোর ডিসিপ্লিন পলিসি আছে কি না তা খেয়াল রাখতে হবে। পাশাপাশি স্কুলের গেটের বাইরে ছাত্র-ছাত্রীদের আচার-আচরণ কীরকম, সে খোঁজও নিতে হবে। অ্যাকাডেমিক পারফরমেন্সের ব্যাপারেও যথাযথ নজর দিতে হবে। যেহেতু সুসংগঠিত নিয়মকানুন ছাড়া কোনো কিশোরই কার্যকর উপায়ে শিক্ষা লাভ করতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, মুসলিম পিতা-মাতার উচিত পরিবার ও এলাকায় এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা, যেখানে সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়মকানুন ও দায়িত্ব পালনের বাধ্যবাধকতা থাকবে। সে পরিবেশে কিশোররা অনিয়ন্ত্রিতভাবে চলাফেরার সুযোগ পাবে না। এটি শুধু ছুটির দিনে কিংবা স্কুল ছুটির পর বাড়িতে বা মসজিদে কুরআন ও সামাজিক রীতিনীতি শিক্ষাদানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। পিতা-মাতা যখন নিজ ঘরে, রাস্তাঘাটে, মসজিদে কিংবা কমিউনিটি সেন্টারে ইতিবাচক নিয়ম প্রতিষ্ঠা করবে, তখন কিশোররা প্রকৃতিগতভাবেই

www.nagorikpathagar.org

নিয়মের মধ্যে থেকে চলাফেরা করবে। তখন কিশোররা প্রতিক্রিয়াশীল হওয়ার পরিবর্তে ক্রিয়াশীল, হতাশাবাদিতার পরিবর্তে আশাবাদী এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক হওয়ার পরিবর্তে সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠবে। তারা তখন নিজ স্কুলেও সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালায়।

কিশোররা তখনই নিয়মানুবর্তী হয়, যখন তারা দেখে—তাদের পিতা-মাতা এবং সমাজের অন্যান্য সদস্যরাও নিয়মের মধ্যে চলে। তারা যথাসময়ে সালাত আদায় করে, ওয়াদা রক্ষা করে এবং অপরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। সন্তানদের নিকট যখন চালচলনের গ্রহণযোগ্য সীমা-পরিসীমা সম্পর্কে পরিষ্কার আলোকপাত করা হয়, পিতা-মাতা যখন নিয়ম-নীতি ভঙ্গকারী সন্তানদের নিয়মিত শাসনের মধ্যে রাখে এবং নিজেরা যখন উক্ত সীমা-পরিসীমা মানার ক্ষেত্রে সন্তানদের নিকট অনুকরণীয় হয়ে ওঠেন, ঠিক তখনই কিশোরদের মাঝে নিয়মানুবর্তিতা গড়ে ওঠে। এই ক্ষেত্রে পিতা-মাতাকে অবশ্যই সন্তানদের মাঝে সততা, সমতা, ও একনিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কিশোরদের কখনোই অপরের সামনে লজ্জায় ফেলা, হেয় করা কিংবা অসম্মান করা যাবে না।

মাতা-পিতাকে এটি অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে, জোর-জবরদস্তি করে কখনো কাউকে নিয়মকানুন শেখানো যায় না। জোর-জবরদস্তি ইতিবাচক মানসিকতা তৈরির পরিবর্তে নেতিবাচক ফলাফল বয়ে আনে। তরুণরা স্বাধীনচেতা হয়। তারা যেকোনো কিছুর কারণ জানতে চায়। তাই তাদের কারণ না বুঝিয়ে আদেশ-নিষেধ মানার ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় নিয়ন্ত্রণ করলে তা হিতে বিপরীত হয়; এমনকী তারা একপর্যায়ে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তাই কার্যকর উপায়ে নিয়মকানুন শেখাতে হবে এবং পিতা-মাতাকে অবশ্যই সন্তানদের সাথে অহেতুক তর্ক এড়াতে হবে।

সন্তানদের স্বাভাবিক উপদেশ প্রদান করার ক্ষেত্রে আগে তাদের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা বুঝুন। তাদের আচার-আচরণের প্রতি স্বাভাবিক পর্যবেক্ষণ করুন। তাদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলো খেয়াল করা জরুরি—

- কিশোরদের সামনে নিজের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করুন। অতি মাত্রার স্বাধীনতা তাদের পদস্খলন ঘটাতে পারে, আবার অতি মাত্রায় নিয়ন্ত্রণমূলক আচরণ তাদের বিদ্রোহী করে তুলতে পারে। ইসলাম জীবনযাপনে মধ্যমপন্থা অবলম্বনের কথা বলে। সন্তানরা যেন চরমপন্থার মধ্যে বেড়ে না ওঠে—সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

- তাদের ভুলের জন্য পাকড়াও করবেন না; শোধরানোর সুযোগ দিন। অপ্রাপ্তবয়স্করা প্রতিনিয়ত ভুল করে এবং এর মাধ্যমেই তারা শেখে। নিজের বিহ্বলতা, ক্রোধ, হতাশা ও বিষণ্নতা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তাদের সুযোগ প্রয়োজন।
- কিশোরদের পছন্দ-অপছন্দ, আচরণ ও কার্যকলাপের ব্যাপারে মজা করেও নেতিবাচক মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকুন। এটি তরুণ যুবকদের হতাশ করে।
- 'কখনো এই কাজটি করো না' এই ধরনের শব্দ থেকে পারতপক্ষে বিরত থাকুন। এর পরিবর্তে বলুন—'তুমি যদি এই কাজটি না করতে কিংবা এইভাবে না করতে, তাহলে আমি খুশি হব অথবা হতাম।'
- সন্তানদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করুন। ওই সকল কথা ও কাজ থেকে দূরে থাকুন, যেগুলোর পুনরাবৃত্তি তাদের কষ্ট দেয়। বর্তমান সময়ে কিশোররা ব্যাপক মানসিক চাপের মধ্যে থাকে। আমাদের উচিত তাদের অবস্থা উপলব্ধি করা।
- ন্যায়পরায়ণতার সাথে তাদের নিয়মকানুন শেখান। মাধ্যমিক স্কুলের বাচ্চাদের নিয়মকানুন শেখানোর ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন জরুরি। কোনো ভুল করে ফেললে, শাসন করার সময় খেয়াল রাখুন—তারা যেন কোনোভাবেই ছোটো ভাই-বোনের সামনে লজ্জিত না হয়। ন্যায়বিচারের প্রতি অবশ্যই লক্ষ রাখতে হবে এবং পিতা-মাতা উভয়কেই এই ক্ষেত্রে সমান অবদান রাখতে হবে।
- বন্ধুদের সামনে নিজ সন্তানের ভর্ৎসনা করা থেকে বিরত থাকুন। যখন কোনো সমস্যা দেখা দেয়, পিতা-মাতার উচিত পরিস্থিতি শান্ত হওয়ার পর আলাদাভাবে তার সমাধান করা।
- পিতা-মাতার উচিত নিজেদের নিয়ন্ত্রিত মেজাজ ও নিয়মকানুন মানার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা অবলম্বন করা, যাতে সন্তানদের মাঝে কোনটি সঠিক এবং কোনটি ভুল—এই ব্যাপারে পরিষ্কার ধারণা তৈরি হয়; অন্যথায় কিশোররা এই ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে পড়ে যাবে এবং অনিশ্চিত আচরণকে স্বাভাবিক ভাবতে শুরু করবে।

www.nagorikpathagar.org

যৌনতা ও যৌনশিক্ষা

মিশ্র শিক্ষাব্যবস্থার স্কুলগুলোতে মুসলিম কিশোররা সহপাঠীদের সাথে চলাফেরার ক্ষেত্রে ব্যাপক মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক চাপের মধ্যে থাকে। যদি কোনো কিশোর সঠিক ইসলামি পরিবেশে বেড়ে না ওঠে, তাহলে সে অসংযত জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়। সন্তানদের বিবাহবির্ভূত যৌনকর্ম থেকে বিরত রাখতে পিতা-মাতা ও সমাজের কর্তব্য হচ্ছে বহুমুখী সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সন্তানদের অবশ্যই যাথাযথ ইসলামি জ্ঞান ও তাকওয়া অর্জন করতে হবে, যাতে তারা বিভিন্ন ধরনের প্রলোভনের সময় নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তাদের জন্য বিকল্প হালাল বিনোদনের ব্যবস্থা রাখতে হবে, যেখানে তারা নিজেদের তারুণ্যের শক্তিকে ব্যবহার করতে পারে। মুসলিম তরুণদের অবশ্যই ইউসুফ ﷺ-এর ঘটনা স্মরণে রাখতে হবে, যিনি তাঁর চারপাশের সুন্দরী রমণীদের থেকে কুপ্রস্তাব পাওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ও ভয়ের কারণে নিজের যৌন প্রবৃত্তি বাস্তবায়নের পরিবর্তে কারাগারের জীবনকে বেছে নিয়েছিলেন।

আধুনিক সমাজে অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের অধিক হারে প্রেগনেন্সির কারণে প্রাথমিক স্কুলগুলোতেই যৌনশিক্ষা দেওয়া হয়। মাধ্যমিক স্কুলে অ্যাডাল্ট রিলেশনশিপের মানবিক দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। বিজ্ঞান সম্পর্কিত অংশে বয়ঃসন্ধিকালীন শারীরিক পরিবর্তন এবং সন্তান জন্মদানের সময়ের শারীরিক অবস্থার বর্ণনা দেওয়া হয়। স্কুলে সন্তানদের কোন ধরনের যৌনশিক্ষা দেওয়া হয় এবং কোন বয়সে কোন ধরনের শিক্ষা দেওয়া হয়, সেই ব্যাপারে পিতা-মাতার সজাগ থাকতে হবে। প্রয়োজনে যৌনশিক্ষার কিছু ক্লাস থেকে তাদের দূরে রাখা যেতে পারে, তবে এই ব্যাপারে অবশ্যই স্কুল কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করতে হবে।

সন্তানদের বয়ঃসন্ধিকালীন ও গর্ভকালীন কিছু মৌলিক শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে জানাতে হবে। পিতা-মাতাকে এই সকল বিষয়ে সন্তানদের সাথে আলোচনা করতে হবে শালীন ও সতর্কতার সাথে।

নারী-পুরুষের মধ্যে মেলামেশার ক্ষেত্রে ইসলাম শালীনতা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়। এই বিষয়গুলো তরুণদের ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, তারা অপরিপক্ব ও বয়ঃসন্ধিকালীন সময়ে প্রাকৃতিকভাবেই আবেগপ্রবণ হয়ে থাকে। তরুণ ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে মেলামেশার ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্মান, জীবনের প্রতি দায়িত্ববোধ এবং আল্লাহর নিকট দায়বদ্ধতার বিষয়সমূহ শেখাতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

তাদের কিশোরকাল থেকেই শালীনতার শিক্ষা দিতে হবে। প্রাপ্তবয়স্ক তরুণ-তরুণীদের শারীরিক সংস্পর্শ এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থেকে বিরত থাকার দীক্ষা দিতে হবে। কারণ, এগুলো পরবর্তী সময়ে তাদের শারীরিক সম্পর্কের দিকে প্ররোচিত করে।

পিতা-মাতাকে সন্তানদের সাথে এই সকল বিষয়ে অবশ্যই খোলামেলা আলোচনা করতে হবে। বিপরীত লিঙ্গের সাথে মেলামেশার ক্ষেত্রে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গি শালীনতা ও সতর্কতার সাথে সন্তানদের জানাতে হবে। সন্তানরা স্কুল, টেলিভিশন এবং সমাজে প্রচলিত অন্যান্য উৎস থেকে নারী-পুরুষের সম্পর্কের ব্যাপারে শিক্ষা নেওয়ার আগেই ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে তাদের যৌন শিক্ষা দিতে হবে। চারপাশের অতি উদার পরিস্থিতি সত্ত্বেও তাদের আত্মসংযম ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ অর্জনের শিক্ষা দিতে হবে। কারণ, ভেতরের দৃঢ় তাকওয়া (আল্লাহর উপস্থিতি, অসৎ কর্ম থেকে বিরত থাকা এবং সৎকর্ম সম্পাদনের সুফল সম্পর্কে সচেতন থাকা) এই কঠিন সময়ে নিজেকে রক্ষা করার একমাত্র উপায়।

একইভাবে সমকামিতা এবং সমলিঙ্গের সাথে যৌন সম্পর্ক নিয়ে তাদের সাথে শালীন আলোচনা করতে হবে। এই ব্যাপারে ইসলামের বিধান এবং এর কুফল তাদের জানাতে হবে।

আত্মপরিচয়

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উঠার পর কিশোরদের জানাশোনার মাত্রা বাড়তে থাকে। ফলে তারা আত্মপরিচয় সম্পর্কে সচেতন হতে শুরু করে। শারীরিক ও মানসিকভাবে পরিপক্ব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা ধীরে ধীরে জানতে শুরু করে নিজেদের উৎস, পরিবার ও সমাজের মূল ভিত্তি সম্পর্কে। তারা কীভাবে পালিত হচ্ছে, এর ওপর নির্ভর করে তারা কীভাবে বিশ্বকে পর্যবেক্ষণ করবে। এই সময় কিশোরকালের স্বপ্নগুলো ধীরে ধীরে মুছে যেতে থাকে এবং তারা শিখতে থাকে—কীভাবে বাস্তব জীবনের বিভিন্ন বিষয় তথা ধর্মীয়, জাতিগত ও সাংস্কৃতিক ভিন্নতা মোকাবিলা করতে হয়। কীভাবে ভিন্ন সমাজের ও সংস্কৃতির বন্ধুদের সাথে সম্পর্ক গড়বে ইত্যাদি।

পিতা-মাতার দায়িত্ব হলো—সন্তানদের স্বার্থবাদী ও সংকীর্ণ মানসিকতাসম্পন্ন হওয়া থেকে বিরত রাখা। কারণ, মুসলিম সমাজের উদ্দেশ্যই হলো পরস্পরের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন। মুসলিমরা সবাই এক দেহের মতো। এখানে ব্যক্তিস্বার্থের

www.nagorikpathagar.org

কোনো স্থান নেই। সুতরাং সন্তানদের প্রকৃতিগতভাবেই সামাজিক, অতিথিপরায়ণ, সহযোগিতাপূর্ণ এবং খোলা মনের অধিকারী হতে হবে। ইসলামের সারমর্মই হচ্ছে মানবতার সেবা করা। অন্যের সেবা না করা কিংবা অপরের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা ইসলামি চেতনাবিরোধী।

মানুষের বহুমুখী পরিচয় রয়েছে। প্রত্যেকটি পরিচয়ই মানুষের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মীয়, জাতিগত, ভূখণ্ডগত ও অন্যান্য পরিচয় একজন মানুষের সার্বিক চিত্র তুলে ধরে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে বর্তমান আধুনিক সমাজে কট্টরপন্থি সেক্যুলাররা ইসলামি পরিচয়কে নেতিবাচকভাবে দেখে। যখন জানতে পারে—কোনো তরুণ ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামের অনুশাসন মেনে চলে, তখন তার সাথে অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ শুরু করে। অনেক মানুষের মাঝেই ইসলামের ব্যাপারে ব্যাপক ভুল ধারণা রয়েছে। মুসলিম কিশোররা স্কুলে, মিডিয়ায় এবং প্রাত্যহিক জীবনে অনেক নেতিবাচক ধারণার সম্মুখীন হয়। ফলে তাদের অনেকেই নিজেদের দুর্বল মনে করে। তাদের কেউ কেউ নিজেদের মুসলিম পরিচয় দিতেও ইতস্তত বোধ করে! এই সামাজিক ব্যাধি অনেক মুসলিম তরুণকে দ্বৈত জীবনযাপনে বাধ্য করে। অনেকেই (যদিও তাদের সংখ্যা খুবই কম) নিজেকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে নিজের নাম পরিবর্তন করে ফেলে কিংবা নিজের শিক্ষক ও বন্ধু-বান্ধব কর্তৃক প্রদেয় ভিন্ন নাম গ্রহণ করে। এটি খুব সহজেই তাদের আত্মসম্মান নষ্ট করে দেয়।

সন্তানরা ভালো আছে কি না কিংবা তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের উন্নতি হচ্ছে কি না—এই ব্যাপারে মুসলিম পিতা-মাতাকে নজর রাখতে হবে। ইসলাম ও মুসলিমবিরোধী মনোভাবাপন্ন বিশ্বে মুসলিম কিশোরদের জীবন হতাশা ও পরাজিত মনোভাবের দ্বারা মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হতে পারে। মাতা-পিতার উচিত সন্তানদের প্রতি অধিক যত্নবান হওয়া, তাদের সময় দেওয়া এবং তাদের কষ্টের ভাগীদার হওয়া, যাতে তারা 'প্রশান্ত আত্মা নিয়ে' বেড়ে ওঠে।

বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে সন্তানদের শিক্ষা দিতে হবে। এই শিক্ষার মাধ্যমে তারা নিজেদের বহুমুখী পরিচয়ের ব্যাপারে গর্ববোধ করবে। তাদের বোঝাতে হবে, মুসলিম হওয়া মানে এই নয়—নিজের জাতিগত পরিচয়কে ঢেকে রাখতে হবে; বরং জাতিগত পরিচয় একজন মানুষের মূল্যবান সম্পদ, এটি মানুষের বৈচিত্র্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করে। সুতরাং নিজের বহুমুখী পরিচয়কে উপভোগ করা উচিত। এগুলো সমাজকে সকল দিক দিয়ে সমৃদ্ধ করে। মানব-মর্যাদা এবং সকলের মাঝে সমতা বিধানের ক্ষেত্রে এই ধরনের পরিচয় ব্যাপক ভূমিকা পালন করে।

www.nagorikpathagar.org

সন্তানদের নিজেদের 'মুসলমানিত্বের' ব্যাপারে সচেতন করে গড়ে তুলতে হবে। তাদের জানাতে হবে, ইসলাম মানুষের মৌলিক অধিকার অর্জনের জন্য সামাজিক ও নাগরিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মানুষের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করার কথা বলে।

আনন্দ-উল্লাসের কৃষ্ণ গহ্বর

বর্তমান সময়ে আনন্দ-বিনোদন জগতের ইন্ডাস্ট্রিগুলো খুব সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী, যারা অনেক কর্মী নিয়োগ দিয়ে থাকে। হলিউড, ডিজনি এবং অন্যান্য ইন্ডাস্ট্রিগুলো তাদের বিশাল সাম্রাজ্যের দ্বারা ছেলেমেয়েদের কল্পনাজগৎ এবং অবসর সময়কে দখল করে নিয়েছে। বাচ্চারা বিনোদনের জন্য যখন-তখন এই সকল কোম্পানি কর্তৃক নির্মিত চলচ্চিত্রের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। একশন থ্রিলার ও রোমাঞ্চকর মুভিগুলো অবুঝ ও নরম মনের অধিকারী বাচ্চাদের ফাঁদে ফেলে। তারা তখন মুভিতে দেখানো ড্রেস, সরঞ্জামাদি, খেলনা ইত্যাদি কিনতে ব্যস্ত হয়। এর মাধ্যমে কোম্পানিগুলো সন্তান ও অভিভাবকদের থেকে ব্যাপক পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নেয়। কিশোররা চিন্তা করে, তারা যদি পরিচিত সেলিব্রেটিদের মুভি না দেখে, তাহলে মানুষ তাদের সমস্যাগ্রস্ত ভাববে এবং স্কুলে তারা ব্যাকডেটেড সাব্যস্ত হবে।

শুধু পশ্চিমা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিগুলোই তরুণদের মন-মানসিকতাকে গ্রাস করেনি; বরং প্রাচ্যের ইন্ডাস্ট্রিগুলোও এশিয়ার সকল অঞ্চলের তরুণদের গ্রাস করেছে। বলিউড প্রতিবছর শত শত চলচ্চিত্র নির্মাণ করে। তরুণ এশিয়ানদের জন্য এই আধুনিক 'পাশ্চাত্য' ফাঁদ এবং ইন্ডিয়ান বিনোদনের থেকে দূরে থাকা এখন খুবই কঠিন। অনেক মুসলিমের জীবনে ফিল্মের সেলিব্রেটিদের ছাপ দেখা যায়। অনেক মুসলিম তরুণ ইন্ডিয়ান ফিল্মস্টারদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে।

শুধু মুভিই তরুণদের সময় গ্রাস করেনি; বরং কম্পিউটার, মোবাইল, গেম, ভিডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি যন্ত্র তাদের সময় অপচয়ের কৃষ্ণ গহ্বরে নিক্ষিপ্ত করেছে। Playstation, Gamecube এবং X Box/প্লেস্টেশন, গেমকিউব ও সাউন্ডবক্সগুলো আবাসকক্ষকে দখল করে আছে, যা তাদের ফ্রি সময় কেড়ে নিচ্ছে এবং তাদের অন্তরকে ফ্যান্টাসিতে ব্যস্ত রাখছে। কম্পিউটারভিত্তিক ভার্চুয়াল বিশ্ব আজ তাদের কাছে বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে। ফলে অনেক ছেলেমেয়েই বিশ্ব বাস্তবতার জটিল বিষয়াবলি অনুধাবন করতে পারে না; এমনকী তাদের এই ভার্চুয়াল রিয়েলিটির জগতের কাছে জীবন-মৃত্যুর মতো বিষয়গুলোও গুরুত্বহীন

www.nagorikpathagar.org

হয়ে পড়েছে। এর ফলাফল কী? গবেষণায় দেখা গেছে—টেলিভিশন, ভিডিও ও কম্পিউটার গেম কিশোরদের আগ্রাসী ও আক্রমণাত্মক করে তোলে।

এ ছাড়াও আছে অনেক মিউজিক ইন্ডাস্ট্রির যৌন উত্তেজনামূলক মিউজিক এবং গানের অর্থহীন বার্তা, যা আমাদের তরুণদের ব্যক্তিত্বকে পুরোপুরি নষ্ট করে দিচ্ছে। এটি সত্য, মানবজীবনে কিছু গান বা বিনোদনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, তবে সেগুলো কী ধরনের?

সংগীত মানব সংস্কৃতির অন্যতম অংশ। মানবসভ্যতায় বহু আগ থেকেই এর ব্যবহার হয়ে আসছে। সংগীত বা গানের মধ্যে কথা বলার, আবেগ-অনুভূতি জাগ্রত করার ক্ষমতা রয়েছে। সন্তানদের ঘুম পাড়ানোর জন্য মায়েরা গান গায়, সেনাবাহিনী ড্রামের আওয়াজের মাধ্যমে কুচকাওয়াজ করে, অন্যান্য সৃষ্টি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে গান গেয়ে থাকে। পবিত্র কুরআনের সুমিষ্ট তিলাওয়াত মুমিনদের মাঝে একনিষ্ঠতা, আনন্দ ও উদ্‌বেগে প্রশমনের অনুভূতি সৃষ্টি করে। সকল কিশোরই সুর ও ছন্দের প্রতি আকৃষ্ট। বর্তমানে অনেক ধরনের ইন্সট্রুমেন্টবিহীন গান ও নাশিদ রয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টির প্রতি প্রশংসা জ্ঞাপন করা যায়।

ইসলাম নীরস ও একঘেয়েমিপূর্ণ ধর্ম নয়। এতে মানব-মনকে আনন্দ দেওয়ার জন্য অনেক ধরনের বিনোদন ও উপভোগের ব্যবস্থা রয়েছে। মুসলিমদের মাঝে কখনোই বিনোদন ও আনন্দদায়ক মুহূর্তের অভাব ছিল না। রাসূল ﷺ বলেন—

> 'মাঝে মাঝে নিজ অন্তরকে বিনোদিত করো। কারণ, অন্তরগুলো ক্লান্ত হলে অন্ধ হয়ে যায়।' সুনান আদ-দায়লামি

মুসলিম পিতা-মাতা কি নেতিবাচক বিনোদন থেকে সন্তানদের দূরে রাখতে পারবে? বাস্তবিক অর্থে তা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও সন্তানদের মানসিক পরিতৃপ্তির জন্য এটা-ওটা কিনে দিতে হয়। তাদের অনেক আবদারকে কোনোভাবেই অগ্রাহ্য করতে পারি না। কারণ, এতে তারা বন্ধুদের কাছে নিজেদের তুচ্ছ ভাবতে পারে। কিছু কেনার ক্ষেত্রে পিতা-মাতাকে অবশ্যই কিছু নিয়মকানুন তৈরি করতে হবে এবং সেগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে হবে। এক্ষেত্রে অনেক মুসলিম এ ছাড় দেওয়াকে আপস মনে করতে পারে, তবে ইসলামের মৌলিক নীতি হচ্ছে—যখন দুটো খারাপ বিষয় সামনে চলে আসে, তখন দুটোর মধ্যে তুলনামূলক কম খারাপ বিষয়কে গ্রহণ করতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

দায়িত্ববোধের জগতে

'বিচার দিবসে পাঁচটি বিষয়ের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হওয়া ছাড়া কোনো আদম সন্তান এক কদম নড়তে পারবে না। তার জীবন কীভাবে কাটিয়েছে, তার যৌবন কীভাবে অতিবাহিত করেছে, তার সম্পদ কীভাবে অর্জন করেছে এবং কোন পথে তা ব্যয় করেছে। অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে।'—তিরমিজি

অভিভাবক সব সময়ই অভিভাবক

এটি চিরন্তন সত্য, সকল পিতা-মাতাই সন্তানদের নিয়ে অনেক বড়ো আশা করে এবং তারা নিজ জীবনে যা পায়নি, তা সন্তানদের দেওয়ার চেষ্টা করে। এই জন্যই তারা সন্তানের সবচেয়ে বড়ো অভিভাবক। এই অভিভাবকত্বের ছায়া থেকে সন্তানদের বের করে দেওয়া উচিত না; এমনকী তারা প্রাপ্তবয়স্ক হলেও। নবি-রাসূল এবং মহান ব্যক্তিরাও বয়ঃসন্ধিকালীন সময় পার হওয়ার পর সন্তানদের ছেড়ে দেননি; প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরও তাদের গাইড করেছেন। এটা ঠিক, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর সকলকে অবশ্যই নিজ জীবনের দায়িত্ব নিতে হবে। তারপরও আমাদের কর্তব্য হচ্ছে—যতদিন বেঁচে থাকি, ততদিন একে অপরকে ভালো পরামর্শ দেওয়া, গাইড করা। ইতিবাচক পারিবারিক পরিবেশে দৃঢ় পারিবারিক বন্ধনের কারণে বৃদ্ধ পিতা-মাতা সন্তানদের পরামর্শ দেওয়ার ব্যাপারে কখনো ইতস্তত বোধ করেন না। এই পরিবেশ মুসলিম সমাজকে আরও আন্তরিকতাপূর্ণ করে তোলে। এই পরিবেশেই অতীতে মানবিক মুসলিম সভ্যতা গড়তে ভূমিকা পালন করেছে। পিতা-মাতা যখন সন্তানদের ভালোবাসা, লালন-পালন এবং জ্ঞান প্রদানের জন্য যথাযথ প্রতিদান পান, তখন বৃদ্ধ বয়সে স্বাভাবিকভাবেই ভাবেন—তাদের খেয়াল রাখা হচ্ছে, পরিবারে তাদের মূল্যায়ন এবং তাদের প্রয়োজন পূরণ করা হচ্ছে।

www.nagorikpathagar.org

পবিত্র কুরআনে লোকমান ﷺ-এর নিজ পুত্রের প্রতি উপদেশ বর্ণিত হয়েছে, যেখানে তিনি পুত্রকে আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করার উপদেশ দিয়েছিলেন (সূরা লোকমান : ১৩-১৯)। একইভাবে ইবরাহিম ﷺ যখন পুত্র ইসমাইল ﷺ-এর স্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশে অনীহা করতে দেখেন, তখন পুত্রকে উক্ত স্ত্রী ত্যাগ করে তার চেয়ে উত্তম স্ত্রী গ্রহণের পরামর্শ দেন। ইসমাইল ﷺ দায়িত্বের সাথে তাঁর পিতার আদেশ পালন করেন। এই ঘটনাটি সহিহ বুখারিতে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক এক দীর্ঘ হাদিসে উল্লিখিত হয়েছে।

আসমা বিনতে আবু বকর ﷺ-এর মাতৃত্বপূর্ণ আচরণ ইতিহাসে স্বর্ণোজ্জ্বল হয়ে আছে। তিনি বৃদ্ধ বয়সে পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের ﷺ-কে বারণ করেছিলেন অত্যাচারী শাসক হাজ্জাজ বিন ইউসুফের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পিছপা হতে। তিনি যখন শুনলেন, পুত্র আবদুল্লাহ আশঙ্কা করছেন—শাহাদাতের পর তাঁর শরীরকে বিকৃত করা হবে, তখন তিনি আবদুল্লাহকে অভয় দিয়ে বললেন—'তোমার লাশের অবস্থা নিয়ে দুশ্চিন্তা করো না।'

এই সকল কাহিনি মুসলিম পিতা-মাতার ভূমিকার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করে। সন্তান যখন প্রাপ্তবয়স্ক হয়, তখন পিতা-মাতার স্বাভাবিক দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়; কিন্তু সন্তানদের প্রতি তাঁদের ব্যাকুলতা কখনো শেষ হয় না। ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্কের যে বীজ শৈশবে বপন করা হয়, তার ফলাফল পিতা-মাতা পৃথিবী ত্যাগ করা পর্যন্ত ভোগ করেন। আল্লাহ সন্তানদের চোখে পিতা-মাতাকে সম্মানিত করেছেন। কারণ, তারা সন্তানদের জন্য সবকিছুই করেছেন। বিজ্ঞ পিতা-মাতা নিজের সম্মানজনক অবস্থানের অপব্যবহার করে সন্তানদের নিকট কখনো অন্যায্য দাবি কিংবা তাদের জীবনে অহেতুক হস্তক্ষেপ করেন না। আমাদের কাজ হচ্ছে সন্তানদের যথাযথ উপদেশ দেওয়া, যা তাদের জন্য কল্যাণজনক। তারা এটি গ্রহণ করবে কি না—তা তাদের নিজস্ব ব্যাপার।

ক্যারিয়ার বাছাইসংক্রান্ত পরামর্শ

তরুণরা পরবর্তী শিক্ষাজীবন ও ক্যারিয়ারসংক্রান্ত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ে গোলকধাঁধার মধ্যে পড়েন। তাদের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া উচিত? কোন ধরনের ডিগ্রি অর্জন করা উচিত? কোন ধরনের পেশায় নিযুক্ত হওয়া উচিত? ইত্যাদি বিষয়ে তারা পেরেসান থাকে। সচেতন অভিভাবক সন্তানদের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার ক্ষেত্রে স্কুলসহ প্রাজ্ঞ লোকদের সাহায্য নিতে পারেন।

www.nagorikpathagar.org

ষোলো বছরের পরের শিক্ষা বাধ্যতামূলক নয়। এটি প্রতিটি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, লক্ষ্য ও অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে। শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে তুলনামূলক কম আগ্রহী তরুণরা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ এবং কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে। কঠোর পরিশ্রম এবং কর্মক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তারা ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে পারে। অনেকেই আবার ভোকেশনাল কোর্সকে বাছাই করে—যেখানে পড়াশোনার চাপ কম লাগে, তবে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ নিয়ে অনেক প্রায়োগিক দক্ষতা অর্জন সম্ভব হয়। তাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেকগুলো চয়েজ রয়েছে—স্কুল, কলেজ, ফুল টাইম, পার্ট-টাইম, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি। সুতরাং যারা নিজের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে চায়, তাদের সামনে অনেকগুলো অপশন থাকে—যেখান থেকে নিজেদের পছন্দ ও সামর্থ্য অনুযায়ী তারা যেকোনো একটিকে বাছাই করতে পারে। অপরদিকে যারা শিক্ষা অর্জনে আগ্রহী, তদের কর্তব্য হচ্ছে—স্কুলজীবন শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া।

ষোলো বছরের পরে শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। সন্তানরা বড়ো হওয়ার সাথে সাথে যখন জীবনের ব্যাপারে দায়িত্ব নিতে শেখে, তখন থেকেই তারা স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগ করতে শুরু করে। ছেলেমেয়েদের উদ্যোগ ও পছন্দের সাথে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোও তাল মেলানোর চেষ্টা চালায়। এই সময় পিতা-মাতা কিছুটা Relax Feel করেন। ভাবেন, তাদের দায়িত্ব মোটামুটি শেষ, এবার সন্তানরা নিজ থেকেই দায়িত্ববান হিসেবে গড়ে উঠবে। কিন্তু এই সময়ে তরুণদের বল্গাহীনভাবে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। তাদের ঘুড়ির মতো উড়তে দিতে হবে, কিন্তু নাটাই রাখতে হবে নিজের হাতে।

ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী মানুষের সফলতা দুই ধরনের। একটা হচ্ছে দুনিয়ার, আরেকটা আখিরাতের। কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে সম্মানজনক উপায়ে হালাল উপার্জন করাই দুনিয়ার সফলতার চাবিকাঠি। সফল পিতা-মাতা তারাই, যারা সন্তানদের মধ্যে এমন ঈমানের বীজ বপন করে দেন, যা হালাল উপার্জনের ক্ষেত্রে কোনো কিছুর সাথে আপস করে না; তা যতই প্রলোভনমূলক হোক না কেন। তারা সন্তানদের দেখায় নিজের যোগ্যতা বিকাশের পথ, যাতে তারা মেধার পরিপূর্ণ ব্যবহার করতে পারে।

তরুণ মুসলিমরা পেশা হিসেবে ব্যাবসা, শিক্ষকতা, ইলেট্রিশিয়ান, সমাজকর্মী ইত্যাদি পেশা পছন্দ করতে পারে, যা তাদের সাথে খাপ খায়। তবে নিশ্চিত করতে হবে, তারা যেন কোনোভাবেই সমাজের কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের কথা ভুলে না যায়। কিছু অভিভাবক সন্তানদের নির্দিষ্ট কিছু

www.nagorikpathagar.org

পেশা গ্রহণের জন্য জোরাজুরি করেন। ছেলেমেয়েকে নিয়ে অনেক পিতা-মাতার বিশাল আকাঙ্ক্ষা থাকে। যেমন : সন্তানদের ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার কিংবা আইনজীবী বানাবেন। পেশার ব্যাপারে সন্তানদের অহেতুক চাপ দেওয়া কোনোভাবেই কাম্য নয়। পেশা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার উচিত সন্তানদের আগ্রহের বিষয়টি জেনে নেওয়া। তারা যে বিষয়ে আগ্রহী এবং তাদের মেধা যে বিষয়ে প্রখর, তার সাথে সংশ্লিষ্ট পেশাকেই ক্যারিয়ার হিসেবে বাছাই করা উচিত। মনে রাখতে হবে, পিতা-মাতার পছন্দ-অপছন্দ পূরণ করাই সন্তানদের কাজ নয়। পিতা-মাতার উচিত নয় সন্তানের মাঝে নিজ জীবনকে খুঁজে বেড়ানো।

প্রাণিবিদ্যা থেকে জ্যোতির্বিদ্যা (এ টু জেড) জীবনের সকল ক্ষেত্রেই মুসলিম উম্মাহর যোগ্যতাসম্পন্ন জনবল প্রয়োজন। সৃজনশীল ও সমাজ-বিজ্ঞানের মতো বিষয়গুলোর প্রতি কম গুরুত্ব দেওয়ার কারণে মুসলিমরা এক ভারসাম্যহীনতায় ভুগছে, যা থেকে বেরিয়ে আসা জরুরি।

বিশ্ববিদ্যালয়; জ্ঞান অর্জনের রাজতোরণ

শিক্ষা একটা জাতির মেরুদণ্ড। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বর্তমান চ্যালেঞ্জিং বিশ্বের সামনে সীমাহীন জ্ঞানের দ্বার খুলে দেয়। মুসলিম যুবকদের যদি সামর্থ্য থাকে এবং উম্মাহর জন্য কিছু করার ইচ্ছা থাকে, তাহলে উক্ত চ্যালেঞ্জ গ্রহণে তাদের উৎসাহী হওয়া উচিত। বিশ্ববিদ্যালয় এমন একটি অনন্য জায়গা, যার লেকচারগুলো মুক্ত পরিবেশে উন্মুক্ত জ্ঞান বিতরণ করে। সেখানে সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয়সহ বিভিন্ন ধরনের সংস্থা রয়েছে। মুসলিম ছাত্রদের উচিত এই সমস্ত সংগঠনের পাশাপাশি ছাত্রসংসদের কার্যক্রমেও অংশগ্রহণ করা, যাতে সমাজের কল্যাণার্থে তারা নিজেদের যোগ্যতার বিকাশ সাধন করতে পারে। মুসলিম যুবকদের জন্য ইসলামিক, সামাজিক ও একাডেমিক কার্যক্রমের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা জরুরি—যাতে তারা সমাজের বৃহৎ কল্যাণের জন্য নিজেদের তৈরি করতে পারে।

উচ্চশিক্ষা পাবলিক রিলেশন, মিডিয়া রিলেশন, গবেষণা ও উন্নয়ন, পাবলিক আউটরিচ, গভর্মেন্ট রিলেশনসহ নাগরিক ও মৌলিক অধিকার অর্জনসংক্রান্ত বিষয়গুলোতে দক্ষতা অর্জনের সুযোগ প্রদান করে। এটি তরুণ-তরুণীদের শরীরবিদ্যা ও জীববিজ্ঞান সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জনেও সুবিধা প্রদান করে, যা আধুনিক সমাজের অন্যতম ভিত্তি। মুসলিম উম্মাহর ভবিষ্যৎ কারিগর হিসেবে মুসলিম শিক্ষার্থীদের এ সমস্ত বাস্তবধর্মী জ্ঞান আহরণ করা জরুরি, যার মাধ্যমে তারা সমাজের সবার কল্যাণের পথ রচনা করতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

দুর্ভাগ্যবশত বর্তমান সময়ে ইসলাম সম্পর্কে সারা বিশ্বে অজ্ঞতার পরিবেশ বিরাজ করছে। অনেক মুসলিম শিক্ষার্থী নিজের মুসলিম পরিচয়কেও গোপন রাখতে চায়। মূলত বর্তমান সময়ে ইসলাম সম্পর্কে মিডিয়ার ক্রমবর্ধমান নেতিবাচক প্রচারণা, একই সঙ্গে তাদের জ্ঞান ও আত্মসম্মানের ঘাটতি থেকেই এই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হয়। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তরুণ মুসলিমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের পরিচয়ের কারণে গর্ববোধ করবে। ইসলাম হচ্ছে দুনিয়ার জন্য এক উপহার; ইতস্ততবোধ কিংবা আত্ম-অহংকারের বিষয় নয়। এটি রাসূলে কারিম ﷺ কর্তৃক প্রদর্শিত পূর্ণাঙ্গ স্বর্গীয় জীবন পদ্ধতি। পবিত্র কুরআন মানুষের ভেজাল মেশানো থেকে মুক্ত রয়েছে। মুসলিমরা এর ওপর ভিত্তি করে এমন উজ্জ্বল ও মানবিক সভ্যতা গড়ে তুলেছিল, যেখানে বিভিন্ন বৈচিত্র্যের মানুষ সহস্রাধিক বছর ধরে মিলেমিশে বসবাস করে এসেছে। মুসলিম সভ্যতা তখনকার শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের আবাসভূমি ছিল। মুসলিম বিজ্ঞানিরা আবিষ্কার করেছিলেন জ্ঞানের পরীসিমা বিস্তৃত করার উপায় ও উপকরণ। এই উপকরণের ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তী সময়ে ইউরোপীয় রেনেসাঁস সংঘটিত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে নতুন নতুন আবিষ্কার, সৃষ্টিশীলতা ও মৌলিক জ্ঞান অর্জনের জায়গা। রাষ্ট্রের কল্যাণার্থে তারা দক্ষ জনবল, চমৎকার চিন্তা এবং বাস্তব কর্মপন্থা সরবরাহ করে।

দাওয়াতি কাজের সুযোগ

দাওয়াতি কাজ হলো মানুষকে আল্লাহর বিশ্বাসের দিকে ডাকা। মুসলিম যুবকদের আত্ম-অহংকাররে ডুবে না থেকে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান ও হিদায়াতের ব্যাপারে গর্ববোধ করা উচিত। মুসলিম তরুণরা সমাজের সকলের সাথে মধুর সম্পর্ক রেখে ভালো কাজে উৎসাহ এবং খারাপ কাজ থেকে দূরে রাখার প্রচেষ্টা চালাতে পারে। সৃষ্টিশীল চিন্তার দ্বারা নিজেদের এবং অন্য মানুষের সহযোগিতা করতে পারে। একজন মুসলিম যা করে, যা বলে, যা পরে, যা খায় এবং যেভাবে সময় কাটায়—সবকিছুতেই ইতিবাচিক বার্তা থাকতে হবে। আমাদের কথা বলা, পোশাক-পরিচ্ছদ, দাড়ি ও হিজাবসহ আমাদের পরিচয় বহন করে। এমনকী আমাদের চেহারা, নম্র চরিত্র, ভালো আচরণ, কঠোর পরিশ্রম—সবকিছুই আমাদের মুসলিম পরিচয়ের ইঙ্গিত বহন করে। আমরা প্রাত্যহিক জীবনে যা-ই করি, তার সবগুলোই ইসলামের সাক্ষ্য বহন করে। আমাদের কর্মকাণ্ড একজন মানুষকে হয় ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করে, নয়তো ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দেয় ।

www.nagorikpathagar.org

ইসলাম কাজের ক্ষেত্রে সততা ও চারিত্রিক মাধুর্যতার কথা বলে। আমরা সামাজিক হওয়ার জন্য মদের বার কিংবা মদের দোকানে কেন যাই না—তা অন্যের কাছে আত্মবিশ্বাসের সাথে বলতে হবে। আবার যারা এগুলো করে, তাদের বিরক্তি দেখানোরও প্রয়োজন নেই। মানুষে মানুষে পার্থক্য থাকবে, পছন্দ ও আকাঙ্ক্ষায় ভিন্নতা থাকবে—এটাই স্বাভাবিক। আমরা সঠিক সময়ে সালাত আদায় করব। আমাদের উচিত কারও গিবত হয় করা কিংবা দোষ ধরা থেকে বিরত থাকা। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে ওয়াদা রক্ষা এবং কথায় হেরফের না করা। এগুলোর অনুসরণ মুসলিম সহকর্মীদের সাহস ও উৎসাহ জোগায়। এই সকল অভ্যাস অন্য মানুষের মনে ইসলামের ব্যাপারে কৌতূহল ও আগ্রহ সৃষ্টি করে। ইসলামে দীক্ষিত অনেকেই বলেছেন, তারা মুসলিমদের নম্রতা ও স্বাভাবিক জীবনযাপন দেখেই ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন।

ইসলাম ও খিদমাহ

একবার ইমা (ছদ্মনাম) নামের এক ধর্মান্তরিত মুসলিমা তার ইসলাম গ্রহণের কাহিনি বর্ণনা করছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে সে ফাহমিদা (ছদ্মনাম) নামের এক মুসলিম মেয়ের সাথে ফ্ল্যাট শেয়ার করে থাকত। ফাহমিদা একজন প্র্যাক্টিসিং মুসলিম ছিল এবং আচার-আচরণে খুব সামাজিক ও ভদ্র ছিল। একটা সময় ইমা ও ফাহমিদা খুব ভালো বন্ধু বনে গেল। তারা ধর্মসহ আন্যান্য অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করত, কিন্তু কখনো ব্যক্তগত বিষয়ে সীমা অতিক্রম করত না এবং একে অন্যের ব্যক্তিগত স্পর্শকাতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করত না। এক্ষেত্রে ফাহমিদা বেশি সতর্কতা অবলম্বন করত। ভোরবেলায় উঠে ফাহমিদার সালাত আদায় ইমাকে হালকা বিরক্ত করত। কিন্তু ইমা ধীরে ধীরে এতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। ফাহমিদা ইমার কাছে অসুবিধা সৃষ্টির জন্য ক্ষমা চেয়ে নিত। সময়ের সাথে সাথে ফাহমিদার নম্রতা ও আন্তরিকতা তাকে ইমার আরও কাছে নিয়ে আসে।

একসময় ইমা অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং অনেক দিন ধরে বিছানায় পড়ে থাকে। পরিবারের থেকে দূরে থাকার কারণে ইমা অনেক অসহায় অনুভব করতে থাকে। এই সময় ফাহমিদা তার মূল খিদমাহ চরিত্রের আত্মপ্রকাশ ঘটিয়ে ইমার সেবায় আত্মনিয়োগ এবং নার্সের ভূমিকা পালন করে। ইমা অনুভব করে, ফাহমিদা শুধু তাকে সাহায্য করার চেষ্টাই করছে না; বরং প্রচণ্ড ভালোও বাসছে। ইমা ফাহমিদার সেবা দেখে অভিভূত হয়। কৃতজ্ঞতায় তার মন ভরে ওঠে। এটাই ইসলামের প্রতি তার অন্তরচক্ষু খুলে দেয়; যদিও সে তখন তা বুঝতে পারেনি।

www.nagorikpathagar.org

পড়াশোনা শেষ হওয়ার পর তারা আলাদা হয়ে যায়। কিন্তু ফাহমিদাকে সে ভোলেনি। বিভিন্ন উপলক্ষ্যে তারা পরস্পর মিলিত হতো এবং একে অপরকে বিভিন্ন ধরনের উপহার দিত। দুর্ভাগ্যবশত দুজনের কর্মক্ষেত্র পরিবর্তনের কারণে ফাহমিদার সাথে ইমার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তবে ইমার অন্তরে সব সময় ফাহমিদার হাস্যোজ্জ্বল চেহারা ভেসে উঠত। কাজের চাপের মাঝে সে আরেকবার মারাত্মক অসুস্থ হয়ে যায়, কিন্তু এবার সে সম্পূর্ণ একা। বিছানায় শুয়ে সে কেবলই ফাহমিদাকে স্মরণ করতে থাকে। তার চোখে যেন ফাহমিদার শান্ত ও হাস্যোজ্জ্বল চেহারা বারবার ভেসে উঠতে থাকে। সে খুব আক্ষেপ করতে থাকে, ফাহমিদার সাথে কেন যোগাযোগ করতে পারছে না।

সুস্থ হওয়ার অনেক দিন পর ইমা প্রতিদিনের মতো লোকাল লাইব্রেরিতে যায় এবং ইসলামের ওপর লেখা বই খুঁজতে শুরু করে। হঠাৎ সে একটা কুরআনের অনুবাদ পেল। তাৎক্ষণিকভাবে তার মনে পড়ল ফাহমিদা প্রায়-ই এই বইটি গভীর মনোযোগ সহকারে পড়ত। ফাহমিদা একসময় তাকে বলেছিল, কুরআন অন্তরের সকল রোগের প্রতিষেধক এবং এতে মানবজাতির সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে। ইমা অনুবাদটি বাসায় নিয়ে যায় এবং এক মাসের মধ্যে পুড়োটা পড়ে ফেলে। পরের মাসেই সে এক স্থানীয় মসজিদে যায় এবং ইসলাম গ্রহণ করে।

জীবনচক্র

কিশোররা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরই নিজেদের দায়িত্ব নিয়ে থাকে। এই সময় তাদের আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে, পিতা-মাতা যথাযথভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারেননি। এমনটা মনে করা উচিত নয়। তরুণদের কখনোই পূর্বসূরিদের অপবাদ দেওয়ার পেছনে সময় ব্যয় করা ঠিক নয়। কারণ, ইসলাম সন্তানদের পিতা-মাতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে বলে এবং বৃদ্ধ বয়সে যত্ন সহকারে তাঁদের সেবা করার নির্দেশ দেয়।

মুসলিমরা এক মুহূর্তের জন্যও আত্মতুষ্টিতে ভোগে না। তাই শেষ নিশ্বাস ত্যাগের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদের দুর্বলতাগুলো কাটিয়ে উঠার ক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত।

মুসলিমদের কাছে সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই প্রত্যেকটা মুহূর্তই আমাদের অর্থবহ কাজে ব্যয় করা উচিত। কিছু মুহূর্ত আমাদের সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য নিয়ে

www.nagorikpathagar.org

গভীর চিন্তা করে, কিছু মুহূর্ত আল্লাহর স্মরণে কাটিয়ে, কিছু মুহূর্ত জীবন পরিচালনার ব্যয় নির্বাহের জন্য উপার্জনের পেছনে এবং কিছু মুহূর্ত পরিবার ও চারপাশের মানুষদের সঙ্গ দেওয়ার পেছনে ব্যয় করা উচিত। আমরা তাৎক্ষণিক কিংবা প্রকাশ্য ফলাফল না-ও পেতে পারি; কিন্তু আমরা জানি, আমাদের কার্যক্রম 'সম্মানিত লেখকবৃন্দ' (আমলনামা লেখার কাজে নিয়োজিত ফেরেশতাগণ) নিয়মিত লিপিবদ্ধ করছে। রাসূল ﷺ বলেন—

> 'ওই ব্যক্তি ব্যর্থ, যার আজকের দিনটি গতকালের চেয়ে উত্তম হয়নি।'
> সুনান আদ-দায়লামি

প্যারেন্টিং কি সফল হয়েছে

যখন দেখা যাবে, সন্তানরা নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী একজন দায়িত্বশীল প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ হয়ে বেড়ে উঠেছে, তখন বুঝতে হবে—সন্তান লালন-পালনের প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। মুসলিম যুবকদের শুধু পরিবার ও সমাজের প্রতিই দায়িত্ব নেই; বরং বৃহৎ মুসলিম উম্মাহ এবং পুরো মানবজাতির প্রতিও তাদের দায়িত্ব রয়েছে। যে সকল পিতা-মাতা সন্তানদের শিক্ষিত করতে এবং মানবতার কল্যাণ সাধনের জন্য তাদের লক্ষ্যে স্থির থাকেন, তারাই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করেন।

আধুনিক সময়ে তরুণ সমাজকে আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন এবং প্রকৃত মানুষ হয়ে গড়ে উঠার ক্ষেত্রে পথ দেখানো খুবই চ্যালেঞ্জিং একটি ব্যাপার। বর্তমান উদাসীনতাপূর্ণ, ধর্মের প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন এবং আত্মতৃপ্তির ও অহংবোধে পরিপূর্ণ বিশ্বে সমাজের মৌলিক কল্যাণার্থে সামগ্রিক প্রচেষ্টার অনুপস্থিতি লক্ষ করা যায়। কিন্তু ইসলামের সফলতা উম্মাহর ঐক্যের মধ্যে নিহিত। কুরআনে আমাদের একতাবদ্ধ হয়ে থাকার এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে না যাওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রজ্জুকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো এবং দলাদলি করো না।' সূরা আলে ইমরান : ১০৩

পিতা-মাতার উচিত সন্তানদের মাঝে সমাজের জন্য কাজ করার আগ্রহ ও অনুভূতি তৈরি করা। আমার যখন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এই সকল কাজে অংশগ্রহণ করি, তখন আমাদের সন্তানরা স্বাভাবিকভাবেই এগুলোতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

www.nagorikpathagar.org

বর্তমান সংখ্যার বিচারে মুসলিম উম্মাহ অনেক বড়ো, কিন্তু আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তাদের প্রভাব কতটুকু? বিশ্বকে ইসলামের ছাঁচে ঢেলে সাজানোর দুঃসাহসী প্রচেষ্টা শুরু করার সময় কয়জন মুসলিম ছিল? সংখ্যা যদিও গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু ইসলামি শক্তি তার অনুসারীদের যোগ্যতার দ্বারাই বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো—উম্মাহকে আবার পৃথিবীর বুকে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে পরিকল্পিতভাবে কাজ করা। বর্তমান সময়ে জন্য এমন কিছু মুসলিম প্রয়োজন, যারা স্বেচ্ছায় আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে, যাদের মধ্যে ইসলামের আদলে মানবতাপূর্ণ সমাজ পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রেরণা রয়েছে। এমন একটি সমাজ—যেটি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, সহিষ্ণুতা, সমতা ও ন্যায়বিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

বর্তমান সময়ে রাজনৈতিক কারণে এবং মুসলিমদের অতি ক্ষুদ্র একটা অংশের অনৈসলামিক কার্যকলাপের কারণে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে এটি সত্য, শত বছরের স্থবিরতা ও অনৈক্যতা কাটিয়ে উঠে বর্তমানে মুসলিম উম্মাহ নিজদের উন্নতির জন্যে অনেক দৃশ্যমান প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মুসলিমরা দীর্ঘদিন ধরে আত্ম-অনুসন্ধানে লিপ্ত এবং বর্তমানে তাদের মাঝে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক ইতিবাচক উন্নতি লক্ষ করা যাচ্ছে।

অপরদিকে, বস্তুগত উন্নতি এবং বিশাল প্রযুক্তিগত অগ্রগতি সত্ত্বেও আধুনিক বিশ্ব বিশাল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দৈন্যদশা পার করছে, যার ফলাফল সামাজিক দিক দিয়ে খুবই ভয়াবহ। ক্ষমতার ভারসাম্য ধীরে ধীরে পশ্চিমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কেউ-ই জানে না পরবর্তী প্রজন্মের জন্য বিশ্বব্যবস্থা কীরকম হবে। বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সমাজে মারাত্মক আকারে বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। পৃথিবীর অনেক জায়গায় মানবধিকার লঙ্ঘন এবং নাগরিক স্বাধীনতা হরণ অতি উদ্‌বেগের বিষয় হিসেবে দাঁড়িয়েছে। সামাজিক অস্থিরতাও ব্যাপক আকারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি আমাদের সকলের জন্য পরীক্ষার সময়। সচেতন তরুণ মুসলিমদের উচিত আগ্রহের সাথে এটি পর্যবেক্ষণ এবং অসহিষ্ণুতা ঘৃণামুক্ত বিশ্ব প্রতিষ্ঠায় সমাজের অন্যান্য তরুণদের সাথে কাজ করা।

www.nagorikpathagar.org

উপসংহার

> 'সৎ কর্মের মানসিকতা আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিরাট উপহার। কিন্তু শিষ্টাচারের শিক্ষা পিতা-মাতার পক্ষ থেকেই আসে।' বুখারি

বয়ঃসন্ধিকালীন সময়ে প্রবেশের সাথে সাথে ছেলেমেয়েরা ব্যাপক শারীরিক ও মানসিক (Emotional) পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়। পিতা-মাতার কর্তব্য হচ্ছে—এই সময়ে সন্তানদের সাথে এই সকল বিষয়ে শালীনতার সাথে খোলামেলা আলোচনা করা। ছোটো শিশুদের যেমন শারীরিক ও মানসিক চাহিদা থাকে এবং আদর যত্নের প্রয়োজন, তেমনি কিশোর ছেলেমেয়েদেরও মানসিক সমর্থন, পরামর্শ, সহমর্মিতা ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার প্রয়োজন—যাতে করে তারা নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। এই ক্ষেত্রে পিতা-মাতার উচিত কিশোর সন্তানদের সাথে আরও অমায়িক আচরণ এবং তাদের জন্য আরও সহজ পন্থা অবলম্বন করা।

মানুষ কিশোর বয়সে জীবনের সবচেয়ে জটিল সময় অতিবাহিত করে। শারীরিক পরিবর্তন ছাড়াও এই সময় তারা চারদিকের বিশ্ব সম্পর্কে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং সেখানে তারা নিজেদের জড়াতে চায়। অনেকের জন্য এটি রোমাঞ্চকর বিষয়ও বটে। আবার অনেকে অজানা ভয়ে ভীত থাকে এবং নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। অনেক কিশোর এই সময়ে দোটানায় পড়ে যায়, ফলে তাদের মাঝে বিপরীতমুখী চরিত্র লক্ষ করা যায়। কতক সময় তারা খুবই উৎসাহী ও প্রাণবন্ত হয় এবং কতক সময় এলোমেলা ও অসহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব প্রদর্শন করে।

যে সকল অভিভাবক এই ধরনের পরিবর্তনকে সাধারণ প্রাকৃতিক পরিবর্তন হিসেবে গ্রহণ করেন, তারা এই সকল পরিস্থিতিতে ভীত হন না। তারা সন্তান লালন-পালনে এমন এক পন্থা অবলম্বন করেন, যা পরিশেষে পিতা-মাতা ও সন্তানদের মাঝে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করে। এতে সন্তানরা নির্বিঘ্নে নিজের বয়ঃসন্ধিকালীন অবস্থা পার করে। সন্তান প্রতিপালনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো—তাদের জন্য এমন একটি পারিবারিক পরিবেশ সৃষ্টি করা—যেটি হবে আধ্যাত্মিকতা, সম্মান ও হৃদ্যতায় পূর্ণ। এটা তাদের সামাজিক পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে সাহায্য করে। কিশোরদের ভিত্তি যখন এই সকল পরিবেশে গড়ে উঠে, তখন তারা সামাজিকভাবে পরিপূর্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ একজন মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে। তারা হয় পিতা-মাতা ও সমাজের জন্য বিরাট সম্পদস্বরূপ। এরাই বড়ো হয়ে সমাজের ইতিবাচক সমৃদ্ধিতে বিরাট ভূমিকা পালন করে।

www.nagorikpathagar.org

কথার চেয়ে কাজ কঠিন। অভিভাবকদের অবশ্যই নিজেদের কথাবার্তা ও কাজকর্মের ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। নিজেদের সকল কাজে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মুহাম্মাদ ﷺ-এর পন্থা অনুসরণ করতে হবে। দয়া, উত্তম আচরণ, ভদ্রতা, সততা পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষা এবং সর্বদা অন্যের সেবা করার মতো বিশ্বজনীন মূল্যবোধ ধারণ করে পরিচালনা করতে হবে নিজের জীবন। ভালো গাছ যেভাবে সুস্বাদু ফল দেয়, ঠিক সেভাবে নৈতিকতাসম্পন্ন পিতা-মাতাও চরিত্রবান সন্তান উপহার দেয়।

এর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো—সন্তানদের সাথে পর্যাপ্ত পরিমাণ গুণগত সময় (Quality Time) ব্যয় করা। পিতা-মাতার সংস্পর্শ সন্তান ও পিতা-মাতার মাঝে সম্পর্ক বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সন্তানদের মনে এই বিষয়টি গেঁথে দিতে হবে—তাদের সাথে কথা বলা, তাদের উপদেশ দেওয়া কিংবা আদর দেওয়ার জন্য পিতা-মাতা সর্বদা প্রস্তুত। সন্তানের সাথে খোলামেলা এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হলে মাতা-পিতা সন্তানের অল্পবয়স থেকেই সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ বুঝতে পারবেন, যা সমাধান করতে সহজ হবে।

কিশোরদের জীবনে অনেক উত্থান-পতন ঘটে, এই সময়ে তারা অনেক অনিশ্চিত ও আকস্মিক পরিবর্তনের মুখোমুখি হয়। পিতা-মাতা এই সময় বন্ধুত্বপূর্ণ সঙ্গদানের মাধ্যমে তাদের পাশে দাঁড়াতে পারে। সন্তানদের অস্বাভাবিক আচরণের প্রতিক্রিয়ায় চিৎকার ও ধমক দেওয়া উচিত নয়।

যে সকল কিশোর প্রতিনিয়ত অস্বাভাবিক আচরণ করে, তাদের মধ্যে যেকোনো ধরনের গোপন ভীতি কিংবা নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি দানা বাঁধতে পারে। সুতরাং কষ্ট হলেও তাদের সাথে ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করতে হবে এবং তাদের মনের মধ্যে সৃষ্ট বিষয়গুলোর ব্যাপারে খোলামেলা আলোচনা করতে হবে। তারা প্রতিনিয়তই ভুল করতে থাকবে। বিবেকবান সকল পিতা-মাতাই জানেন, কখন কিশোর সন্তানদের একা ছেড়ে দিতে হবে এবং কখন তাদের ব্যাপারে নিয়মমাফিক দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

নিয়মকানুন ও আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অহেতুক হস্তক্ষেপ নেতিবাচক ফলাফল বয়ে আনে। অনেক কিশোর পিতা-মাতার বিরুদ্ধাচরণ করে। যখন তারা দেখতে পায়, তাদের সৃষ্টিশীল ও অনুসন্ধিৎসু মননে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে, তখন তারা পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে।

www.nagorikpathagar.org

মিডিয়ার মাধ্যমে বস্তুবাদী ও ভোগবাদী সংস্কৃতিকে তরুণদের সামনে আকর্ষণীয় করে উপস্থাপিত করা হয়। এর আকর্ষণে মোহগ্রস্ত হওয়া তাদের মোটেও অস্বাভাবিক বিষয় নয়। বাস্তবতা হচ্ছে, বর্তমান সমাজব্যবস্থা তার মূল্যবোধ ও চরিত্র রক্ষার ক্ষেত্রে বিরাট চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। এই উত্তরাধুনিক সমাজ নিজের প্রতি যত্নশীল এবং সর্বব্যাপী হওয়ার পরিবর্তে খুব দ্রুততার সাথে ভোগবাদিতা ও আত্মকেন্দ্রিকতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের সন্তানদের ভোগবাদিতার অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। ফলে তারা ব্যর্থ হচ্ছে আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে। অনেকেই আত্মপরিচয় সংকট, হীনম্মন্যতা ও সংশয়ে ভোগে। ফলে বিরাটসংখ্যক তরুণ ইসলামের মধ্যমপন্থার নীতি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং কেউ কেউ চরমপন্থা অবলম্বন করছে।

বর্তমানে তরুণদের ক্ষেত্রে আমরা যে সমস্ত সমস্যার মুখোমুখি, তার মূল কারণ হচ্ছে দুর্বল বা খারাপ প্যারেন্টিং। সমাজের নানাবিধ উন্নতির ক্ষেত্রে এটি সবচেয়ে বড়ো বাধা। যে সকল পিতা-মাতা সন্তান পালনে উপযুক্ত সময় দিতে পারেন না, তারা নিজেদের বৃদ্ধাবস্থায় এর তিক্ত ফল ভোগ করেন। কিন্তু ততক্ষণে খুব দেরি হয়ে যায়। শুধু এই পৃথিবীতেই তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না; বরং পরকালেও তাদের এর ফলাফল ভোগ করতে হবে। জীবনোদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উপায়ে সঠিকভাবে সন্তান পালন করা আমাদের জন্য অত্যাবশ্যক, যা দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ অর্জনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সবশেষে বলব—স্বভাবগতভাবেই তরুণরা সরলমনা, সুখী, সৃষ্টিশীল ও দুঃসাহসী। তাদের প্রাণবন্ততা ও সরল পরিবর্তন আমাদের বড়োদের মাঝে প্রশান্তি জাগায়, সন্তান লালন-পালন পদ্ধতি যদি ভালোভাবে বোঝা যায় এবং সৃজনশীল উপায়ে যদি তা সম্পাদন করা যায়, তাহলে তা হবে আনন্দদায়ক ও দুঃসাহসিক কাজ।

www.nagorikpathagar.org

নোট লিখুন

www.nagorikpathagar.org

বই সম্পর্কে

সন্তান প্রতিপালন একটি বিশাল কর্মযজ্ঞের নাম, যা খেয়ালি মনে সম্পাদন করার বিষয় নয়। এর জন্য দরকার সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও সঠিক পরিচর্যা। একটি সাধারণ চারাগাছও সঠিক পরিচর্যা ছাড়া ভালো ফল দেয় না; তার পেছনে সময় দিতে হয়। বপনের আগে বীজ বাছাই ও জমি প্রস্তত করতে হয়। আগাছা কর্তন ও পানি সিঞ্চন করতে হয়। পোকামাকড় থেকে বাঁচাতে বিভিন্ন পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়। আর এই প্রত্যেকটি কাজ করতে হয় সঠিক সময়ে সঠিক উপায়ে, তবেই ভলো ফল ঘরে তোলা সম্ভব। একটি সাধারণ চারাগাছের ক্ষেত্রে যদি এতটা পরিচর্যার দরকার হয়, তবে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজীব মানুষকে যোগ্য করে গড়ে তুলতে কী পরিমাণ পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ প্রযোজন—তা সহজেই অনুমেয়। তাই আধুনিক যুগে প্যারেন্টিং বিষয়ে ধারণা থাকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

সন্তানের দৈহিক বৃদ্ধির সাথে সাথে তার মানসিক ও আত্মিক বিকাশও জরুরি। কিন্তু এই বিকাশ পরিকল্পিত পরিচর্যা ছাড়া সম্ভব নয়। 'মুসলিম প্যারেন্টিং'-এ সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুর পরিচর্যা থেকে শুরু করে সন্তানের শৈশব-কৈশোরের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন মোকাবিলা, চরিত্র ও ক্যারিয়ার গঠন, সঠিক বিদ্যালয় ও সৎসঙ্গ নির্বাচন, মানবীয় ও সৎ গুণাবলির বিকাশ, সামাজিক নিপীড়ন থেকে রক্ষা ইত্যাদি বিষয়সহ সন্তানের নিবিড় পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি সুবিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। একই সাথে সন্তান লালন-পালনে পিতা-মাতার চিন্তা-গঠন নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

লেখক পরিচিতি

ড. মুহাম্মাদ আব্দুল বারী।

একজন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ, প্যারেন্টিং প্রশিক্ষক ও লেখক। ১৯৮৬ সালে তিনি লন্ডনের 'কিংস কলেজ' থেকে পদার্থ বিজ্ঞানে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। পদার্থ বিজ্ঞানের একজন গবেষক হিসেবে পেশাজীবন শুরু করলেও পরবর্তী সময়ে আচরণবিষয়ক বিশেষজ্ঞ (Behaviour Specialist) হিসেবে শিক্ষকতাও করেন। ২০১১ সালে অবসর গ্রহণের পর থেকে তিনি লেখালিখি ও প্যারেন্টিং প্রশিক্ষণে মনোনিবেশ করেন।

তিনি ব্রিটিশ সুশীল সংগঠন 'মুসলিম কাউন্সিল অব ব্রিটেন' ও সিটিজেনস ইউকে (Citizens UK)-সহ বিভিন্ন জাতীয় সিভিল ও দাতব্য সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন। ২০১২ সালে অনুষ্ঠিত Olympic and Paralympic Games-এর আয়োজক কমিটির নির্বাচিত সদস্যও ছিলেন। তিনি লন্ডনের 'কুইন মেরি ইউনিভার্সিটি' থেকে অনারারি ফেলো এবং 'ইউনিভার্সিটি অব ইস্ট লন্ডন' থেকে অনারারি ডক্টর অব এডুকেশন ডিগ্রি অর্জন করেন।

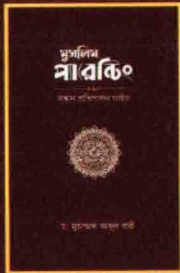

প্রযুক্তির এই যুগে সন্তানদের যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলা নিতান্তই চ্যালেঞ্জের বিষয়। আকাশ-সংস্কৃতি ও প্রযুক্তির সহজলভ্যতায় ভালো-মন্দ উভয় ধরনের উপাদানই সন্তানদের হাতের নাগালে। প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে তাদের দক্ষ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার লড়াইটাও অনেক কঠিন। চারপাশে থাবা বিছিয়ে আছে নৈতিকতাবর্জিত সামাজিক কদাচার। এমন বহুবিধ সংকটের ভেতর থেকেই শিশুমনকে পবিত্রতার চাদরে আবৃত রেখে তাদের গড়ে তোলার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হয়। তাই আধুনিক যুগে প্যারেন্টিং স্কিল আর বিলাসী বিষয় নয়; বরং জরুরি প্রয়োজন। সে প্রয়োজন পূরণের একটি উত্তম সমাধান হতে পারে 'মুসলিম প্যারেন্টিং' নামক এই গ্রন্থটি।

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস
www.guardianpubs.com
9 789849 537083